বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা

(Veda o Vedottarakālīna Saṃskṛta Sāhitye Ātitheyatā Samīkṣā)

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা নিবন্ধ

গবেষিকা

মৈত্রেয়ী জানা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৩

Veda o Vedottarakālīna Saṃskṛta Sāhitye Ātitheyatā Samīkṣā

Thesis Submitted to Jadavpur University for the Degree of Doctor of Philosophy

Submitted by

Maitreyee Jana

Supervisor

Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2023

Certified that the thesis entitled

বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

The Supervisor Candidate

Dated : Dated:

নিবেদন

সদাশিবসমারম্ভ্যাং শঙ্করাচার্যমধ্যমাম্।

অস্মদাচার্য পর্যন্তাং বন্দে গুরু পরম্পরাম্।।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণার শোধপত্রটি রূপায়িত। গবেষণা প্রবন্ধটির রূপদানে সর্বতোভাবে আমার সহায়ক হয়েছেন যাঁরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য কোন বাক্যই যথেষ্ট নয়। তবুও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অবিগীত শিষ্টাচারকে স্মরণে রেখেই বলি পরম কারুণিকের সদিচ্ছা ব্যতিরিক্ত এই গবেষণা কর্মটি পরিণদ্ধ রূপ পেত না তাই সর্বাগ্রে জানাই তাঁকে নমস্কার।

যাঁর জীবনের আদর্শকে ধ্রুবতারা জ্ঞানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রাঙ্গণে আমার প্রবেশ সেই আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের (ঁগিরীন্দ্র কুমার জানা) শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই। আমার পূজনীয়া জননী শ্রীমতী আভা দেবী সংস্কৃতানুরাগিনী। তাঁরই প্রেরণায় আমার গবেষণাকর্মে নিযুক্তি। আশীর্বাদিকা মাতৃদেবীর চরণকমলে সভক্তি প্রণিপাত নিবেদন করি।

আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় মুখ্য অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমার গবেষণা অসম্ভব ছিল। গবেষণা পত্রের প্রস্তুতিকাল থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবসময়ই তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। গবেষণা পত্রের আকৃতি দান, সংশোধন ও পরিমার্জনে তিনি সর্বদা আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহায়তায় আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের কাছে যাঁদের ঐকান্তিক শিক্ষাদান আমার চলার পথের পাথেয়।

কৈশোর থেকে যাঁর স্নেহধারা বর্ষণে আমি সতত অভিষিক্ত এবং যাঁর অভয়বাণীর কারণে আমি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি আমার সেই শিক্ষাগুরু শ্রী প্রমথ কুমার পণ্ডা মহাশয়ের চরণে আমার প্রণাম।

কাকা (আশীষ কুমার জানা), কাকিমা (সন্ধ্যা দেবী), শ্বশুরমশায় (কেদারনাথ সেনাপতি), শাশুড়িমাতা (উৎপলা দেবী) ও মাসিশাশুড়ি (ঝর্ণা দেবী)-র উৎসাহব্যঞ্জক আশীর্বাণী আমাকে অবিচল রেখে গবেষণা কর্মে লিপ্ত করেছে, এঁদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। পতিদেব শ্রীমান রাজার নিরন্তর উৎসাহ, সহযোগিতা ও সদুপদেশে আমি ঋদ্ধ, তাঁর সর্বান্তঃকরণে সহায়তা আমাকে গবেষণার কাজে ধৈর্য্যশীল করেছে; শিশু কন্যা কৈরবী (মোহর) অনেক সময়ই মাতৃসান্নিধ্যের অমূল্য মুহূর্তগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েও অভিমানকে নীরবে অন্তরে পোষণ ক'রে অতি প্রবীণের ন্যায় আমাকে গবেষণার কাজে প্রবুদ্ধ করেছে, এঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল ও সুহৃদকুলের সকলে অহরহ উৎসাহ দানে ও গৃহকর্মে অব্যাহতি দিয়ে আমার গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ভট্টর কলেজ, দাঁতন ও প্রভাত কুমার মহাবিদ্যালয়, কাঁথি- আমার এই দুই কর্মক্ষেত্রের সকল সহকর্মীর সহমর্মিতা ও আমার ছাত্রকুলের অসীম সহায়তার জন্য সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ কাঁথি প্রভাত কুমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ অমিত কুমার দে ও মহাবিদ্যালয়ের IQAC এর সংযোজক ডঃ প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ীকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভট্টর কলেজ, প্রভাত কুমার মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের, যাঁরা আমাকে গবেষণা-সহায়ক

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সমূহের হালহদিশ ও যোগান দিয়ে গবেষণার পথকে সুগম করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সতীর্থদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মুদ্রণ বিষয়ে সহকর্মী ভ্রাতৃপ্রতিম ডঃ শুভময় পাহাড়ী ও বিভাগীয় প্রধান প্রলয় শঙ্কর অধিকারী আমার যন্ত্রগত অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সততই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন; ছাত্র শুভময় প্রধান ও গৌর বেরার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এঁদের সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সর্বশেষে বলি এই গবেষণা নিবন্ধটি সুসম্পন্ন করতে একনিষ্ঠ শ্রম ও গভীর মনোনিবেশের কোন কাপর্ণ্য করিনি। তা সত্ত্বেও এই গবেষণা কর্মে এবং মুদ্রণে যদি কোনরকম অজ্ঞতাবশতঃ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে তার জন্য আমি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

কলকাতা মৈত্রেয়ী জানা

তারিখ :

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		1-6
প্রথম অধ্যায় :	সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি ও আচারাঙ্গের নিরিখে আতিথেয়তা	7-46
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বৈদিক বাঙ্ময়ে আতিথেয়তা প্রসঙ্গ	47-95
তৃতীয় অধ্যায় :	বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ	96-236
	ক. ধর্মশাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তা	99-157
	খ. পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত আতিথেয়তা	158-236
চতুর্থ অধ্যায় :	আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা	237-269
উপসংহার		270-308
গ্রন্থপঞ্জি		309-317

ভূমিকা

ভূমিকা

পিতরৌ গুরুবর্গাংশ্চ প্রণম্যাথ সরস্বতীম্।

লিখ্যতে বিবৃতিঃ কাপি যথাশক্তীশ্বরেচ্ছয়া।।

সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের সময় থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ ও সূত্রসাহিত্যের যুগে ভারতীয়গণের চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা পরবর্তী যুগেও ভারতবাসীর আচার-ব্যবহারে অনুসৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা ও মানসিকতা তথা জীবনচর্যাকে জানতে হলে সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণোজ্জ্বল বিভাগগুলিতে বিধৃত সাহিত্যিক উপাদান সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, মহাকাব্যসহ সাহিত্যের অন্যান্য প্রভেদগুলিতে বর্ণিত বিষয় সমূহ দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম ক'রে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ পরিসরকে ছিন্ন ক'রে আপামর জনসাধারণের কাছে চরম উপাদেয় হয়েছে ও পরমার্থ লাভের মার্গকে করেছে প্রশস্ত। বাসনার প্রবাহকে সংযত করে অশুভ আকর্ষণ থেকে মানুষকে সরিয়ে এনে শুভপথে প্রবর্তনের প্রয়াস ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য।

জগতের অন্যান্য ধর্মমতগুলি যখন উদ্ভূত হয়নি তখন বৈদিক আর্যধর্ম ছিল বিশ্বমানবের ধর্ম। হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদাদি গ্রন্থ, ধর্মশাস্ত্র, গীতা ও ষড়দর্শনের মধ্যে এমন কোন উক্তি দেখা যায় না যা, কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের উদ্দেশ্যে রচিত বা প্রচারিত। ভারতের সংস্কৃতিগত চর্যা ও চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শে সমগ্র পৃথিবীর সুপ্ত মানসিক ও অন্যবিধ শক্তি প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল সকল প্রকার চিন্তা ও চর্যার সমন্বয়- একটি বিশিষ্ট বা বিশেষ শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ সংঘ-নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সকল চিন্তা বা চর্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ

নয়। মানব সভ্যতার সেই প্রাচীন যুগ থেকেই আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ছিল অতি উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রভায় উদ্ভাসিত, সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ়। ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্যান্য ব্যক্তি মননে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ধর্মের মূল কেবল কথা নয় বা ধর্মজ্ঞানও নয়, আচরণে। মনুষ্য জীবনে অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুশাসন। ভারতীয় সংস্কৃতির নির্ধারিত পালনীয় অনুশাসন বা সদাচার বা আচরিতব্য বিধির মধ্যে অতিথিসেবা বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগেও সমাদৃত হয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞ ও সমাজকল্যাণমূলক যেসব কাজ মানুষের পক্ষে অবশ্য করণীয় কর্ম বলে বিবেচিত হয় তারমধ্যে অতিথিসেবা অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ‘অতিথি’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে গৃহীত। সেই অতিথির প্রতি সেবা, আনুগত্য, শ্রদ্ধাদি প্রদর্শনে অতিথিপরায়ণতা সাধিত হয়। মানবকল্যাণে সতত প্রয়াসী ক্রান্তদর্শী আর্য ঋষিরা যুগ যুগ ধরে অতিথিপরায়ণতার মহৎ আদর্শকে প্রতিস্থাপনের জন্য মানবজাতিকে সদাচারে ব্যাপৃত করার চেষ্টায় ছিলেন অগ্রণী। তাঁদের চিন্তাধারা ও অতিথিবাৎসল্যের ঐতিহ্য বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে কালক্রমে ধর্মশাস্ত্রেও পল্লবিত হয়েছে। শ্রুতি-স্মৃতি নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে অতিথিসেবার পরম্পরা সর্বোৎকৃষ্টতার মান্যতা পেয়েছে। গৃহে তাই অতিথি সমাগত হলে তার আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার রীতি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার অন্তর্গত। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিকে তাই পিতা-মাতা-আচার্যের ন্যায় দেবতাজ্ঞানে পরিষেবা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই অতিথির সেবাপরায়ণতা শুধু নয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ উদঘোষিত হয়-

‘অতিথি দেবো ভবঃ’।

আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষের জনমানসে অতিথিবাৎসল্যের কোমল ও ঔদার্যপূর্ণ যে বীজ উপ্ত হয়ে রয়েছে তার প্রতি সদর্থক আগ্রহের কারণে ‘বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা’ শীর্ষক গবেষণা কার্যের অবতারণা। শৈশবে বৃদ্ধ পিতামহীর সান্নিধ্যে থাকার সময় থেকেই পারিবারিক আবহে অতিথি চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সেবামূলক পরিষেবা প্রদানের যে সহজপাঠের জ্ঞান অল্পবিস্তর লাভ করার সুযোগ হয়েছিল সেই অববোধই আমাকে এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিশ্লেষণে প্রণোদিত করেছে। আমার গবেষণাকর্মের বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে অনুভব করেছি সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল পারাবারকে মন্থন করে আতিথেয়তারূপ জ্ঞানামৃতের আস্বাদ লাভ করা খুব সহজ বিষয় নয়। অতি বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তাই গবেষণাকে দীর্ঘায়িত করাও সম্ভবপর নয়, একারণে বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও আবার বিষয় নির্বাচন সংক্ষেপ করতে হয়েছে। বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্য এক অকুল পাথার- একে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করা এই ক্ষুদ্রমতির সাধ্যের অতীত তাই বেদ ও বেদপরবর্তী ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের আঙ্গিকে যথাসাধ্য অধ্যায়ভিত্তিক, দৃষ্টান্ত সংযুক্ত আলোচনার প্রয়াস করেছি। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু অংশের আলোচনা খুব সংক্ষেপে আপতিত হয়েছে।

ভারত-সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মপরায়ণতার প্রতীক স্বরূপ অতিথিসেবার প্রোজ্জ্বল আচরণটি আধুনিক সমাজে কেন ও কিভাবে পালন করা যায় তার আলোচনাও করেছি। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিপালনের মাধ্যম হিসেবে অতিথিসৎকারের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হয়েছে। আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা,

বিশ্বমৈত্রীতা, সহানুভূতিশীলতা ও সেবাপরায়ণতার পাঠদানে আতিথ্যগুণের বর্ণময়, সরল ও প্রাঞ্জল দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধর্মাচরণ ও কর্তব্যপালনের মাধ্যমে মানুষের মনে যখন সঠিক চেতনার উন্মেষ ঘটে তখনই হয় মানবজন্ম সার্থক। আত্যন্তিক মুক্তি বা মোক্ষমার্গের প্রসাধক হিসেবে অতিথি সৎকারের মহৎ আচরণ আমাদের প্রার্থিত ইষ্টলাভকে ত্বরান্বিত করে। একবিংশ শতকের যান্ত্রিক, বহুব্যস্ততাময় জীবনচর্যার আঙ্গিকে অতিথিপরায়ণতার মত শিষ্টাচার আমাদের প্রাণের শান্তি, মনের আরাম দিতে সদাই কৃতকার্য। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্তব্য বুদ্ধিতে অবিচল থেকে এবং অতিথিসেবার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সদাচার প্রতিপালনের মাধ্যমে ইহলোক ও পরলোকে মুক্তিলাভের সহায়ক সোপানের আচরণে পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় ও শান্তি লাভ করা যায়। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বার্থান্বেষী মনোভাবের পরিমার্জনের জন্য অতিথিসেবার মত সদাচারের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথে অতিথিসেবাদি কর্ম ব্যাপক অর্থেই সন্মার্গের নিত্য প্রেরণাদাতা, তাই অতিথিসৎকাররূপ সঙ্কল্পে ব্রতী ভারত-মনন জগতে শ্রেষ্ঠতার আসনে অধিষ্ঠিত।

অতিথিবাৎসল্যের মহানুভব দিকগুলি আলোচনার প্রসঙ্গে পরার্থ সাধনের মাধ্যমে মূলতঃ আত্মিক উন্নতিই চরিতার্থ হয়। বিচিত্র এই জাগতিক সংসারে কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে অতিথিসেবার প্রসৃতি ধারা তাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিচারে অতিথি দেবতার ন্যায় তাই আজও আমাদের সকলের কাছে অতি সমাদরনীয়, যাঁর মহান অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় 'সর্বদেবময়োঽতিথিঃ' বাক্যে।

সুবৃহৎ সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত অংশ চয়ন করে আমার গবেষণা কর্মে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মৌলিক তথ্য উপস্থাপনের। তথ্যাদি পরিবেশনের আঙ্গিকে সমীক্ষাত্মক গবেষণার

পথকেই বেছে নিয়েছি। বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ আলোচনায় আমার সীমিত, সনিষ্ঠ অধ্যয়ন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির অন্তর্বর্তী একটি বহুল প্রচলিত রীতিকে স্বকীয় ব্যাখ্যান পদ্ধতিতে গৌরবদানের প্রচেষ্টামাত্র। অতিথি-অভ্যাগত, আতিথ্য সম্পর্কে আমার গবেষণার প্রয়াসে উদ্ভূত সকল ত্রুটি একান্তই ব্যক্তিগত আর যদি কোন গুণাবেশ ঘটে তা অহং ব্যতিরিক্ত আর সকলের।

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি ও আচারাঙ্গের নিরিখে আতিথেয়তা

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃতি ও আচারাঙ্গের নিরিখে আতিথেয়তা

সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুবিশাল ইমারত নির্মিত হয়েছে যে সাহিত্যকে ভিত্তি করে, অর্থাৎ সকল প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের জন্মকথার অনুসন্ধানে মেলে যেখান থেকে, সেই সংস্কৃত সাহিত্য স্বকীয় বিরাটত্বে, ভাবগাম্ভীর্যে, উদাত্ত ভাষার ছন্দোময় গতিতে ও অলংকারের ঝঙ্কারে অধ্যয়নানুরাগী চিত্তকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। আর্যদের জ্ঞান গরিমার ও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম ভাবধারার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে সংস্কৃত সাহিত্য। কলকলনাদিনী পূতসলিলা গঙ্গা সুবিশাল আর্যাবর্তের উপর দিয়ে প্রবাহিতা, নর্মদা নদীর পুণ্যস্রোতে দাক্ষিণাত্যের ভূমি স্নাত ও ধৌত, সেরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের অনাবিল ব্যাপক ভাবধারায় সিক্ত ও সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি। মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, গীতিকবিতা, চম্পূকাব্য, দূতকাব্য, শতককাব্য, কথা-আখ্যায়িকাসহ সমগ্র বৈদিকসাহিত্যে বিভিন্ন অভিনব নিপুণ সরস রচনার সমাবেশ ঘটেছে। রচনাকৃতির বিরাটত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের প্রশ্ন বিবেচ্য নয়, রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষই বিচারসাপেক্ষ।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস প্রকাশ ঘটেছে সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন সংহত ও উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছে বোধকরি আর অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যে তা হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্য ভারত-সংস্কৃতিকে শুধু প্রকাশিতই করেনি, নিয়ন্ত্রিতও করেছে শত শত বছর ধরে। ভারতবর্ষের ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন, সামাজিক জীবন এবং এমনকি রাষ্ট্রিয় জীবনের ধারাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত ও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যসমূহে বর্ণিত আদর্শের দ্বারা। প্রত্যেক প্রাচীন সংস্কৃতিই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু কোনো সংস্কৃতি যদি একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান হয় তবে আমাদের কৌতূহল অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমরা যখন

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় অথবা গ্রীক সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করি তখন অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজেদের পরিপুষ্ট করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণের একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সমগ্র মানবজাতির প্রায় এক-সপ্তমাংশের জীবনে এটি এখনো একটি সমকালীন বিষয়বস্তু। তাই কিভাবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছিল, কিভাবে পরবর্তী কালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবেই বা উত্তরাধিকারসূত্রে সে সব আমরা লাভ করেছি তা একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ও ফলপ্রদ গবেষণার বিষয়।

ইউনেস্কো অনুমোদিত এবং ওরিয়েন্ট লংম্যান কর্তৃক প্রকাশিত 'Traditional Cultures in South-East Asia' বইটিতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে- সংস্কৃতির অর্থ সমস্ত জড়বস্তু, ভাবরাজি, প্রতীক, বিশ্বাস, অনুভূতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংগঠনসমূহের সম্মিলিত রূপ যা একটি সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। সংস্কৃতিকে সাধারণ ভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে - বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতি ও আন্তর সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা এই দুই দিক থেকেই বিচার করে দেখতে পারি। যে কোন সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা হয় বস্তুগত সমৃদ্ধির মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, সভ্যতার বিকাশে ইতিহাস রচনার বহুপূর্বেই ভারতবর্ষে বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতি একটি উন্নত রূপ লাভ করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি সামাজিক ক্রমবিবর্তনের পথে অবশ্যই এক বিশেষ উন্নত অবস্থায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। ইন্দো-আর্য নামে ইতিহাসে সুপরিচিত ঋগ্বেদীয় ভারতবাসীদের কর্মশক্তি যেমন অদম্য ছিল, তেমনি গভীর ছিল তাদের ধর্মবোধ। অধিকন্তু তাদের অবসরও ছিল। তাই এই সকল কারণে তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত প্রাণশক্তি অবসর

যাপনের চিন্তাক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের অন্তর্জীবনের মহত্তর ক্ষেত্রে সেই চিন্তনকে কাজে লাগিয়ে জন্ম নেয় তার অন্তর্সংস্কৃতি। ভারতের ইতিহাসে ঋগ্বেদীয় যুগের ঊষালগ্নে যে দার্শনিক প্রকৃতি এবং অন্তর্মুখীনতার সূত্রপাত হয় তাইই পরবর্তীকালে প্রসারতা ও গভীরতা লাভ ক'রে পরিণামে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে প্রতিভাত হয়।

বিশাল ও বহুমুখী বৈদিক সাহিত্যই আমাদের সেই যুগের ভারতবর্ষের মননশীলতা ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার শক্তি প্রদান করে। বৈদিক প্রতিভা-প্রসূত সমস্ত চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টিই পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ভিত্তি ও প্রেরণার উৎস। এই সমস্ত দার্শনিক চিন্তাই যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে ধারণ করে আসছে এবং আজও তা সমানভাবে সক্রিয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে প্রেরণাদায়ী দার্শনিক চিন্তা। তাই কোন বিশেষ দার্শনিক চিন্তার মর্মোপলব্ধি সেই বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতির ধারা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়ক। দার্শনিক হেগেলের ভাষায়- 'দর্শন চিন্তাবিহীন সভ্যতা যেন দেবতা-বিহীন মন্দিরেরই সমতুল্য'।

কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরলোক নির্ভর। কিন্তু সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনকে নানা বিপরীতধর্মী দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করে প্রতিপাদিত করেছে। জীবনের সর্ব-অংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষের জীবনের কোন দিককেই অবহেলা করেনি। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন - এ সমস্তই ভারতীয় সংস্কৃতির অবদানে সমৃদ্ধ। তবে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তার অবদান সমধিক, কারণ এই দুইটিতেই ভারতীয় প্রজ্ঞা সর্বাপেক্ষা বেশি মনঃসংযোগ করে এসেছে। পারলৌকিকতা ও ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান নিঃসন্দেহে তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা জীবনধর্মী এবং এক দৃঢ় ইতিবাচক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষ চিরকালই ধনসম্পদ ও দার্শনিক জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ দেশ বলে সুবিদিত। তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশই বাণিজ্য এবং মনোজগৎ এই উভয়ক্ষেত্রেই ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। বহির্বিশ্বের সাথে সংস্কৃতিগত মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই সব তথ্য প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সোৎসাহে লক্ষ্য করেছে সেই মানুষকে যে-মানুষ সামাজিক জীব, যে বহির্জগতের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার জন্য সংগ্রামে ব্যাপৃত ও ব্যষ্টিগত তথা সমষ্টিগত অস্তিত্বে যে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঋগ্বেদীয় যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির অত্যুত্তম ধারাসমূহ পরবর্তীকালে সর্বোত্তম স্থান না পেলেও ইতিহাসে কখনও অবহেলিত হয়নি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি জীবনের আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানমূলক বিষয়সমূহ; আর সংস্কৃতির অর্থ কৃষ্টি – মানসিক ও বুদ্ধিগত উৎকর্ষ। এককথায় জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় দিকেরই পরিমার্জন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য। ‘সংস্কৃতি’ বা কৃষ্টি (Culture) কিন্তু সভ্যতার চেয়ে ব্যাপকতর ধারণার দ্যোতনা করে। সংস্কৃতি কোন জাতির বা জনগণের জীবনরসে পুষ্ট হয়। তাকে ধার করা যায় না - তা জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। ‘সভ্যতা’ একটি মহৎ অবদান; কিন্তু ‘সংস্কৃতি’ মহত্তর প্রেরণার উপলব্ধি। বংশের পর বংশক্রমে সংস্কৃতির উত্থান ও পতন ঘটে। বৃহত্তর অর্থে ‘সংস্কৃতি’ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিশেষ। পরিবর্তনশীল হলেও যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়ে আসলে তা একই রূপে থাকে। যেমন বাহ্যিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মানব দেহের আধারে অবিকার্য থাকে আত্মা। আবার ব্যক্তিমানবের বিনাশ হলেও সমষ্টিগত মানবসত্তা অক্ষয়, অবিনাশী। পৃথিবীতে সভ্যতার প্রথম উদয় হয় আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে, আর এই প্রাচীনতম সভ্যতার পত্তন ঘটেছিল আমাদের আর্য পূর্ব পুরুষদেরই মধ্যে। জগতে সভ্যতার উদ্ভব আর্যদেরই মনীষার ফল। মানুষকে সভ্য ও মানবোচিত পদে উন্নীত করবার জন্য পৃথিবীতে যে

সমস্ত মনোভাব ও চেষ্টা কার্যকরী হয়েছে, ভারতের সংস্কৃতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সহস্র বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীর বৃহত্তর অংশের মধ্যে উচ্চ কোটির আধ্যাত্মিক জীবন বলতে, ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও ধর্মাত্মাদের দ্বারা আবিষ্কৃত, শৃঙ্খলিত এবং মানবের উপযোগী করে প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত ভাবাবলীর আহ্বানে ভূমণ্ডলের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগন কিভাবে সাড়া দিয়েছিল, মুখ্যত তাকেই বোঝায়। নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত তাই- পৃথিবীর বহু পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান সংস্কৃতি-বাহক শক্তির আগমন ভারতবর্ষেই ঘটেছিল। ভারতে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা গড়ে ওঠার পর থেকে ভারতে তুর্কী-বিজয় পর্যন্ত, এশিয়া মহাদেশে ভারতের সভ্যতার প্রসারের দিক বিবেচনা করে ভারতকে L'Inde Civilisatrice অর্থাৎ 'India the Civiliser', 'সংস্কৃতিবাহী ভারতবর্ষ' এই সমীচীন আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি কেবল একটি সামান্য বা সভ্য জগৎ মাত্র ছিল না। ভারতের মধ্যে বা ভারতের বাইরে যে সকল জাতি ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সংস্পর্শে এসেছিল, তাদের আত্মসম্মানের কোন হানি না করে, ভারতীয় সংস্কৃতিমনস্ক চিত্তের এই মৌলিক উদারতা তাদের সভ্য মানুষ করে তুলেছিল; তারা এই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গভীর এবং বিস্তৃত জীবনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের আহৃত ও স্বকীয় বিশিষ্ট উপাদান-সম্ভারের দ্বারা, এই সংস্কৃতিকে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে আরও পরিবর্ধিত ও বিশ্বমানবের পক্ষে আরও উপযুক্ত করে তুলতে সহায়তা করেছিল। ভারতের সংস্কৃতিগত চর্যা ও চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শে সমগ্র পৃথিবীর সুপ্ত মানসিক ও অন্যবিধ শক্তি প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের মূলমন্ত্র ছিল, সকল প্রকার চিন্তা ও চর্যার সমন্বয় - একটি বিশিষ্ট বা বিশেষ শাস্ত্রানুসারী অথবা বিশেষ সংঘ-নিয়ন্ত্রিত মতবাদের দ্বারা আর সমস্ত চিন্তা বা চর্যার দূরীকরণ, অপসারণ, অবনমন বা বিনাশ নয়। এই জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির

কৃতিত্ব কেবল একটি বিশিষ্ট পার্থিব সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতি তার নিজের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট আদর্শ ও ভাবরাজি অন্যান্য ব্যক্তিমননে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ঋগ্বেদে চিত্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা ইন্দো-আর্যদের আমরা একটি বলিষ্ঠ, কর্মচঞ্চল, যৌবনোদ্দীপ্ত ও প্রাণোচ্ছল জাতি হিসেবে দেখতে পাই। তাঁরা জীবনকে ভালবাসতেন এবং তাঁদের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও দার্শনিক প্রতিভা ছিল। হতাশার ভাব ঋগ্বেদে কোথাও নেই। ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার কথা আছে কিন্তু তা নিয়ে কোন উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগ নেই। মৃত্যুর পরে যে স্বর্গপ্রাপ্তির তীব্র বাসনা তাঁদের মধ্যে ছিল তাও কেবলমাত্র মর্ত্য জীবনেরই একটি আদর্শ ও আনন্দদায়ক রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক সভ্যজগতের মানুষের মতো ঋগ্বেদীয় ভারতীয়রাও দ্বিধাহীনভাবে পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনুরুক্ত ছিলেন এবং জাগতিক ও ধর্মীয় উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছেন। কিন্তু স্থূল বস্তুজগতে এবং সামাজিক স্তরে সুস্থিত হওয়ার পরে তাঁদের মনে কিছু প্রশ্ন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এযাবৎ কালের সহজ আশাবাদকে পেছনে ফেলে তাঁরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন চিন্তা, মননশীলতা ও অভিজ্ঞতার প্রসারিত দিগন্তের পথে। ফলে বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সৃজনধর্মী সংস্কৃতি-পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। বস্তুত পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উপনিষদই চূড়ান্ত ও ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতীয় উন্নত সংস্কৃতির প্রভাবে সেযুগে মানুষের অন্তর্জীবন এমন এক চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল যে, সেখান থেকে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ ও অনাগত ভবিষ্যতের সঠিক মার্গ নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছিল।

কোন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে সেই সংস্কৃতিতে মানুষের স্থান কোথায় তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। যে সমস্ত সংস্কৃতির কথা আমরা এ পর্যন্ত জেনেছি, সেই সংস্কৃতিগুলিকে দুটি মূল ভাগে বিভক্ত করা যায়- একটি গ্রীক অথবা গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি, অন্যটি ভারতীয় সংস্কৃতি। এর প্রত্যেকটিতেই আমরা মানুষের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য এবং তার উচ্চতম উৎকর্ষের একটি স্পষ্ট চিত্র পাই। মানুষের মহিমা-সম্বন্ধীয় বোধ বা ধারণাই একটি জাতির সংস্কৃতি-বিচারের চমৎকার মাপকাঠি। প্রত্যেক উন্নত সংস্কৃতিরই একটি সাধারণ বস্তুগত ভিত্তি আছে। সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার অন্তর্জীবনের গভীরতা দিয়ে। মানুষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিত্ত-আলোড়নকারী যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ও তার উত্তর পায়, তাই তার জীবনকে সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য জীবের মত মানুষকেও যদি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সর্বদা সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হতো তবে ক্রমবিকাশের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই তার মধ্যে জন্মলাভ করতে পারত না; এখানেই বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য। এই বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতির প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ হলেই মানুষ চিন্তা ও মননশীলতার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছবার পরিকল্পনা করতে পারে। মানুষের ক্রমবিকাশের সেই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আয়তন বা পরিমাণগত বিশালত্বের পরিবর্তে গুণগত উৎকর্ষই হয়ে দাঁড়ায় অগ্রগতি বিচারের মানদণ্ড। মানুষের অভূতপূর্ব বাকশক্তি ও পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার বংশানুক্রমিক সঞ্চারণের সাহায্যেই এই ধারণাশক্তির বিকাশ ঘটে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সাংস্কৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়েই মানুষ তার সংস্কৃতি গঠনকারী মনটিকে যুগ যুগ ধরে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালনা করে আত্যন্তিক মুক্তির পথকে করে প্রশস্ত। জুলিয়ান হাস্কলের ভাষায়- 'বিশ্বসৃষ্টিতে তাই মানুষের এক অসামান্য তাৎপর্য্য রয়েছে।.... সে এই বিশাল আয়তন নিখিল জড়জগৎ ও তারই সমতুল্য এক চেতন শক্তির অভিজ্ঞানস্বরূপ, অস্তিত্ব ও অন্তর্জীবনের গুণগত

সম্পদে সে সমৃদ্ধ, সর্বোপরি সর্বগ্রাসী ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম মানসিকতার আধিপত্য তারই মাধ্যমে স্বীকৃত।"[১]

ইন্দো-আর্যযুগের সামাজিক পরিবেশে মানুষ কিছু অবকাশ পেত, আর সেই অবকাশে উত্থিত হত নানা প্রশ্ন। সেই অবকাশেই মানুষ স্থির করতে পেরেছিল বহির্জগৎ বা মনোজগতের কোনটিকে সে জয় করবে। ইন্দো-আর্যরা যে আশ্চর্য সহজাত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁরা ইচ্ছে করলেই সেই ক্ষমতার দ্বারা জড়জগতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তাকে ভোগ করতে পারতেন। বস্তুজগৎ থেকে মনোজগতে যখন কোন সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটে, তখন সচরাচর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামরিক ক্ষেত্রেই প্রকাশ ঘটে। এরকম আন্তর-সংস্কৃতির গর্ভেই জন্ম নেয় পদার্থবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ, অনুমান-ভিত্তিক দর্শন, আচার-সর্বস্ব ধর্ম এবং যুদ্ধের মাধ্যমে উপনিবেশ বিস্তার। এই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হলো সমাজবদ্ধ মানুষ, স্থান-কালের সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে যার জন্ম ও বিকাশ। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবিরাম পরিমার্জনই এই সংস্কৃতির লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এটি আমরা দেখতে পাই গ্রীক-রোমান সংস্কৃতিতে এবং চৈনিক, প্রাচীন মধ্য এশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে। ভারতীয় সংস্কৃতিও অন্যান্য সংস্কৃতির মতো একই পথে তার যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু তার জীবনের প্রাথমিক পর্বেই সে আবিষ্কার করেছিল মানব অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্তকে, প্রকৃতির অন্তরস্থিত ঐশ্বর্য যেন মানুষের অহংবোধের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। ঋগ্বেদেও আমরা এক দিব্য অমর সত্তায় উদ্ভাসিত ভারতীয় মননশীলতার চিত্রকেই দেখতে পাই। এই মনটিই অধিকতর গভীরতা ও শক্তিলাভ করে ধীরে ধীরে উপনিষদে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপনিষদে আমরা পাই মুক্ত, সুসম্বদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক ভারতীয় মন। সেই মন নিরলসভাবে সত্যের অমোঘ আকর্ষণে ও অনুসন্ধানে ছুটে চলেছে এবং সত্যের

প্রতি তার এই অনুরাগ বর্তমানেও অবিচল। উপনিষদ তার অন্তর্মুখী প্রবণতার দ্বারা স্ফুটনোন্মুখ ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির ওপর এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'হে মানব, নিজেকে জান' - গ্রীকদের এই বাণী উচ্চারণের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষ স্বরূপ-উদঘাটনের পথে তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু লক্ষ্যপ্রাপ্তির আগে মধ্যপথেই গ্রীকরা তাদের যাত্রা থেকে হয় বিরত। পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি উন্নতিশীল স্তরই নির্নীত ও প্রভাবিত হয়েছিল ঔপনিষদিক ভাবনার দ্বারা। অন্তর্মুখী গভীরতার প্রতি আকর্ষণের ফলেই ভারতবর্ষ তার সম্প্রসারিত বহির্জীবনের ইতিহাসে কখনোই আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিটি তরঙ্গই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাদে আশীর্বাণী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে'।[২] সংস্কৃতির সারবত্তা প্রকাশ পায় সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে। পার্থিব উন্নতিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি তেমনই একটি পার্থিব সুখপরায়ণ মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষ যে ঈশ্বরকল্প মানুষকেই তার আদর্শ বলে চিন্তা করে এসেছে, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের সংস্কৃতির মূলকথা। ড. রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেছেন- 'ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে গ্রীকদেশীয় মহানুভব কোন ব্যক্তি অথবা মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধারণাই আদর্শ চরিত্র নয়। তার কাছে আদর্শ চরিত্র হলো একজন মুক্ত আধ্যাত্মিক মানুষ, যিনি কঠোর সংযম ও নির্লিপ্ততার দ্বারা এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন, যিনি স্থান ও কালরূপ সংস্কারে আবদ্ধ নন। সর্ব অবস্থাতেই ভারতবর্ষ এইরূপ আদর্শ চরিত্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান জানিয়ে এসেছে। এঁদের নিয়ে গর্ব অনুভব করেছে। উপনিষদের যুগে ঋষিদের আবির্ভাবের সময় থেকে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও গান্ধী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে এবং দেশের প্রত্যেকটি অংশে জন্ম নিয়েছেন সেইসব মহাপুরুষ যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ আদর্শের জন্য জীবনপাত করে এসেছেন।'[৩] গ্রীক সংস্কৃতি যেমন সমাজবদ্ধ মানুষেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল অন্তর-সম্পদে সমৃদ্ধ, প্রাজ্ঞ ,ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ- যে কখনোই স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি, জীবনের সকল

পর্যায়ে আপন কর্তব্যবোধে অবিচল, আচারাদি পালনে স্থিতধী। দুটি সংস্কৃতিই তাদের স্ব স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং একটি অন্যটির পরিপূরক। সর্বজনীনতা ও মানবতাবাদই ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তার সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষ কি উপায়ে সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করে সর্বোচ্চ মহিমা ও উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে তাই তার ধ্যানের বস্তু। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষের আচরণগত অন্তর্নিহিত ঐশী-শক্তির স্ফুরণ ঘটে এবং সেই শক্তির দ্বারাই সে ঐ মহিমা ও উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে। বহির্জগতে নিয়মানুগ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ও অন্তর্জগতে সংযমী আচারনিষ্ঠ ধর্মজীবন দ্বারাই সে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। প্রথমটি মানুষকে নাগরিক হিসেবে এক সামাজিক প্রতিষ্ঠা দান করে। এই প্রতিষ্ঠালাভের ফলে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং এই মূল্যবোধের সুফল ভোগ ক'রে মানবজীবন মধুময় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের ধারণার যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি ঘটাতে পারেনি। তবু বিচার ও যুক্তি তরবারি-শাণিত বেদান্ত-দর্শন সমাজবদ্ধ মানুষকে উচিত সম্মান প্রদর্শন করেছে, কারণ বেদান্ত মতে যে কোন বিষয়ে সাফল্য ও বিস্ময়কর নৈপুণ্য মানুষের আত্মশক্তিরই প্রকাশমাত্র। সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে জয় করা, সর্বোচ্চ সামাজিক উৎকর্ষ লাভ এবং উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে অনুকূল এক স্বাস্থ্যকর বাহ্যিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা - এই সমস্তই মানুষের বৌদ্ধিক উন্নতির ফসল।

ভারতীয় সংস্কৃতির নমনীয়তা ও ঔদার্য তাকে এমন এক পরমসহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের শক্তি দান করেছে যাতে সে ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের পথে চির প্রবহমান এই সংস্কৃতি তার মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে যুগ-প্রয়োজনে নব নব রূপ ধারণ করেছে

মাত্র। সাংস্কৃতিক গোঁড়ামি মানুষের জীবন সম্পর্কে যৌক্তিক অভিমত দ্বারাই সৃষ্ট। ভারতবর্ষ কিন্তু সকল অস্তিত্বকেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এসেছে। সংকীর্ণ তর্কযুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার আলোকে বহুর মধ্যে একের প্রকাশ দেখেছিল। এই অপূর্ব দর্শনই তার শান্তিনীতি রচনা করেছে, বৈচিত্রের মধ্যে একত্বের সুর শুনিয়েছে, সকল প্রকার স্থূল ও শ্বাসরুদ্ধকারী গতানুগতিকতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিন্যাসের মূলে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন সিন্ধু-সভ্যতাজাত সংস্কৃতি ও ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির পুনর্মিলন, সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয়। এই সমন্বয়ই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারাটিকে রচনা করেছে। নিত্য প্রবহমান ভারতীয় সংস্কৃতিতে উত্তরোত্তর সংযোজিত হয়েছে নতুন ভাবধারা, নতুন মানুষের নতুন বৈচিত্র্য। এই নব নব সংযোজন তাকে দিয়েছে আরও শক্তি, তার মহিমাকে করেছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। গঙ্গানদী ভারতীয় সংস্কৃতির একটি যথাযথ প্রতীক। হিমালয়ের অভ্যন্তরে এক পবিত্র ক্ষীণধারারূপে তার যাত্রা শুরু। আপন দীর্ঘ গতিপথে তার সাথে এসে মিশেছে কত উপনদী। শেষে গঙ্গা হয়ে উঠেছে এক আনন্দের মহানদী। তার বিস্তীর্ণ দুই তীরের অধিবাসীদের সে অকাতরে বিতরণ করে চলেছে তার প্রসাদ ও দাক্ষিণ্য। পারসিক, গ্রীক, আরব, তুর্কী, মঙ্গোল ও পরিশেষে ইউরোপীয় জাতিবর্গ তাদের অমূল্য অবদানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। পৃথিবীর সবকটি প্রধান ধর্মপ্রসূত ভাবধারা ও চিন্তার সাহায্যে আরও পরিপুষ্ট হয়েছে এই মহান সংস্কৃতি- ভারত সংস্কৃতি।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন দিক নিয়মিত হয় যেসব নীতির দ্বারা তারই সাধারণ নাম ধর্ম। এই নীতি সমূহ সংকলিত হয়েছে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। বলাবাহুল্য, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি সবই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এই শাস্ত্রগুলিতে জীবনযাত্রার যে আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে নীতিরূপে, সংস্কৃত সাহিত্যসমূহে তাই

অঙ্কিত হয়েছে বাস্তব দৃষ্টান্তরূপে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ধর্ম শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ধর্মশব্দটি কখনও কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থে স্থিত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। ধর্ম শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ থাকায় এবং ভারতীয় ভাবধারায় ব্যবহৃত ধর্ম শব্দটির অন্য কোন ভাষায় সঠিক প্রতিশব্দ প্রায় দুর্লভ বলে শব্দটির অন্বিষ্ট অর্থ ধর্মাচরণ সম্বলিত ভারত-সংস্কৃতিকে তথা সভ্যতাকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। বৈয়াকরণ পরিভাষায় √ধৃ + মন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন ধর্ম শব্দ। ধর্ম শব্দটির অভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুশাসন (Ordinance), ব্যবহারিক বিধি (Usage), কর্তব্য (Duty), সদ্গুণ (Virtue), নীতি (Morality) এবং অবশ্যই বহু ব্যবহৃত Religion শব্দটিকে ধর্মের সমার্থক বলে ধরা হয়। কোষগ্রন্থসমূহে ধর্ম শব্দ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে ধর্ম শব্দটি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত। অমরকোষ অস্ত্রীলিঙ্গ ধর্ম শব্দের অর্থে পুণ্য, শ্রেয়ঃ, সুকৃত, বৃষ প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছে- 'স্যাদ্ধর্মমস্ত্রিয়াং পুণ্য শ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ' পুণ্য অর্থে ধর্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ ধর্মশব্দের অর্থে পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ গৃহীত হয়েছে। মেদিনীকোষের মতে ধর্মশব্দের অর্থ ক্রতু, অহিংসা, যজ্ঞ প্রভৃতি। হেমচন্দ্র ধর্মশব্দের ক্লীবলিঙ্গে দানাদি কর্মকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু পুংলিঙ্গে ধনুঃ, যজ্ঞ, সৎসঙ্গ প্রভৃতি অর্থ করেছেন। ঋগ্বেদে ধর্ম শব্দটি কখনো বিশেষণ, কখনো বা সংজ্ঞা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বেদেও শব্দটি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে উভয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক পান্ডুরঙ্গ বামন কাণে ক্লীবলিঙ্গান্তে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ বেদে ছাপান্ন বার লক্ষ্য করেছেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পর্বে ব্যবহৃত ধর্ম শব্দটির অর্থ যদিও সুস্পষ্ট নয়,[৪] তবুও বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম শব্দটি অনুশাসন বা Ordinance অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এই অর্থটি সুসমঞ্জস না হওয়ায় নির্ধারিত নিয়ম (Fixed Principle) অথবা আচার-আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী (Code of Conduct) অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রে

ধর্মের তাৎপর্য নির্দেশ করা হয়েছে।[৬] এখানে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদিক্রিয়া বোঝাতে ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ক্রিয়াসমূহ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মূলকথা এখানে ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন আশ্রমের পালনীয় কর্তব্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন পাদে ধর্ম শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ এর মূল তাৎপর্য যা দাঁড়িয়েছে তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়- আর্যসম্প্রদায়ভুক্ত, বর্ণাশ্রমধর্মের শরিক মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং মান্য নিয়মাবলীর সারাৎসার হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম, ধার্মিক ক্রিয়াজনিত গুণবাচক অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। ধর্মের এই গুণগুলিই পরবর্তী ভারতীয় সমাজের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়- 'ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রো শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ'। তৈত্তিরিয়োপনিষদে ধর্মশব্দ নিয়ম, আচার প্রভৃতি বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে- 'সত্যং বদ ধর্মং চর'।[৭] বৃহদারণ্যকোপনিষদে উপদেশ অর্থে ধর্ম শব্দ গৃহীত হয়েছে – 'এষো ধর্মঃ'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধর্ম শব্দ জীবনাচরণ অর্থে প্রযুক্ত – 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'[৮] অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণীয় সামাজিক মানুষের আচরণীয় কর্তব্য অর্থে ধর্ম শব্দটিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও সদাচার অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন-

"শ্রুতিঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্।।"[৯]

সূত্রসাহিত্যেও ধর্মের মনোরম পরিভাষা পাওয়া যায়। পূর্ব মীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি ধর্মের বেদবিহিত প্রেরক লক্ষণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক বিধান অনুসারে জীবনাচরণ ধর্ম– "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ"।[১০] বৈশেষিক সূত্রে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিকে ধর্ম বলা হয়েছে- 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্সিদ্ধিঃ সধর্মঃ।' মহর্ষি বশিষ্ঠ

বলেছেন-‘শ্রুতিস্মৃতিবিহিতো ধর্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। শিষ্টঃ পুণরকামাত্মা’- শ্রুতি ও স্মৃতির বিহিত আচরণই ধর্ম। তদভাবে শিষ্ট ব্যক্তিদের উপদেশই ধর্ম। মনুর মতে-

‘বেদোঽখিলধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।

আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।।’[১১]

অর্থাৎ বেদ সমস্ত ধর্মের মূল। বেদজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উপদেশ ও আচরণও ধর্ম। তাছাড়া যে কর্মে আত্মতুষ্টি সম্পাদিত হয়, তাও ধর্ম। সাহিত্যে সমকালীন সময়ের আবেদন অত্যন্ত প্রবল। সমকালীন সমাজের প্রয়োজনেই সাহিত্য রচিত হয়। বৈদিক ভারত সদাচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে ধর্মোশাস্ত্রোচিত বিধানের তখন হয়তো কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই সূত্রসাহিত্য পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। ক্রমশঃ সামাজিক প্রয়োজনে বেদোক্ত ধর্ম সূত্রাকারে ধর্মসূত্র সমূহে এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে ধর্মশাস্ত্রে পরবর্তীকালে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। বৈদিক মানসিকতার সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মাচরণ ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি সমন্বিত হয়ে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে এক নবীন সাহিত্য; শাস্ত্রকারগণ যার নাম দিয়েছেন ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রগুলি বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে বেদানুসারী ভারতীয়দের আচার অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক চিরন্তন বাণী– ‘শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষু ইবাবতারয়েৎ।’[১২] বাসনার প্রবাহকে সংযত করে অশুভ পথ থেকে সমগ্র মানব কুলকে সরিয়ে এনে শুভ পথে প্রবর্তনের প্রয়াসই হল ভারতীয় সভ্যতা–সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। মানব কল্যাণে সতত প্রয়াসী ঋষিগণ যুগ যুগ ধরে সেই মহৎ আদর্শকে প্রতিস্থাপনের জন্য সদাচারে মানবজাতিকে ব্যাপৃত করার চেষ্টায় ছিলেন অগ্রণী। তাঁদের চিন্তাধারা ও ঐতিহ্য বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে কালক্রমে ধর্মশাস্ত্রে পল্লবিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের

প্রতিবিম্বরূপ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতিশাস্ত্রে আচরিতব্য কর্তব্যাদির ধারা লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রগুলি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যাবতীয় পালনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং কি কি পালন করলে, কিভাবে জীবন যাপন করলে মানুষ আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার মার্গ নির্দেশ করে। তাই ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রগুলি। ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, ব্যবহার - কার সাথে যোগ নেই ধর্ম তথা স্মৃতিশাস্ত্রের।

ধর্মের অনেক পরিচয়ের একটি হল সদাচার। সদাচারের মূল আবার ধর্ম। সেই ধর্ম শাস্ত্রীয় বিধির পরিপালন। এর দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা ও পটুতা জন্মায় এবং মন উদার হয়, সাত্ত্বিকতা বাড়ে। সদাচার রূপ ধর্মের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হল মালিন্য মোচন। মানুষের কিছু সুকুমার বৃত্তি ও চেতনার স্তরবিশেষের প্রাপ্তিই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। মহাভারতের দৃষ্টিতে ধর্মকে চিনতে চাইলে জানা যায় যে, কায়িক, বাচিকও মানস শুভ প্রযত্ন যা কিছু তাই ধর্ম। অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ এই চারটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ হলে চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সদাচারী মানুষই অগ্রণী হন। অতএব আচরণই মানুষের ফল নির্দেশক। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুবর্গের সাধনের প্রথম শর্ত হল শাস্ত্রানুমোদিত পথে ধর্মের আচরণ, অর্থের উপার্জন ও কামনার প্রশমন ঘটাতে পারলে মোক্ষ বা আত্যন্তিক মুক্তির জন্য মানুষকে অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে হয় না। এই শাস্ত্রানুমোদিত আচার-আচরণই পারে প্রার্থিত মোক্ষ প্রদান করতে। মুমুক্ষা মানবের চির কাঙ্ক্ষিত বিষয়-সদাচারী মানুষের মুমুক্ষার পথ নির্দেশিত হয় তার ঐহিক জীবনে আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের মানুষ চায় শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তি। জীবনচর্যার আলোকে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয় নানা কর্মকাণ্ড। সেই কর্মসমূহের বিধিপূর্বক নিষ্পাদনই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে পূর্ণতার মনিকোঠায়। সদাচার বা

আচার পালনই প্রধান ধর্ম। শ্রুতি স্মৃতি সকলেই আচারকে মান্যতা দিয়েছেন। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি তাই আচরণে যত্নবান হবে। এই সদাচারের মধ্যে অতিথি সৎকার অন্যতম।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে যার কোন নিশ্চিত তিথি নেই অর্থাৎ আগমনের নিশ্চিত তিথি নেই; অর্থাৎ হঠাৎ ধার্মিক সত্যোপদেশক, পরোপকারার্থ, সর্বত্র ভ্রমণকারী, পূর্ণ বিদ্বান যোগীরা যখন ঘরে আসেন, তাঁকে অতিথি বলা হয়। এই সম্বন্ধে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে পূর্ণবিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, সত্যবাদী, ছল কপটরহিত এবং প্রতিদিন ভ্রমণকারী ব্যক্তিই অতিথি হিসেবে পরিচিত। গৃহস্থের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ও পরমধর্ম অতিথিসেবা। সত্যার্থপ্রকাশ এ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অতিথির মহত্বের সম্বন্ধে বলেছেন- অতিথি ব্যতীত সন্দেহ নিবৃত্তি হয় না, সন্দেহ নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ় নিশ্চয় তথা প্রমা লাভও হয় না। প্রমা হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান; অতএব প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের মাধ্যম হল অতিথি - এই অতিথি ব্যতিরিক্ত প্রমা অধরা, প্রমা ব্যতীত মোক্ষ অলব্ধ থাকে। ধর্মশাস্ত্রকার মনু অতিথির স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন - যিনি একরাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করেন এরূপ ব্রাহ্মণকে বলা হয় অতিথি। আবার যাঁর বংশ গোত্রাদি অজ্ঞাত, যাঁর আগমনের তিথির কোনো বিচার নেই, যে কোনো সময় উপস্থিত হন, তাঁকেও অতিথি বলা হয়।[১৩]

অমরকোষানুসারে অতিথির পর্য্যায়বাচী শব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- 'স্যাদাবেশিক আগন্তুরতিথির্না গৃহাগতে।' আবেশিক, আগন্তুক প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও অতিথি অর্থের দ্যোতনা হয়। মহর্ষি পরাশরের মতে-

'প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খোপতিত এব বা।

সম্প্রাপ্তে বৈশ্বদেবা সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ।।'[১৪]

সংস্কৃত সাহিত্যে মানবধর্মের পরিচায়ক বহু আচরিতব্য কর্তব্য বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। এই আচরিতব্য কর্তব্যগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রাদির নিরিখে বা ধর্মশাস্ত্রগুলির বিচারে এই আচরিতব্য ক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে আচারাঙ্গের অন্তর্গত বলে প্রমাণ করা যায়। অতিথি চরিত্রের উপস্থাপন তার সেবা-সৎকারের মাধ্যমে ভারতীয় মনীষা উজ্জ্বল, উন্নত মনোভূমির নিদর্শন প্রতিস্থাপন করেছেন। অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে কিভাবে বিশ্লেষিত হয়ে ভারত সংস্কৃতির সুমহান দিকটিকে প্রস্ফুটিত করেছে তাই প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যজুড়ে এত সুন্দর সুন্দর জীবননীতি দৃষ্টান্ত উপমাসহযোগে বর্ণিত হয়েছে তা সমগ্র পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্পদ। ভাষায়, উপমার সৌন্দর্যে, নীতির মহনীয়তায় ও জীবনসত্যের সার সঙ্কলনে সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের পরম সম্পদ। একটি জাতির প্রজ্ঞাধৃত সংস্কৃতির সুবর্ণ সাক্ষর সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধর্মের মূল কেবল কথা নয় বা ধর্মজ্ঞানও নয়, আচরণে। এই আচরণ পালনের মধ্যে অতিথি সৎকারকে মহত্ব প্রদান করা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। সদাচার করলে মানুষ দীর্ঘায়ু, ধনবান ও উভয়লোকে যশস্বী হয়। দুরাচারী ব্যক্তিরা কখনও দীর্ঘায়ু লাভ করে না। নিজের মঙ্গল চাইলে অতিথি অভ্যাগত সৎকারাদি সদাচারের মাধ্যমে আপন কর্তব্যরাজি সমাধা করা আবশ্যক। গৃহে অতিথি সমাগত হলে তার আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার রীতি বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনুষ্যজীবনে 'চতুরাশ্রম' প্রথা প্রবর্তিত ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস- এই পর্যায় ছিল চতুরাশ্রমের ভিত্তি। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যশ্রম হল জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই আশ্রমেই সেবা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যগুলিকে উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করা যায়। গৃহী অন্যান্য আশ্রমিক জীবনের আশ্রয়স্থল ও প্রাণস্বরূপ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিকে দেবতার সমান গণ্য করা হয়। দেবতারূপ এই অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার রীতি-নিয়মাবলী

ভারতীয় ঐতিহ্যের তথা সংস্কৃতির বিশিষ্ট অংশবিশেষ। অতিথি সৎকাররূপ এই উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। অতিথি সেবার প্রসঙ্গ যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়ে আছে। তাই ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অতিথি প্রসঙ্গ সুচারুরূপে বিধৃত হয়েছে এবং সাহিত্যে এই সংযুক্তির কারণ হিসেবে বলা যায় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রসৃতিধারা অব্যাহত রয়েছে। একবিংশ শতকের অত্যাধুনিক ভারতবর্ষের বাসিন্দারা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতানুসারে আজও প্রতিবেশী দেশ বা সারা পৃথিবী থেকে আগত পরিভ্রমণকারীদের অতিথি বলেই অভ্যর্থনা জানান। শুধু তাই নয় অতিথি হলেন পিতা-মাতা-আচার্যের সমতুল্য দেবতা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পিতা-মাতা-আচার্য যেমন মহনীয়-বরণীয় ও পূজনীয় অনুরূপভাবে অতিথিও সমপর্যায়বাচী। অতিথির আপন মাহাত্ম্য বিস্তারে এবং অতিথি সৎকারের মহিমার কারণে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সদাচার অভিলাষী, মুক্তিকামী ভারতীয় মনন সর্বদাই অতিথি-অভ্যাগত সৎকারে ব্রতী। কারণ এর ব্যত্যয় হলে জীবনে ঘনাতো চরম দুর্যোগ এবং সদাচার বিঘ্নিত হত, অবরুদ্ধ হত স্বর্গের পথ- মুক্তি হতো অধরা। সংস্কৃত সাহিত্যে বিকীর্ণ অতিমূল্যবান সংস্কাররূপ মনিমুক্তো স্বরূপ অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ বিষয়ক সাহিত্যিক উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির এক সুমহান-গৌরবোজ্জ্বল ভাবধারাকে প্রকটিত করার প্রচেষ্টায় এই গবেষণা কর্ম। ভারতের এই নজিরবিহীন আতিথ্যবাৎসল্য প্রকাশ পায় স্বমহিমা বিস্তারে গৌরবে উদ্ঘোষিত হয় – 'অতিথি দেবো ভবঃ।'[১৫] আতিথ্যগুণ সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সমুজ্জ্বল নিদর্শন পাই পালনীয়, করণীয় আচার বিধির মাধ্যমে। প্রকৃষ্ট মনুষ্যত্ব প্রতিপাদক গুণাবলীর মধ্যে আতিথেয়তা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য- এই গুণটির সরসতায় সিক্ত হয়ে রয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা। তাই চতুর্বর্গ সাধনের নির্দেশিত পথে অতিথি সৎকাররূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি স্থান পেয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ও বৈদিক সাহিত্য,

ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে বর্ণিত আচার হিসেবে। প্রত্যহ যেসকল কর্ম যেভাবে করলে মানুষ ক্রমে ক্রমে উচ্চতর অধ্যাত্ম্য ভাবরাশি উপলব্ধি করতে পারে তারই উল্লেখ ধর্মশাস্ত্রগুলিতে দেখা যায়। মানুষের নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য। একদিনও তাকে বাদ দিয়ে চলা যায় না, তা সম্পাদনে দৃঢ়তাও দরকার। যেমন খুশি জীবন যাপনায় উন্নত চরিত্র গঠন হয় না। যেমন খুশি চলে পশুরা, তাদের জীবনে কোনও উচ্চাদর্শের প্রেরণা নেই। কিন্তু মানুষ তা নয়। মানুষের জীবন দেহকে জীবিত রাখার প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে একটা মহত্তর কিছু পাওয়ার চেষ্টায় যাপিত হয় - এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই যাপিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অতিথিজ্ঞান ও তার সৎকার উল্লেখযোগ্য, সদ্ভাবের অন্তর্গত। সদ্ভাবকে নিত্যই যথাযথ অনুশীলন করতে হয় তাতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে নতুবা সকল কর্মই পশুত্বে পরিণত হয়। কারণ দেহ হল এক ধরনের পশু; সেই পশুকে অতিথি সৎকারাদি সদাচারে নিয়ত প্রবৃত্ত না রাখতে পারলে দেহমাত্রজীবী মানুষ পরমার্থ থেকে হয় বঞ্চিত। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ আচরণ না করলে ধর্ম কেবল কথামাত্র। রামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন- 'পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল হবে, পাঁজি নিংড়ালে এক ফোঁটাও পড়বে না' অর্থাৎ আচরণ না করলে কেবল জ্ঞান আহরণ করলেই মুক্তিমার্গ প্রশস্ত হবেনা। সদাচার জীবনের অলক্ষণসমূহ দূর করে। শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহের মধ্যে আচারই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আচার থেকেই সঞ্জাত হয় ধর্ম, ধর্ম প্রভাবেই মানুষ হয় মহনীয় আর এভাবেই মানুষ অভীষ্ট লাভে হয় সমর্থ। তাই ভারত সভ্যতা-সংস্কৃতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রূপে অতিথি অভ্যাগত সৎকার উৎকৃষ্ট সদাচার। মানবিক অভ্যুদয়ের হেতুস্বরূপ আতিথেয়তা-তাই এর পরিপালন স্বীকৃত। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোড়নে ভারতীয় শাশ্বত মানব ধর্ম আজ পর্যুদস্ত। ব্যক্তিও পারিবারিক জীবন ও জীবনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে দিশেহারা। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বজায় রেখে মানুষ তার জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করবে তার সঠিক পথ নির্ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। ধর্মাচরণ ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মানুষের মনে যখন সঠিক চেতনার

উন্মেষ ঘটে তখনই হয় মানবজন্ম সার্থক। ধর্মাচরণই চেতনাবোধ জাগরণের এবং জাগতিক জীবন-সমস্যা অপনোদনের একমাত্র উপায়। জীবন-সমস্যা মুক্তির জন্য ধর্মাচরণের উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রকৃত ধর্মাচরণ সর্বাবস্থায় মানুষের সহায় এ বাক্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। আক্ষরিক অর্থেই কথাটি সত্য- বস্তুতঃ এটি বাস্তব অবস্থার যথাযথ বর্ণনা মাত্র। ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস চতুরাশ্রম নির্বিশেষে প্রতি আশ্রমের নির্ধারিত ধর্মাচরণই মানুষের প্রকৃত উপকারক, যার ফল ইহকালে বা পরকালে কখনোই আমাদের পরিত্যাগ করেনা। ধর্মাচরণ যে শুধু মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সাহায্য করে থাকে তাই নয়, মৃত্যুর পরেও তা আমাদের সহায়ক। তাই চতুরাশ্রম নির্বিশেষে অতিথি-অভ্যাগত সৎকাররূপ ধর্মাচরণ প্রতিটি মানুষের আপন আপন দেহ, মন ও আত্মার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ রূপায়ণের পথে সত্য সত্যই অগ্রসর করে। আমাদের জীবনের ইজম (Ism) বা মতাদর্শ যাই হোক না কেন এমনকি প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণাশ্রমের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হলেও আচরিতব্য বিষয়ের প্রভেদ থাকলেও, যদি আমরা অকপট হই তাহলে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগের দিক থেকে একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে জীবনে অগ্রগতির ধারণা অবশ্যই প্রত্যেক আশ্রমস্থিত মানুষের আপন আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উপলব্ধি ও বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর ধর্মাচরণ ছাড়া তা বাস্তবায়িত করার অন্য কোন পথ নেই। তাই যাঁরা ধর্মাচরণকে বোঝার মতো ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তাঁদের আত্যন্তিক মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়। জীবনচক্রের কঠিন বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ মানবজীবনে তাই জীবনের সমস্ত পর্যায়ভুক্ত নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্যাদি পালনের মাধ্যমে যাপিত হয় প্রকৃত ধর্মাচরণ যা সুগম করে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ। তাই ভারতীয় দর্শন ব্যাখ্যা করে যে মানুষের আচরিত ধর্মই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মসচেতনতা এনে দেয়; সামগ্রিকভাবে এই উপলব্ধি হলে মানুষ মুক্ত জীবে পরিণত হয়।

এই মুক্ত মানবই অবিমিশ্র সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর মধ্যে থেকেই বিচ্ছুরিত হয় প্রশান্তি, জ্যোতি ও মাধুর্য; এতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সংহতি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন থাকে।

বিমর্শ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা। 'ব্যাখ্যানতঃ শাস্ত্রপ্রতিপত্তিঃ' ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা ছাড়া বেদ-ধর্মশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রসঙ্গটিতে আলোকপাত করা সম্ভব হবে না। ব্যাখ্যার দ্বারা শাস্ত্রের অর্থোপলব্ধি হয়। আতিথ্য কেবলমাত্র গৃহস্থের কুক্ষিগত গুণ বা সম্পদ নয়- আতিথ্য সবার। আতিথ্য একটি সাধারণ ধর্ম। আতিথ্যের মধ্যে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান, সেবাপরায়ণাতা যেহেতু ধর্মশাস্ত্রে সাধারণ ধর্ম বলে প্রতিপাদিত তাই সেবাকার্যের অঙ্গমাত্র আতিথ্যও সাধারণধর্মে পর্যবসিত হয়েছে। আতিথেয়তা হল শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রায়োগিক ধর্ম। এর অন্তরালে রয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা। প্রশ্ন হতে পারে যে অতিথিসৎকারাদি কার্যে দার্শনিক ভাবনা কি রয়েছে? দর্শন ছাড়া যদি কোনকিছু প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটি সুবর্ণব্যতিরিক্ত সুবর্ণরথ সদৃশ হয়। সোনার রথ আছে কিন্তু সেখানে সোনা নেই অর্থাৎ দর্শন নেই কিন্তু প্রায়োগিকতা আছে। তাই দার্শনিকতাহীন প্রায়োগিকতা হল অপ্রাসঙ্গিক। সেই কারণে প্রয়োগমুখী চিন্তার আধিক্যে আমাদের আচরিতব্য কর্মাদির অন্তরালে দর্শনের তাৎপর্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। দর্শনের বিষয় আলোচনার জন্যই ব্যাখ্যাত্মক আলোচনা বা বিমর্শাত্মক অতিথিসৎকারের স্বরূপ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়।

গবেষণার পরিসরে অতিথি, আতিথ্য ও আতিথেয়তা এই তিনটি পদ বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই পদত্রয়ের পদসাধন নিম্নরূপ-

অতিথি

অততি সাতত্যেন গচ্ছতি, ন তিষ্ঠতি ইতি অতিথি অর্থাৎ অততি- সর্বদাই গমনার্থী কিন্তু যিনি স্থিতিশীল নন তিনি অতিথি-

যস্য ন জায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।

অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।।

অত্ + ইথিন্

- অত্ + ইথিন্ ('হলন্ত্যম্' সূত্র দ্বারা ন্ কারের ইৎ সংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' সূত্র দ্বারা ন্ কারের লোপ)
- অতিথি
- অতিথি + সু ('স্বৌজসমৌট্ছষ্টাভ্যাম্ভিস্ঙেভ্যাম্ভ্যস্ঙসিভ্যাম্ভ্যস্ ঙসোসাঙ্ ড্যোস্সুপ্' সূত্রদ্বারা ১ মা বিভক্তির ১ বচনে 'সু'-প্রত্যয় হয়েছে)
- অতিথি + স্ উ
- অতিথি + স্ উ ('উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' সূত্রের দ্বারা উ-এর 'ইৎ' সংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' সূত্রের দ্বারা 'উ' এর লোপ)
- অতিথি + স্ ('সুপ্তিঙন্তংপদম্' সূত্র দ্বারা পদ সংজ্ঞা)

↓

- অতিথি + রু ('সসজুষো রুঃ' সূত্রের দ্বারা 'স্' এর 'রু' আদেশ হয়)

- অতিথি র্ উ ('উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' সূত্রের দ্বারা উ-এর 'ইৎ' সংজ্ঞা ও

  'তস্য লোপঃ' সূত্রের দ্বারা 'উ' এর লোপ)

- অতিথি র্ ('বিরামোঽবসানম্' সূত্র দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হল)

  ↓

- অতিথিঃ ('খরবসানয়োবিসর্জনীয়ঃ সূত্র দ্বারা র্ এর স্থানে ঃ এর আদেশ)

আতিথ্য

অতিথি + ঞ্য (‘তস্যেদং’ সূত্র দ্বারা ‘ঞ্য’ প্রত্যয়)

- অতিথি + ~~ঞ~~ + য (‘চুটূঃ- সূত্রের দ্বারা কোন প্রত্যয়ের আদিতে যদি ‘চ’ বর্গ ও ‘ট’ বর্গের অন্তর্গত বর্ণসমূহ থাকে তাহলে তার ‘ইৎ’ সংজ্ঞা হয় ও ‘তস্য লোপঃ’ সূত্র দ্বারা তার লোপ হয়)

  (‘প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্’ সূত্র দ্বারা প্রত্যয় লোপ হলেও তার সত্তা অবশিষ্ট প্রত্যয়াংশে থাকে, এক্ষেত্রে ‘য’ এর মধ্যে ‘ঞিৎ’ এর ভাব আছে)

- অতিথি + য

  ↓

- আতিথি + য (‘অচো ঞ্ণিতি’ সূত্রের দ্বারা যে প্রত্যয়ের ‘ঞ’-কার, ‘ণ’-কার ইৎ হয়েছে এমন প্রত্যয় পরে থাকলে আদি স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়)

- আতিথ্ই + য (‘যচি ভম্’ সুত্রানুসারে ‘অতিথি’ এর ‘ভ’ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে ‘যস্যেতি চ’ এই সূত্র দ্বারা ‘ভ’ সংজ্ঞক ‘আতিথি’ এর অন্তর্গত ‘ই’ কারের লোপ হবে।)

- আতিথ্ + য

- আতিথ্য (সর্বসংযোগে আতিথ্যম্ ইতি পদং সিদ্ধম্)

আতিথেয়

'অতিথৌ সাধুঃ' এরূপ বুৎপত্তি করে অতিথি শব্দের উত্তর সাধু অর্থে (সাধু পদ এখানে √সাধ্ ধাতু নিষ্পন্ন, √সাধ্-ধাতু এখানে সেবা অর্থে প্রযোজ্য) 'ঢঞ্' প্রত্যয় হয়েছে।

- অতিথি + ঢঞ্ ('তত্র সাধুঃ' সূত্রানুসারে 'ঢঞ্' প্রত্যয় হয়েছে)

অতিথি + ঢঞ্ ('হলন্ত্যম্' সূত্র দ্বারা 'ঞ' এর 'ইৎ' সংজ্ঞা বিহিত হয়েছে ও'তস্য লোপঃ' সূত্র দ্বারা 'ইৎ' এর লোপ হয়েছে)

- আতিথি + ঢ্ অ ('অচো ঞ্ণিতি' সূত্র দ্বারা যে প্রত্যয়ের 'ঞ'-কার, 'ণ'-কার 'ইৎ' হয়েছে এমন প্রত্যয় পরে থাকলে আদি স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়)

- আতিথি + এয়্ অ ('আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখচ্ছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্' এই সূত্র দ্বারা 'ফ', 'ঢ', 'খ', 'ছ' এবং 'ঘ' প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত বর্ণের স্থানে আয়ন্, এয়্, ঈন্, ঈয়্ ও ইয়্ এর আদেশ হয়)

  ('যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানম্' সূত্রের দ্বারা 'ঢ' বর্ণের স্থলে 'এয়্' আদেশ হয়েছে)

- আতিথ্ ই এয়্ অ ('যচি ভম্' সূত্র দ্বারা 'আতিথি' এর 'ভ' সংজ্ঞা ও 'যস্যেতি চ' সূত্র দ্বারা ই-এর লোপ)
- আতিথ্ এয়
- আতিথেয় ('কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' সূত্রের দ্বারা 'আতিথেয়' এর প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হল)

➢ আতিথেয় + সু ('স্বৌজসমৌট্ছষ্টাভ্যাম্ভিস্ঙেভ্যাম্ভ্যস্ঙসিভ্যাম্ভ্যস্ ঙসোসাঙ্ ঙ্যোস্সুপ্' সূত্রদ্বারা ১

মা বিভক্তির ১ বচনে 'সু'- প্রত্যয় হল)

➢ আতিথেয় + স্ + উ ('উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' সুত্র দ্বারা 'উ' এর 'ইৎ' সংজ্ঞা হল)

➢ আতিথেয় + স্ + উ ('তস্য লোপঃ' সূত্রদ্বারা 'উ'এর লোপ হল)

➢ আতিথেয় স্ ('সুপ্তিঙন্তংপদম্' সূত্র দ্বারা পদ সংজ্ঞা)

➢ আতিথেয় রু ('সসজুষো রুঃ' সূত্রের দ্বারা 'স' কারের 'রু' আদেশ হয়)

➢ আতিথেয় র্ + উ ('উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' সূত্রের দ্বারা 'উ' এর 'ইৎ' সংজ্ঞা হল এবং

'তস্য লোপঃ' সূত্র দ্বারা 'উ' এর লোপ হল)

➢ আতিথেয় র্ ('বিরামোঽবসানম্' সূত্র দ্বারা অবসান সংজ্ঞা হল)

➢ আতিথেয় ঃ ('খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' সূত্র দ্বারা 'র্' এর স্থলে 'ঃ' এর আদেশ হল)

➢ আতিথেয়ঃ (সর্বসংযোগে আতিথেয়ঃ ইতি পদং সিদ্ধম্)

অতিথির সেবাকারকত্বরূপ ধর্ম হল আতিথেয়তা।

আতিথ্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ। আতিথ্য কেবলমাত্র আমার বাড়িতে কেউ এসেছেন আমি তাঁর সেবা করবো গৃহী হিসেবে এবং এটুকুই আমার কাজ যে তাঁকে আহার্য বা খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় দ্বারা সেবা করা বা তাঁর প্রীত্যোৎপাদন করা- তা কিন্তু আতিথ্যের সংজ্ঞা নয়। আতিথ্য পদের বুৎপত্তি দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আতিথ্য বিষয়ে কিছু গুণের

সন্নিবেশ ঘটে, অর্থাৎ আতিথ্যে কিছু গুণ সন্নিবিষ্ট আছে। ঋগ্বেদে পাওয়া যায় 'ত্বমাতিথ্যা ক্রিয়াশান্তিরথক্ষোভপরিশ্রমঃ' অর্থাৎ ক্ষোভ, পরিশ্রান্তি, শ্রান্ত এগুলি আতিথ্য শব্দের পর্যায়বাচী। তাহলে আতিথ্য যদি গুণের সন্নিবিষ্ট কারণ হয় তবে কেমন গুণের সন্নিবেশ হবে? এই বিষয়ে দুপ্রকারের গুণ সমাপতিত হয়। আতিথ্যের দ্বারা গুণ উৎপন্ন হচ্ছে দুইভাবে। আতিথ্য নামক ক্রিয়াটি দুভাবে আমরা দেখতে পাই - প্রথমতঃ এটি আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং দ্বিতীয়তঃ এটি অনিবার্য কর্তব্য। অবশ্য কর্তব্য হল যা না করলে প্রত্যবায় হয় অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় হবে আর অনিবার্যতা অর্থে আকাঙ্ক্ষা পূর্তির নিমিত্ততা দেখি। আতিথ্যে দুটি বিষয় রয়েছে- একজন যিনি অতিথ্যুচিত অর্থাৎ অতিথি গৃহে উপস্থিত হলে তার সেবাদি কার্য করছেন এবং আরেকজন যিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করছেন। দুজনের মধ্যেই গুণ-সন্নিবেশ হতে হবে। এই নয় যে শুধুমাত্র যিনি আতিথেয়তা প্রদর্শন করছেন তিনিই কেবল গুণের অধিকারী হবেন অর্থাৎ সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ, নিবেদন শুধুমাত্র অতিথিসৎকারীরই থাকবে আর যিনি অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর কোন ত্যাগ, নিবেদন থাকবে না- এই অর্থে কিন্তু আতিথ্য বিবেচিত হয় না। আতিথ্যকে যদি ধর্ম বা সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে সংস্কারের দুটি বিষয় ১. গুণাধান ও ২. দোষের অপনয়ন; অর্থাৎ গুণ উৎপাদিত হবে ও দোষ অপসৃত হবে। আতিথেয়তা কর্তব্যের দৃষ্টিতে কর্ম যেমন পঞ্চমহাযজ্ঞের নিরিখে আর আকাঙ্ক্ষা পূর্তি নিমিত্ত কর্ম। এই দ্বিতীয় পরিসরে তথা আকাঙ্ক্ষা পূর্তিনিমিত্ততায় সামাজিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। আকাঙ্ক্ষা (Need) পরিপূরণের জন্য শাস্ত্রে দিগ্দর্শন করা হয়েছে। আতিথেয়তা প্রসঙ্গের দার্শনিকতা এখানেই। প্রায়োগিকতা শুধুমাত্র কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা বা সৎকারাদি কর্মে ব্যাপৃত হওয়া।

আমরা প্রত্যেকেই মানুষ, আমরা পরিবার সৃষ্টি করি আবার আমরা সেই পরিবারের সদস্যও; অর্থাৎ একদিকে আমরা সৃষ্টিকর্তা আবার অপরপক্ষে আমরা সেই সৃষ্টিরই এক অংশ। একদিকে স্রষ্টৃত্ব অন্যদিকে সৃষ্টত্ব। এই দুটো বিষয়ই আমাদের মধ্যে সমান্তরাল যুগপদ অবস্থানে থাকে। আমাদের কুটুম্ব বা আত্মীয় বলতে যারা আমার জ্ঞাতি- শুধু তারা নয়, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বুঝি। তাই বসুধার সকলের প্রতি আমাদের আচরণের দিকটি একদিকে প্রয়োজনের দৃষ্টিতে অপরপক্ষে কর্তব্যের দৃষ্টিতে আতিথেয়তা প্রদর্শিত হয়। আমাদের জীবনের চারটি আশ্রমেই আতিথেয়তা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ভালভাবে ব্যাখ্যা করলে উপলব্ধ হয় যে দুটি আশ্রমের নিমিত্ত অপর দুটি আশ্রম আমরা পেয়ে থাকি।

গার্হস্থ্যাশ্রমের নিমিত্ত আমরা পাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম আর সন্ন্যাসাশ্রমের নিমিত্ত স্বরূপ হল বানপ্রস্থাশ্রম। চতুর্বর্গের যথার্থ অনুশীলনে দুটি আশ্রম হল সাধ্য আর দুটি আশ্রম হল সাধন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম গৃহস্থাশ্রমের প্রতি সাধন আর সন্ন্যাসাশ্রম সাধ্য হলে বানপ্রস্থাশ্রম তার সাধন। সাধ্য-সাধন সম্পর্কে অন্বিত আশ্রমগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল গার্হস্থ্যাশ্রম। অর্থাৎ অপর তিনটি আশ্রমের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না যদি গার্হস্থ্যাশ্রম থাকে। বৃহত্তর গার্হস্থ্যাশ্রমে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম যেমন- ক্ষুদ্র পরিবার থেকে বৃহত্তর সামাজিকতা অর্থাৎ পারিবারিক থেকে সামাজিক নিয়ম সমস্ত কিছুই প্রবিষ্ট হয়েছে। শৈশবে অনুশীলিত বিদ্যার প্রতিফলন ঘটে গৃহীর জীবনে। গার্হস্থ্যাশ্রমে অধীত বিদ্যার প্রায়োগিকতা রয়েছে। এই প্রায়োগিকতা আলোচিত হয়েছে-কর্তব্যের দৃষ্টিতে আর প্রয়োজনের তাগিতে। আতিথ্য হল সৎকার। সৎকার বলে ব্যাখ্যা করলে কারণ হল- আতিথ্যকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। নইলে অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণে আতিথ্যের যে অর্থ তা কিন্তু অধরা থেকে যাবে। ধর্মশাস্ত্রে কিছুটা হলেও সংকীর্ণ অর্থে আতিথ্যকে গ্রহণ করা হয়েছে। সংকীর্ণতার গণ্ডিতে অর্থশাস্ত্রেবর্ণিত আতিথেয়তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ল্যাটিন বা

গ্রীকদর্শনে আতিথ্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আতিথ্য গুরুত্ব পেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আতিথ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- ক. পারিবারিক আতিথ্য খ. সামাজিক আতিথ্য ও গ. প্রাতিষ্ঠানিক আতিথ্য। যদিও পরিবার ও সমাজ দুটিই প্রতিষ্ঠানের নামান্তর তবুও আতিথেয়তার প্রসঙ্গে ভিন্নরূপে এদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান কথাটি আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন এই যে আজকের দিনে যেকোন Management Institution এ আমরা দেখি সেটি কোন Private Farm বা Corporate Sector যাই হোক না কেন সেগুলি প্রতিষ্ঠান। যদিও এগুলির বৈধানিক নামকরণ বাঞ্ছনীয় তবুও সেখানে সাংবিধানিক বিষয় আলোচিত হয় বলেই সযত্নে একে প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। পরিবার ও সমাজ দুটো প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই বিভাগ কেবলমাত্র পৃথককরণের জন্য অর্থশাস্ত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক আতিথেয়তা বর্ণিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে আলোচিত আতিথ্যের প্রকার হল পারিবারিক ও সামাজিক। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক আতিথ্যের কথা সেইভাবে বলা নেই। প্রাতিষ্ঠানিক আতিথ্যের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে স্ত্রী ব্যতিরিক্ত আতিথ্যকর্মটি অসমাপ্ত। স্ত্রী না থাকলে দেবতারাও আতিথেয়তা গ্রহণ করেন না। তাই আতিথ্যকর্মে তিনি অনধিকারী হবেন যিনি দার পরিগ্রহ করেননি। তাহলে বিতর্ক হতেই পারে সন্ন্যাসাশ্রমে কি কেউ আতিথ্য ধর্ম পালন করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। তখন আতিথেয়তার ব্যাপক পরিসরটি গ্রহণ করতে হবে। ধর্ম শব্দের দুপ্রকার অর্থ আমরা পাই একটি ব্যাপক অর্থ আরেকটি পারিভাষিক অর্থ। এই দুটি অর্থই আলোচ্য। ধর্ম শব্দের পারিভাষিক অর্থ ধরলে ব্যাখ্যাত হয় কেউ নিজের জন্য অন্নপাক করবেন না যদি কেউ নিজের জন্য অন্নপাক করেন তাহলে তিনি পাপের ভাগীদার। এখানে দর্শন কোথায়? কোন কারণ ছাড়া বিনা প্রয়োজনে কেউ কারোর জন্য অন্ন ব্যয় করবে কেন? আমাদের প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে- সেটি সমাজে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে,

উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, যশের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, ভাবিনিকালে সর্বপ্রাপ্তি ঘটবে এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিমিত্ত আমরা প্রত্যেকেই কাজ করে থাকি। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিই মূল উদ্দেশ্য। কেবল নিজের জন্য অর্থাৎ আত্মকারণাৎ-নিজের ভোগের জন্য কেবল কোন কর্ম উচিত নয়, পরার্থে-পরের প্রয়োজনে তা উৎসর্গীকৃত হবে। তাহলে শুধু পরার্থে নিজের জন্য নয়। আত্ম ব্যতিরিক্ত পরার্থে নয় আত্মযুক্ত পরার্থ। ধর্মশাস্ত্রে কোথাও এ নির্দেশ নেই যে নিজেকে ছেড়ে পরার্থে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করতে হবে। অতিথিসৎকারের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। সৎকার কর্ম করতে হয় "মনোবচনকর্মভিঃ"- মন, বচন ও কর্ম দ্বারা। প্রকৃত মানসিকতার অভাব তবুও সৎকারে প্রবৃত্ত হয় আধুনিক যুগের মানুষ কেবলমাত্র বিজ্ঞাপিত হওয়ার জন্য, সামাজিক গণমাধ্যমগুলিতে আমরা প্রায়শই দেখতে পাই। তাই মন, বচন ও কর্মের একত্মতাতেই প্রকৃত সৎকার হয়। সামাজিক রীতি শ্রাদ্ধকর্মের মূল উদ্দেশ্য হল 'শ্রদ্ধয়া দীয়তে তদেব শ্রাদ্ধম্' তাই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে তা শ্রাদ্ধ হয় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে ব্যাখ্যাত হয়েছে- 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।'[১৬] সৎকারাদির অঙ্গ হিসেবে দান করতে হবে শ্রদ্ধার সাথে। তাই নিবেদন হবে শ্রদ্ধাপূর্বক। আর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ- 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।'[১৭] গীতার ৩/১৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে- যিনি নিজের কারণেই কেবল ভোগ করেন তাঁর কর্মের প্রত্যবায়জনিত পাপভোগ হয়। অতিথি হতে গেলে তাঁরও কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী প্রয়োজন, ধর্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও এ বিষয় একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। অতিথি একরাত্রকাল স্থায়িত্ব ছাড়া যদি আরেকটু বেশি সময় থাকেন তাহলে তাঁর সৎকারের ক্ষেত্রে কি হবে? বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয়তার বিচারে তখন একরাত্রির বেশি অতিথিসৎকার হতে পারে। তবে এই প্রয়োজন অতিথি ও আতিথেয়তাকারী দুজনেরই থাকতে হবে অর্থাৎ দুতরফেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণার্থে একরাত্রির বেশি আতিথেয়তা প্রদর্শন ও

গ্রহণ হতে পারে। কিন্তু সেখানে মন, বচন ও কর্মের মধ্যে বচন থাকবে অনুপস্থিত। অতিথিসৎকারের মানসিকতা ও কর্মপ্রয়োগের অবতারণা থাকবে।

নববধূকে আগে খেতে দেওয়ার প্রসঙ্গে মনু বলেছেন স্ত্রী এবং শ্রী গৃহে দীপ্তিতুল্যা। এক্ষেত্রে নববধূ নবলক্ষীর সাথে তুলিত। তবে গৃহে আগে লক্ষীর সৎকার আবশ্যক তারপর অতিথি। অতিথিকেও অন্যের বাড়িতে অতিথিরূপে উপস্থিত হতে গেলে প্রয়োজননির্দিষ্ট হয়ে গমন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে আসলে তিনি অতিথি নন।

অতিথিকে অন্নদানের দার্শনিকতা প্রসঙ্গে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- খাদ্য ও প্রাণ এদুটি সমার্থক। খাদ্য কাউকে দান করলে তা প্রাণদানের সমতুল্য- 'অন্নে স্মৃতানি ভূতানি অন্নং প্রাণমিতি শ্রুতি। তস্মাৎ অন্নং প্রদাতব্যম্। অন্নং হি পরমম্ হবিঃ।' পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্যযজ্ঞে যখন যজ্ঞ নিষ্পন্ন হচ্ছে তখন সেখানে হবির্প্রদান কোথায় হচ্ছে? তার উত্তরে বলা যায়- 'অন্নং হি পরমং হবিঃ।' অর্থাৎ মনুষ্যযজ্ঞে হবি হল অন্ন। অন্ন এখানে কেবল অন্ন দানমাত্রই নয় সৎকার অর্থে প্রযুক্ত। মনুষ্যযজ্ঞে এই সৎকার কর্ম আবশ্যিক, এই সৎকার না হলে প্রত্যবায় হবে। অন্নদানের লাভ বা ফলপ্রসূতা কি হয়? অন্নদানে মানসিকতার আদান প্রদান হয়। ব্রহ্মচারী যখন গৃহীর গৃহে ভিক্ষার জন্য যান তখন নিয়ম আছে ন্যূনতম একগ্রাস পরিমাণ অন্ন গৃহীকে দিতে হয়, একগ্রাসের কম অন্ন দিলে প্রত্যবায় হবে। 'যথা অন্নং তথা মনঃ' অন্নের সাথে দাতা-গ্রহীতার মানসিকতার আদান-প্রদান হয়। গৃহস্থ তার কর্তব্য অন্যের প্রতিপালনরূপ কর্মটি সৎকারের মাধ্যমে করে থাকে। এই অন্ন গ্রহণের মাধ্যমে যিনি ব্রহ্মচারী ঐ মানসিকতাকেই গ্রহণ করেন যে প্রতিপালন অর্থাৎ অপরের প্রতিপালন অবশ্য কর্তব্যকর্ম। এরপর সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমী যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবেন তখন তাঁর একটি কর্তব্যদৃষ্টিতে অতিথিসৎকারের দায় জন্মায়। অন্য যাঁরা যাচক, যাঁরা ভিক্ষা প্রার্থনা করতে আসবেন বা যাঁরা

সৎকারযোগ্য তাঁদের সৎকার করা একটি দায়। এটি একটি সামাজিক চুক্তি বা Social Contact। তাই শুধু অন্নদান বা ভিক্ষাগ্রহণ হিসেবে এই সৎকারকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না এটির সামাজিক ব্যবহার বিধি বিস্তৃত। মানসিকতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিক অভ্যুদয়কে অতিক্রম করে অতিথিসৎকারের দ্বারা সামাজিক অভ্যুদয়ের দিকটি প্রকাশিত।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহারাজা দুষ্যন্ত ও দুর্বাসা দুজনেই অতিথি। কিন্তু দুজনে কি একই রকম অতিথি? দুষ্যন্তকে কি প্রকৃত অর্থে অতিথিসৎকার করা হয়েছিল? ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে অতিথিকে জাতি, কুল, নাম জিজ্ঞাসা বারণ। কিন্তু দুষ্যন্তকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- আপনি কোন কুলোদ্ভূত রাজর্ষি বংশকে অলঙ্কৃত করেছেন? ধর্মশাস্ত্রানুসারে অতিথিকে কিন্তু এজাতীয় প্রশ্ন করা যায় না। দুর্বাসাও কিন্তু তপোবনে প্রবেশ করে নিজের নাম, কুল-গোত্র উল্লেখ করেননি, যখন তাঁর প্রতি যথোচিত সৎকার হয়নি তখন তিনি বলেছেন আমার মত ব্রাহ্মণকে উপস্থিত থাকতে না দেখে বা আমার মত ব্রাহ্মণের উপস্থিতি যে বুঝতে পারলোনা সে অতিথিপরিভাবিনি। কিন্তু পতিচিন্তা একজন পত্নীর পক্ষে যথেষ্টকর্ম। কিন্তু শকুন্তলার ক্ষেত্রে নাটকে অতিথিসৎকার আবশ্যিক কর্ম ছিল। দুষ্যন্তকে তাঁর নাম কুল, গোত্র জেনে রাজোচিত আতিথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু ঋষি দুর্বাসার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেননি শকুন্তলা। অনন্যহৃদয়া শকুন্তলা দুর্বাসার উপস্থিতি টের পাননি তাঁর অন্য কারণ ছিল, তাসত্ত্বেও অতিথিসৎকারের আচরণ হয়েছে, সেই অকরণরূপ কৃতকার্যের প্রত্যবায় হবে; কারণ এটি অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য কর্তব্যের যথাযথ পালন না হলে তার প্রত্যবায় ঘটে ও সামাজিকতার পরিপন্থী হয়, আচার পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবিধান তৈরী করে। যদি অনিবার্য কর্তব্য পালিত না হয় তা কিন্তু সংবিধানের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক বিষয় বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য কর্তব্যের প্রত্যবায় হওয়ার ফলে শকুন্তলা অভিশপ্ত হয়েছেন, তাই

অতিথিসৎকার আবশ্যিক কর্তব্য। কোন ব্যক্তিক কর্ম যদি সামাজিকতার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে সেই ব্যক্তিগত কর্ম বিবর্জনীয় অর্থাৎ ত্যাগ করতে হয়। শকুন্তলার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, শকুন্তলা পতিচিন্তায় রত এটি ব্যক্তিক কর্ম, এটি একান্তই শকুন্তলার ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু শকুন্তলার অতিথিসেবা করা তার অবশ্য কর্তব্য-এটি একটি সামাজিক বিষয়। তাই এই সামাজিক বিষয়ে ও ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় ব্যক্তিগত বিষয় অবশ্যই বলবান হয় না; তখন কিন্তু সামাজিক বিষয়টি বলবত্তর। তাই সামাজিক বিষয়ে অকর্তব্যের অকরণের ক্ষেত্রে শকুন্তলা অভিশপ্তা হয়েছেন।

পূজার্চনার সময় অতিথিরূপে দেবতাকে যখন আহ্বান করি তখন বলি ‘ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহাতিষ্ঠ ইহাতিষ্ঠ, ইহসন্নিধিং কুরু’। পূজাকর্ম আমাদের বাহ্যিক কর্ম। দেবতাকে প্রথমে আমরা আহ্বান করি বচনের দ্বারা, পূজনের মানসিকতা তো আছেই। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত অতিথিসৎকারের অংশ হল অনুব্রজ্যা। পূজাকর্মে ও দেবতাকে আমরা পূজন শেষে বলি আপনি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে পুনরায় গমন করুন। পূজা মানেই সৎকার বা আত্মনিবেদন। পূজাক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কটি আত্মীয়তার সম্পর্ক। প্রথমে দেবতাকে আহ্বান করতে হয়; এই সময় দেবতা বাহ্যিক সত্তা বা অতিমানবিক সত্তা কিন্তু তিনি চলে আসার পর তাঁর সৎকার যখন করি তাঁর সাথে তখন একাত্ম হতে হয়। তাই পূজাকর্মে যতগুলি অঙ্গ আছে সেগুলির ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় ‘ঊর্ধ্বে ব্রাহ্মণায় নমঃ, পার্শ্বে ব্রাহ্মণায় নমঃ’ তারমানে ব্রাহ্মণের অবস্থান ঊর্ধ্বে, নিম্নে, পার্শ্বে সর্বত্র। নিজেকে যে আসনে অবস্থিত করা হয় তাকে বলে ব্রহ্মাসন। অর্থাৎ দেবতার সাথে সাযুজ্য কল্পিত হচ্ছে এই দেবতার সাথে সাযুজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দেবতারা পূজা গ্রহণ করবেন না।

দেবতাকে আমি যদি নিজের ভাবতে না পারি, আত্মীয় ভাবতে না পারি দেবতারা সৎকার গ্রহণ করবেন না। তার জন্য মানসিক, বাচিক এবং কর্ম অবশ্য এই কর্মগুলি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনা দ্বারা করা হয়ে থাকে- এগুলি আবশ্যক, তার সাথে প্রয়োজন মানসিক আকুতি বা নিবেদন। নিবেদনই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব যেই হন অতিমানবিক সত্তা বা দেবতা তিনি আমার মধ্যে অধিষ্ঠান করুন। আপনাতে আমাতে পার্থক্য নেই। যখন অগ্ন্যাধান করা হয় তখন অগ্নির কল্পনা নিজের মনের মধ্যে হোতাকে করতে হয়।

সৎকার অর্থে অনুজীবী-বা ভৃত্যদের যে সৎকার তা হয় আত্মস্বীকৃতি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য- আত্মোপলব্ধির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self establishment Via self actualization)। আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে কতকগুলি জৈবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, সংস্থান ইত্যাদির সাথে সাথে নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা থাকে বা Safety need থাকে। এই নিরাপত্তা বিভিন্ন প্রকার হয়- মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক নিরাপত্তা যা মানুষ চায়। এই নিরাপত্তা থেকে আমাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক মর্যাদাই আত্মপ্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। এই আকাঙ্ক্ষা সকল অনুজীবী ও ঊর্ধ্বতন সকলের মধ্যে বর্তমান। আকাঙ্ক্ষা পূরণ অনিবার্য কর্তব্য। প্রতিষ্ঠান প্রধানের তার অনুজীবীদের প্রতি এই নিরাপত্তা প্রদান হল অনিবার্য কর্তব্য। অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি যদি এটা না দেন তাহলে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। ভারতীয় সংবিধানেও এই বিষয়গুলি বর্ণিত আছে- Right to live With human dignity অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা সহ বেঁচে থাকার অধিকার, এই অধিকার কিন্তু আমাদের সংবিধান প্রদত্ত। তাই এটি অধিকারের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত, কর্তব্যের দৃষ্টিতে নয়। আমাকে আমার প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান যে নিরাপত্তা দেবেন সেই নিরাপত্তা কিন্তু অধিকারের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত, তা কর্তব্যের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। Charles Erwin বলেছেন- ‘Men realize they have more

ability than think they have, so that they constantly do better work than they thought they could.’

যদি মানুষ বুঝতে পারে যে আমার সামর্থ্য আমার থেকে অনেক বেশি রয়েছে তাহলে বুঝতে হবে তার প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার কারণে সে এই আত্মোপলব্ধি করতে পেরেছে এই আত্মোপলব্ধি যত প্রবল হবে ততই আমাদের কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে। Management Course গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে আতিথেয়তা সম্পর্কে সেখানে দার্শনিকতার অভাব থাকে, প্রায়োগিক শিক্ষায় সেখানে আতিথেয়তা প্রাধান্য পায় তাই কিছুটা হলেও তা কৃত্রিম বলে মনে হয়। প্রথমেই শিক্ষা দেওয়া হয় বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিনয়ী হতে হবে। কিন্তু এই বিনয়ী হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য অজ্ঞাত থাকলে প্রায়োগিকতা হঠকারিতাতে পর্যবসিত হয়। হঠকারিতার ফলেই আধুনিক সমাজে আতিথেয়তার বিনিময়ে বলপূর্বক পারিতোষিক আদায় দেখা যায়। প্রকৃত প্রীতি উৎপাদিত হলে যদি পারিতোষিক দান করা হয় তবেই তা কাম্য কিন্তু যখন সেখানে বলপূর্বক আদায়ের ইচ্ছা যদি জন্মায় তা কিন্তু কাম্য নয়। আতিথেয়তার প্রকৃত দার্শনিক প্রেক্ষাপট এখানেই।

ভারত-সংস্কৃতির লক্ষ্য- মুক্তি, স্বাধীনতা, ঔদার্য, শান্তি, আনন্দ, প্রেম ও ঐক্য। এই মুক্তি বা মোক্ষ হল সার্বিক মুক্তি। ভারত-সংস্কৃতি দেখিয়েছে প্রকৃত শাশ্বত শান্তির পথ। ভারত-সংস্কৃতি কোনোদিন Pleasure বা ইন্দ্রিয়সুখকে গুরুত্ব দেয়নি, সে বরণ করেছে Bliss বা স্বর্গীয় আনন্দকে। ভারতাত্মা অল্প সুখের কাঙাল নয়, সে চেয়েছে ভূমা-সুখকে। ভারতের সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রাচীন দর্শন, প্রাচীন আচার, ব্যবহার, ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক ও অন্যান্য নানা কাহিনীর সংমিশ্রণে নির্মিত। এর কোন উপাদানই বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক নয়। আপামর ভারতীয়ের ওপর এর প্রভাব অসামান্য। ভারতের গণজীবনে রামায়ণ-মহাভারতের কথাকাহিনী,

নীতি-উপদেশ, সদাচার পালনের দৃষ্টান্ত, কর্মচ্যুত ব্যক্তির বিড়ম্বনাময় জীবনের দৃষ্টান্ত কী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে - দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

সংস্কৃতি-সদাচার হয় মানুষের। অন্য প্রাণীর সংস্কৃতি, ব্যবহারিক জীবনের পালনীয় নিয়মাবলী বলে কিছু নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত পরিচয়ই তার সংস্কৃতি ও আচরণ। ভারতের জনগণের সংস্কৃতি স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্যকরূপে কৃতির বা কাজের ভেতর দিয়ে বা দৈনন্দিন জীবনচর্যার প্রতিফলনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনায় রত। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি মনে করে তার আপন সংস্কৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মনুষ্যজীবনের পালনীয় আচার ব্যবহারে। শ্রেষ্ঠত্বের আরও দুটি বিশেষ কারণ হল সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব ও অমরত্ব। ভারত সংস্কৃতি এই দুই গুণেই গুণান্বিত। ভারত-সংস্কৃতি আবহমানকাল থেকে বহিরাগত বৈদেশিক শক্তি দ্বারা যত পরিমাণ অত্যাচারিত হয়েছে বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দেশের সংস্কৃতির ওপর এই সঙ্কটের ঝড় বয়ে যায়নি। তবুও আশ্চর্যের বিষয় হল শত বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও ভারতের সংস্কৃতি আপন মহিমায় ভাস্বর তার পবিত্রতা, ঔদার্য, পরমতসহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীনতা, অতিথিবাৎসল্য, অভ্যাগতপরায়ণতা প্রভৃতি বিশেষ গুণাবলীর জন্য। যার দ্বারা অমরত্ব অধরা থেকে যায়- ভারত তার সাধনে কোনদিনই মনোনিবেশ করেনি। 'ন কর্মণা, ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ'[১৮]– অর্থাৎ কর্ম, সন্তান বা বিত্তের দ্বারা নয় একমাত্র ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। এই ত্যাগের মনোভাব আসে সহনশীলতা, পরার্থোপকারিতা, সম্মান জ্ঞাপনের মানসিকতা থেকে। এই চৈতন্যাভিমুখী দৃষ্টি ভারতীয় সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। আতিথেয়তা একটি বিরল ও দুর্লভ গুণ ভারত সংস্কৃতির- যার দ্বারা পরমার্থের পথ হয় প্রশস্ত। জাগতিক ঐশ্বর্যের জন্য কখনও ভারত-সংস্কৃতি আতিথেয়তায় ব্রতী হয় না,

অপরকে যোগ্য সম্মান-অভ্যর্থনা জ্ঞাপনাদি কাজ ভারতীয় জীবনচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সাধনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য সকল সংস্কৃতির মধ্যে নিজস্ব মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহিরাক্রমণ, রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক বিপর্যয় কোন কিছুই ভারতের প্রাণমন্দাকিনীর গতিরোধ করতে পারেনি। কারণ ভারতবাসী তার প্রাত্যহিক জীবনে আচরণীয় কর্তব্যাদির মধ্যে সত্যবাদিতা, নির্লোভতা, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাই স্বকীয়ত্বে ভারতের সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা, কারণ একমাত্র ভারতের সংস্কৃতি বা ভারতীয় মননে সর্বদাই জড় জগতের সাফল্য প্রাধান্য না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে আত্যন্তিক মুক্তি। তাই এই প্রার্থিত মুক্তির আস্বাদে ব্যাপৃত হয়েছে ভারতজীবন; বেদ-উপনিষদ-ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-মহাকাব্যাদির নির্দেশিত পথে পরমার্থের সন্ধানে। এই অমিত সন্ধান সার্থক হয় তখনই যখন ভারতীয় সংস্কৃতিমনস্ক-সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তার প্রার্থিতকে লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে এই পরমার্থ সাধনের সহায়ক কারণ হিসেবে এবং ভারত সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ হিসেবে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. 'The Evolutionary Vision' সম্বন্ধে বক্তৃতা, তৃতীয় খণ্ড, Issues in Evolution, পৃষ্ঠা ২৫২

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪-৫

৩. Eastern Religion and Western Thought, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২

৪. ঋগ্বেদের ১/১৮৭ তম সূক্তে ধর্ম শব্দটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে পরিপোষক বা সমার্থক। পক্ষান্তরে অনেক জায়গায় ধর্ম শব্দটি ক্লিবলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. ঋগ্বেদ ১/২২/১৮, ৫/২৬/৬, ৮/৪৩/২৪

৬. ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ২/২৩

৭. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/২৩

৮. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/৩৫

৯. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/৭

১০. পূর্বমীমাংসাসূত্র ১.১.২

১১. মনুসংহিতা ২.৬

১২. মুক্তিকোপনিষদ্ ২/৫-৬

১৩. মনুসংহিতা ৩/১০২

১৪. পরাশরসংহিতা ১/৩৯

১৫. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১/১১/২

১৬. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১/১১/৩

১৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৩৯

১৮. অবধূতোপনিষদ্-৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক বাঙ্ময়ে আতিথেয়তা প্রসঙ্গ

বৈদিক বাঙ্ময়ে আতিথেয়তা প্রসঙ্গ

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে কয়েকটি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে মিশরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ও মায়াসংস্কৃতি বর্তমানে মৃত; প্রাচীন গ্রীক ও রোমানীয় বা রোমীও সংস্কৃতিকেও বর্তমানে জীবিত বলা যায় না। একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই আজও সপ্রাণ ও জীবন্ত। সুদূর অতীতে আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভূমিতে স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছিল এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য যার মধ্যে বিধৃত আছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ যখন জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখার অভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গভীর-গহন তমিস্রায় আচ্ছন্ন, সে সময় আর্যসভ্যতার জ্ঞানগরিমায় ভারতবর্ষ মহীয়ান। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের উৎস হল বেদ। বেদ ভারতাত্মার মর্মবাণী। বেদ শাশ্বত-সনাতন। ঋকসংহিতার কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনার অন্তিমপর্ব পর্যন্ত যে সুবিশাল সাহিত্য কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির নয়, বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল তাকে বৈদিকসাহিত্য রূপে অভিহিত করা যায়। এই সাহিত্যকে পৃথিবীর উন্নততম প্রাচীন সাহিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। বেদ শুধু ভারতের নয়, এটি নিখিল বিশ্বের, সমগ্র মানবজাতির। পৃথিবীতে এক জাতি– মানবজাতি; এক সমাজ– মানবসমাজ; এক ধর্ম-মানবধর্ম। এই মহান ঐক্যের মর্মবাণী ঘোষিত হয়েছে ঋগ্বেদে-

‘সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।’[১]

'বেদ' শব্দ জ্ঞানার্থক √বিদ্ থেকে নিষ্পন্ন। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা পরমজ্ঞান। নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মানবের বাক্য, মন যে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না সেই অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞান আমরা 'বেদ' থেকে লাভ করতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন-

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।

এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।'

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভের কোনও উপায় নেই সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায় বলে এই ধর্মগ্রন্থকে বেদ বলে। এখানে ধর্ম শব্দাংশটি পারিভাষিক-ধর্ম এখানে Code of Conduct। তাই বেদের নির্দুষ্ট লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন সায়াণাচার্য– 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকম্ উপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ'। অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের মূল লক্ষ্য হল সমগ্র জীবনে ইষ্টের প্রাপ্তি ও অনিষ্টের বর্জনের উপায় অবলম্বন করা- এই উপায়ের মধ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষগোচর হাতে গরম কোন উপায়ের নির্দেশ বেদ দেয় না, তাই ইষ্টপ্রাপ্তি-অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ নির্দেশ করে তাই হল বেদ। তাহলে প্রমাণিত হল যে বেদ একটি গ্রন্থ- যেটি অনাদিকাল থেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় সম্প্রদায়ক্রমে শ্রবণবিধৃত ও স্মৃতিসঞ্চিত হয়ে প্রবর্তিত হয়ে এসেছিল। বহুকাল পরে তা লিপিবদ্ধ হয়- লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুগাদ্যকাল থেকে আচার্য মুখে শ্রবণ করে শিষ্য বেদমন্ত্র শিক্ষা করত ও মেধাবলে স্মৃতিভাণ্ডে সযত্নে সংরক্ষিত করত। এভাবে বৈদিক সম্প্রদায়ে আচার্য, শিষ্য, প্রশিষ্য, প্রশিষ্যের শিষ্য পরম্পরা পরমজ্ঞানের আকর বেদ শ্রুতিতে রক্ষিত হতো বলে বেদের আরেক নাম শ্রুতি। প্রাচীন ও সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বৈদিক ঐতিহ্যে 'বেদ' শব্দটিকে জ্ঞানসামান্য বা সাধারণভাবে যেকোন জ্ঞান অর্থে গ্রহণ না করে জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত জ্ঞান অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কিন্তু বেদ বলতে একটি নির্দিষ্ট

সাহিত্যকেই বুঝে থাকেন; তাঁদের মতে ভারতীয় তথা ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্য বেদ। অবশ্য সাহিত্য অর্থেও বেদ কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থমাত্র নয়- বহু শতাব্দী ধরে রচিত ও আচার্য পরম্পরায় সংরক্ষিত বহু গ্রন্থের সমষ্টিকেই ব্যাপক অর্থে বেদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যদিও সংকীর্ণতর ও প্রচলিত অর্থে এই সুবিশাল সাহিত্যের মধ্যে মাত্র একজাতীয়কেই অর্থাৎ প্রাচীন মন্ত্র সংকলন বা সংহিতাকেই বেদ বলা হয়। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে বিধৃত বেদ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ সম্বলিত। ঋক-সাম-যজু অথর্ববেদ নির্বিশেষে তাদের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের সামগ্রিক বিরাজমানতাই বৈদিক সাহিত্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল শুরু হয়েছে বৈদিক যুগ দিয়ে। তাই প্রাক্ বৈদিক প্রাচীন কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি ভারত ভূখন্ডে যদি থেকেও থাকে তা বৈদিক সংস্কৃতির মাঝে জীর্ণ হয়ে গেছে। বৈদিক সংস্কৃতিকে উপজীব্য করেই ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়েছে। বৈদিক যুগের ইতিহাসের পুরাতত্ত্বীয় উপাদান বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই কিন্তু সমধিক মূল্যবান উপাদান আছে বৈদিক সাহিত্যে। যেকোন সাহিত্যে আমরা পাই জাতির অন্তরের ইতিহাস, তার যথার্থ আত্মপরিচয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসকে অনুধাবন করার জন্য তাই বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত ভাবনার অনুশীলন অপরিহার্য। বৈদিক সাহিত্য আর্যভাবনার বাহন। এই সাহিত্য ভারতীয় মনীষার বিদগ্ধ মননের সৃষ্টি; এই সাহিত্যে অন্তর্নিহিত ভাব এবং চমকপ্রদ ভাষার এক সুসম্বদ্ধ মেলবন্ধন ঘটেছে। সুসম্বদ্ধ বলেই বৈদিক সাহিত্যকে আদিমানবের অস্পষ্ট মননের সঙ্গে কখনোই উপমিত করা চলে না। বৈদিক সাহিত্যে আমরা পাই দীর্ঘযুগবাহিত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও সাধনার একটি পরিনিষ্ঠিত রূপ, যা বিশ্ব মানবের অন্তর্নিহিত চিৎপ্রকর্ষের কতকগুলি অনিবর্তনীয় সঙ্কেতের বাহন। মানবের প্রাণধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে এই সঙ্কেতগুলি বস্তুতই সনাতন। তাই মানুষের মানবিক-চারিত্রিক-আধ্যাত্মিক-সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী ও উপাদেয় এই সনাতনী সঙ্কেতরাজি যা বৈদিক সাহিত্য

সমূহে বিকীর্ণ রয়েছে তা থেকে মানবিক উৎকর্ষতার রসদ অনুসন্ধান করা ও তা উপস্থাপন করাই এই গবেষণার কর্তব্য।

সভ্যতার উদ্যোগপর্ব থেকেই মানুষ যেমন চেয়েছে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি তেমন লোকান্তরেও সে চেয়েছে আনন্দ ও শান্তি। দর্শনশাস্ত্রের অভিমুখে বলতে গেলে একদিকে মানবকুল যেমন চেয়েছে অভ্যুদয়, অপরদিকে তেমনিই তার প্রার্থিত ছিল নিঃশ্রেয়সও। ঈপ্সিতলাভের জন্য উপায়ের অনুসন্ধান সে যেমন করেছে, তার সাথে সেই উপায়কে সুনিশ্চিত করতে মানুষ নিজের প্রয়াস ছাড়াও নানা নামে, নানা ভাবে নানান অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা নিবেদনও করেছে। বৈদিক যুগের মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈদিকযুগে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের যে প্রয়াস ও সাধনা প্রচলিত ছিল তার বিবরণ আমরা বিভিন্ন বেদে তথা বৈদিকসাহিত্য ভাণ্ডারে পাই। এই সাহিত্যের আয়তন অতি বৃহৎ। একটি জাতির বহু সহস্রব্যাপী অধ্যাত্মচিন্তার ও কর্মবাদের ধারাকে এই সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আজও একবিংশতি শতকের দোরগড়াতে উপনীত অত্যাধুনিক মানুষ সেই সংরক্ষিত সনাতনী আদর্শকে পাথেয় করেই এগিয়ে চলেছে। কালক্রমে মানুষের ভাষা বদলায়, তার আচার-ব্যবহারের অদল-বদল হয়। কিন্তু ভাবের অন্তর্নিহিত সত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে কোনও জাতির অন্তর প্রকৃতির খুব যে বদল হয় তা নয়। বৈদিকসাহিত্যের আলোকে বিস্তারিত আচরিতব্য ধারা সমূহের সার্থকতা আজও অব্যাহত। সে ধারাকে অনুসরণ করবার প্রয়োজন আজও আমাদের ফুরিয়ে যায়নি বলে কালের ব্যবধানে বর্তমান সমাজে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও বৈদিক ঋষিদের সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট মার্গনির্দেশ আজও আমাদের পাথেয়।

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয়দের প্রাবীণ্যের বা শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হল সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ভারতের ধর্মচিন্তার ও সভ্যতার উৎস স্বরূপ হল ঋগ্বেদ। প্রাচীনত্বে এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদায় পৃথিবীর সমূহ গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হলেও বর্তমানে সেগুলি বিলুপ্তপ্রায়। মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদ নির্বিশেষে বৈদিক সাহিত্যের বিভাগগুলির প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সংহিতা বা সংকলন গ্রন্থ বা মন্ত্রভাগের সাথে বাকি বৈদিক সাহিত্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। সংহিতা বা মন্ত্র-সংকলনগুলিই বৈদিক সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতাকেই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তি বলা হয়। বেদমন্ত্রের মধ্যে যেগুলি পাদবদ্ধ, ছন্দোনিবদ্ধ এবং একেকটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক সেগুলিকে বলা হয় 'ঋক্' বা 'মন্ত্র'। ঋগ্বেদের মন্ত্র আদিতে ঠিক কী উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে বর্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে কোন তর্কাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক পাঠকের পক্ষে ঋগ্বেদের সর্বত্রই যজ্ঞনিদর্শন অন্বেষণ যেমন নিরর্থক তেমনি যজ্ঞনিরপেক্ষভাবে সমগ্র ঋগ্বেদকে অনুধাবনের প্রয়াসও অবাস্তব। বৈদিক ঋষিরা ভাবের আবেশে দেবতার যে-প্রশস্তি রচনা করেছেন যজ্ঞের আদর্শকে সামনে রেখে, ঋকসংহিতায় তারই সঙ্কলন করা হয়েছে। সব প্রশস্তিই একসময়ে রচিত হয়নি কিংবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডই যে রচনার উপলক্ষ্য তা নয়। বহু সূক্তেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবি হৃদয়ের কেবলমাত্র উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। ঋগ্বৈদিক মন্ত্রগুলির সাহিত্যিক গাম্ভীর্য অটুট রেখে হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে বিচার করলে পাওয়া যায় অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গটিকে। সাহিত্যিক বিচারে মন্ত্রসমূহে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ বহু ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে বর্ণিত অগ্নি দেবতার ব্যাপকতা সুবিশাল। অগ্নিদেবতার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য বেদসাহিত্যে যেভাবে বিতানিত, তাতে অগ্নি দেবতার প্রাধান্য মণ্ডিত মহিমা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীনতম জীবনচর্যা থেকে আধুনিকতম জীবনযাত্রার কেন্দ্রে অগ্নির অবিসংবাদিত উপস্থিতি, তার উত্তাপের দ্বারাই প্রাণীর প্রাণস্পন্দন ধৃত। যাগের প্রথম কর্মই হল অগ্নিসংস্থাপন, অধ্যাত্মজগতে বলের সাধনায় প্রথম সোপান অগ্নিবিদ্যা। ঋগ্বেদে যদিও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সূক্ত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেও ঋষি-দৃষ্টিতে অগ্নি পরম কাম্য দেব। বেদের অগ্নিদেব কখনো দ্যুলোকে সূর্য, কখনো অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, সাগরে বাড়বানল, কখনোবা গৃহোপান্তে রক্তাভ যাগাগ্নি। বৈদিক জীবনের কেন্দ্রেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান। শ্রৌত বা স্মার্ত সকল কর্মেই তার সতত অপরিহার্যতা। অগ্নির উৎস পৃথিবী হলেও জল থেকে বহুবার অগ্নির উদ্ভব বেদে কথিত হয়েছে এবং একই নিঃশ্বাসে বেদে তার তিনটি উৎসের কথা উচ্চারিত হয়েছে –

‘দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্ দ্বিতীয়ংপরি জাতবেদাঃ তৃতীয়মপ্সু...।’[২]

অগ্নির এই ত্রিকত্ব একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য দেবতাদের নেই। পৃথিবীস্থান এই দেবতার তিনলোকেই নিত্য আবির্ভাব বা সদা যাতায়াত। অগ্নির অপর নাম বহ্নি, তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজমান সমর্পিত হবির্বহনকারী, যজমানের প্রদত্ত হবি অগ্নি সেই সেই দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যান। যজমান ও দেবতার সংযোজক হলেন অগ্নি। যজ্ঞক্ষেত্রে আরাধ্য দেবতার প্রতীক স্বরূপ অগ্নিই উপস্থিত থাকেন ও যজমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অগ্নি তাই শুধু যাগ সম্পাদক নন গৃহে গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করেন। তাই সকল দেবতাদের প্রতি প্রদর্শিত আতিথেয়তা বা যজ্ঞক্ষেত্রে অভ্যাগতরূপে আহ্বান পূর্বক আতিথ্য অগ্নির মারফৎ সাধিত হয়। তাই ঋগ্বেদের অগ্নি সম্পর্কিত নানা সূক্তে অগ্নি দেবতা যজমানের

অতিথি রূপে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রায় দশটি মণ্ডলেই যজমানের পরম অতিথিরূপী অগ্নিকে আমরা পাই এবং একেক ক্ষেত্রে সেই অগ্নি একেকটি নাম অবলম্বন করে অবস্থান করছেন এবং সার্বিকভাবে অতিথিরূপী অগ্নির মানব হিতৈষণার দিকটি মন্ত্রগুলি পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়-

'শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে।

দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু।।'[৩]

অর্থাৎ, অগ্নিশ্রেষ্ঠ, যবিষ্ঠ, সদা অতিথি, সকলের আহত, হব্যদাতার প্রতি প্রীত এবং সর্বভূতজ্ঞ। উষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি- মন্ত্রদ্রষ্টা কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি কর্তৃক অগ্নি স্তুতি।

গোতম পুত্র নোধা ঋষি অগ্নিকে যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন-

'দধুষ্টা্ব ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।

হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে।।'[৪]

অর্থাৎ হে অগ্নি, মনুষ্যদিগের মধ্যে ভৃগুগণ দিব্য জন্ম প্রাপ্তির জন্য তোমাকে শোভনীয় ধনের ন্যায় ধারণ করেছিলেন। তুমি সহজে লোকের আহ্বান শ্রবণ কর এবং দেবগণকে যজ্ঞক্ষেত্রে আহ্বান কর। তুমি যজ্ঞস্থানে অতিথি স্বরূপ এবং বরণীয় মিত্রের ন্যায় সুখদাতা।

বৈদিক ঋষি শক্তির পুত্র পরাশর ত্রিষ্টুপ ছন্দে অগ্নি দেবতার অতিথি স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন-

'রয়ির্ন যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ।

স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ।।'[৫]

অর্থাৎ পৈতৃক ধনের ন্যায় অগ্নি অন্নদাতা, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের ন্যায় অগ্নি নেতা, উপবিষ্ট অতিথির ন্যায় প্রীতিভাজন এবং হোতার ন্যায় যজমানের গৃহ বর্ধিত করেন।

দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি কর্তৃক অগ্নিস্তুতিতে পাওয়া যায়-

'বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্বাসাং সমানং দম্পতিং ভুজে সত্যগির্বাহসং ভুজে।

অতিথিং মানুষাণাং পিতুর্ন যস্যাসয়া।

অমী চ বিশ্বে অমৃতাস আ বয়ো হব্যা দেবেষ্বা বয়ঃ।।'[৬]

অর্থাৎ সমস্ত যজমানকুলের রক্ষক, একরূপেই সমস্ত লোকের গৃহপালক, অবিসংবাদিফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিকল্প মনুষ্যদিগের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বান করি। পুত্রেরা যেমন পিতার কাছে গমন করে, সেরকম দেবতারা হবির্দ্রব্যের উদ্দেশ্যে অগ্নির নিকট গমন করেন, ঋত্বিকেরাও দেবতাদের যাগের সময় অগ্নিকে হবির্দ্রব্য প্রদান করেন।

এই পরুচ্ছেপ ঋষি ঋগ্বেদের ১ম মন্ডলের ১২৮ তম সূক্তে পুনরায় অগ্নিকে অতিথিরূপে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে-

'স সুক্রতুঃ পুরোহিতো দমদমেঽগ্নি র্যজ্ঞস্যাধ্বরস্য চেততি ক্রত্বা যজ্ঞস্য চেততি।

ক্রেত্বা বেধা ইষূয়তে বিশ্বা জাতানি পস্পশে।

যতো ধৃতশ্রীরতিথিরজায়ত বহির্বেধা অজায়ত।।'[৭]

অর্থাৎ শোভনকর্মযুক্ত ও পুরোহিতরূপী অগ্নি প্রতিটি যজমানগৃহে অবিনাশী যজ্ঞকে জ্ঞাত হন, তিনি ক্রতু দ্বারা যজ্ঞ জানতে পারেন, তিনি তাঁর আপন কর্মদ্বারা বিবিধফলপ্রদানকারীরূপে যজমানের জন্য অন্ন প্রার্থনা করেন। তিনি হব্য প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যকে স্পর্শ করেন কারণ তিনি ঘৃতভক্ষক অতিথিরূপে যজ্ঞস্থলে প্রতিভাত হন। সেই অগ্নি প্রবৃদ্ধ হলে হবির্দ্রব্যপ্রদানকারী যজমান বিবিধ ফল লাভ করেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে বর্ণিত অতিথি প্রসঙ্গে অগ্নির প্রাধান্য পাওয়া যায় আলোচ্য মন্ত্রগুলির মাধ্যমে। সহজেই বোধগম্য হয় যে যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে সমাগত অগ্নি যজমানের প্রতি সদা প্রসন্ন এবং দেবতাদের প্রতিভূরূপে তিনি যজমানের আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর সর্বকল্যাণময়রূপ প্রকট। আলোচ্য সূক্তগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি ও সেই স্তুত্য অগ্নির বিশেষ উপস্থিতি যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে। এছাড়াও প্রথম মণ্ডলে অগ্নি ব্যতিরিক্ত অতিথি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

মিত্রাবরুণের পুত্র অগস্ত্য ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ অধিষ্ঠাত্রী বিশ্বদেবগণ দেবতার স্তুতিকল্পে মন্ত্রোল্লেখ করেছেন এবং সেখানেও অগ্নির শ্রেষ্ঠ অতিথিরূপী চরিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে -

‘প্রেষ্ঠং বো অতিথিং গৃণীষেঽগ্নিং শস্তিভিস্তুর্বণিঃ সজোষাঃ।

অসদ্যথা নো বরুণঃ সুকীর্তিরিষশ্চ পর্ষদরিগূর্তঃ সূরিঃ।।’[৮]

অর্থাৎ হে বিশ্বদেবগণ! আমি ত্বরমাণ ও তোমাদের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাদের শ্রেষ্ঠ অতিথি অগ্নিকে স্বস্তিমন্ত্র দ্বারা স্তব করি। উত্তম কীর্তিযুক্ত সূরী বরুণ আমাদেরই হন ও শত্রুদের প্রতি হুঙ্কার করে আমাদের প্রার্থিত অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ করুন।

অঙ্গিরা পুত্র হিরণ্যস্তুপ ঋষি অগ্নিদেবতার স্তুতিকালে উল্লেখ করেছেন আতিথ্যের এক দৃষ্টান্ত-

'ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।

স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যেনকৃজ্জীবয়াজং যজতে সোপমা দিবঃ।।'[৯]

অর্থাৎ, হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদের দক্ষিণা প্রদান করেছে, তুমি সেই যজমান পুরুষকে স্যূত বর্মের মত সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান সুস্বাদু অন্ন প্রদান করে অতিথিদের পরিতৃপ্ত করে নিজগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধা করে, সেই যজমান স্বর্গের উপমা স্থল হয়।

কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্র নয় নিত্যনৈমিত্তিক জীবনেও অতিথি পরিষেবার সুফল স্বরূপ মন্ত্রটি বিচার্য। স্বর্গপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে সাথে আত্যন্তিক ফললাভের অনুষঙ্গ হিসেবে সুস্বাদু অন্নদান-পূর্বক অতিথি সেবা বৈদিক জনজীবনের অঙ্গ ছিল। অতিথির সন্তুষ্টি বিধানে যজমান পারমার্থিক ফললাভ করতেন। অতিথিসেবা তাই আবশ্যিক ছিল।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে অতিথি প্রসঙ্গ এসেছে নিম্নরূপে-

'স ইধান উষসো রাম্যা অনু স্বর্ণ দীদেদরুষেণ ভানুনা।

হোত্রাভিরগ্নির্মনুষঃ স্বধ্বরো রাজা বিশামতিথিশ্চারুরায়বে।।'[১০]

অর্থাৎ, রমণীয় ঊষার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে আদিত্যের ন্যায় উজ্জল কিরণে দেদীপ্যমান হচ্ছেন। মানুষের হোমসাধন, স্তুতি দ্বারা স্তূয়মান, উত্তম যাগযুক্ত ও প্রজাগণের অধীশ্বর অগ্নি যজমানের কাছে প্রিয় অতিথির ন্যায় উপস্থিত হচ্ছেন। আলোচ্য মন্ত্রে অতিথির উপস্থিতির মাধুর্য প্রকাশিত

হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত, প্রিয় অতিথি গৃহে আগমন করলে গৃহস্বামী যেমন উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর সমাদর করেন অনুরূপভাবে যাগক্ষেত্রে অগ্নিদেবতার আগমনেও প্রিয় অতিথি সমাগমের মত যজমান হন হৃষ্টচিত্ত।

অতিথিরূপী অগ্নির প্রশংসার অবসরে ভৃগুর অপত্য ঋষি সোমাহূতি অগ্নিস্তুতি করেছেন-

'হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং সুবৃক্তিং বিশামগ্নিমতিথিং সুপ্রয়সম্।

মিত্র ইব যো দিধিষায্যো ভূদ্দেব আদেবে জনে জাতবেদাঃ।।'[১১]

এই মন্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে, হে যজমানগণ, আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট, পাপলেশহীন, যজমানের অতিথিস্বরূপ, হব্যযুক্ত অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সর্বভূতজ্ঞ ও মনুষ্য থেকে দেব পর্যন্ত সকলের ধারণ কর্তা। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগ্নিকে যজমানের সৎকারযোগ্য অতিথিরূপে বর্ণনা করেছেন।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম দেবতার স্তুতিপর্বে পাওয়া যায়-

'তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্।

বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্।।'[১২]

এখানেও অগ্নিকে যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামীরূপে যজ্ঞক্ষেত্রে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ঋগ্বেদসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে অগ্নির সার্বজনীন অতিথি স্বরূপটির বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে প্রধান ও অন্যান্য দেবতাদের পুষ্টি বিধান করেন-

'বিশ্বেষামদিতি র্যজ্ঞিয়ানাং বিশেষামতিথি র্মানুষাণাম্।'[১৩]

আলোচ্য এই মন্ত্রে অগ্নি হলেন সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতাদের অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পরিপোষক এবং সমগ্র মনুষ্যকুলের অতিথিরূপে প্রতিভাত। অতএব গৃহে সমাগত অতিথির ন্যায় যজ্ঞক্ষেত্রে প্রধান অতিথিরূপে অগ্নির আতিথেয়তা আবশ্যক।

চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্ততেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বামদেবের স্তুতিতে অগ্নি অতিথিরূপে যজমানের কাছে উপস্থিত হলে যজমান তাঁর যথাযথ সৎকারের ফলে উত্তরপুরুষ সহ অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হন-

‘যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং নিশিষন্মমন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।’[১৪]

যজমানের আতিথ্যগুণে অগ্নি সদয় হয়ে যজমানের পরম মিত্র রূপে বিরাজ করেন। যে যজমান অতিথি জ্ঞানে অগ্নিকে যোগ্য পূজাদি অর্পণ করেন অগ্নি তাঁর সখা হয়ে অবস্থান করেন-

‘তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্জুজোষৎ।’[১৫]

অতিথিরূপী অগ্নি গৃহস্থের আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য গৃহে অবস্থান করে তাঁর কল্যাণময়তায় যজমানকে রক্ষা করেন-

‘........হোতা বেদিষদাতিথি র্দুরোণসৎ।’[১৬]

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলেও অগ্নি দেবতার অতিথিরূপপরিচায়ক বেশ কিছু মন্ত্র পাওয়া যায়। সবক্ষেত্রেই অগ্নি যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডে অভ্যাগত ও তাঁকে যথাযথ আপ্যায়ন আবশ্যক এবং যজমান ইষ্টলাভের জন্য অগ্নিরূপী অতিথি সৎকারে সদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বস্তুতঃ এই অগ্নি যথাযথ সম্মানে আপ্যায়িত না হলে যজ্ঞফল বিঘ্নিত হয়; তাই যজমানের সদা কর্তব্যকর্মের মধ্যে অগ্নিদেবতার প্রতি আতিথ্য প্রদান গুরুত্ব পেয়েছে-

'মার্জাল্যো মৃজ্যতে স্বে দমুনা কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবো নঃ।'[১৭]

'ঈলেন্যো বপুষ্যো বিভাবা প্রিয়ো বিশামতিথির্মানুষীণাম্।'[১৮]

অর্থাৎ অগ্নি চারুতমরূপে যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হয়ে সকলের দ্বারা স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমানরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেই অগ্নির স্বরূপটি হল তিনি সমগ্র প্রাণিপুঞ্জের প্রিয় এবং মনুষ্যগণের বিশেষ অভীষ্ট বর্ষী, বলশালী ও সুখকর অতিথি। এই বিশেষ অতিথি অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে আগমনের জন্য যজমানের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হবেন এবং গৃহে আগত অতিথির সমতুল সম্মাননা প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। অগ্নি অতিথিরূপে সমাগত হয়ে শত্রু বিনাশপূর্বক যজমানের সর্বৈব হিতসাধন করেন ও যজমানের পরিবারবর্গকে অন্নদান করে থাকেন; তিনি বিদ্বান, শত্রুদের ধন আহরণকারী-

'জুষ্টো দমুনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যঞ্জমুপ যাহি বিদ্বান্।'[১৯]

অগ্নি যাঁর দ্বারা আহূত হন অর্থাৎ যে যজমানের অতিথিরূপে অবস্থান করেন সেই ব্যক্তির কৃত যজ্ঞকর্ম দ্বারা তিনি শত্রু মানুষদের বিনাশ করেন-

'বিনশ্চ যস্যা অতিথির্ভবাসি স যজ্ঞেন বনবদ্দেব মর্তান্।'[২০]

যজ্ঞভূমিতে বারংবার অগ্নি যজমানের পরম অতিথির ন্যায় সমাদৃত হয়েছেন। গৃহকর্মের অন্তবর্তী আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে যেমন অতিথিসেবা স্থান পেয়েছে অনুরূপভাবে যজ্ঞ কর্মেও অগ্নিরূপী অতিথির প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছে ও পরম কল্যাণকর এই অতিথির প্রশংসায় যজমান পঞ্চমুখ হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছেন। অতিথির ন্যায় পূজার্হ হয়ে ধনদাতা, সুরক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং যজমানের দ্বারা তিনি গৃহস্বামীরূপে স্থাপিত হয়েছেন-

'ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্যং বিশ্যঃ শোচিষ্কেশং গৃহপতিং নিষেদিরে।'[২১]

অগ্নি স্বয়ং অবিনশ্বর হয়েও নশ্বর মানবকুলের কাছে যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে সমাগত হয়ে হব্য কামনা করেন, অগ্নি অতিথিরূপে সকলের প্রিয়ভাজনও বটে-

'প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশঃ স্তবেতাতিথিঃ।'[২২]

যজ্ঞভূমিতে হব্যদাতার কল্যাণবিধায়ক অগ্নি সম্যকরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে যজমানের সাহচর্যে অবস্থান করেন ও অতিথি সৎকারের ন্যায় তাঁর উদ্দেশ্যে হবির্দ্রব্য প্রযুক্ত হয়-

'বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ।'[২৩]

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে বহু সূক্তে অগ্নিকে যজ্ঞভূমিতে অতিথিরূপে আহ্বান করা হয়েছে ও যজ্ঞভূমির উপযুক্ত অভ্যর্থনা প্রদানপূর্বক যজমান অতিথি সৎকারের নিদর্শনও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতিথির প্রিয়ভাজনতা সর্বজনবিদিত। অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে সকলের প্রীত্যোৎপাদন করেন-

'অধা হি বিক্ষ্বীবীড্যোঽসি প্রিয়ো নো অতিথিঃ।'[২৪]

অর্থাৎ, হে অগ্নি আপনি মনুষ্য গণের স্তুত্য, কারণ আপনি অতিথির মত প্রিয়। বৃহস্পতি পুত্র ঋষি ভরদ্বাজের মন্ত্রদর্শনে অতিথির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

'স নো বিভাবা চক্ষাণি র্ন বস্তোরগ্নি র্বন্দারু বেদ্যশ্চনো ধাৎ।

বিশ্বায়ু র্যো অমৃতো মর্ত্যেষূষর্ভূদ্ভূদতিথি র্জাতবেদাঃ।।'[২৫]

যিনি দিন প্রকাশক সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সকলের বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত, অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যুষে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হন, সেই অগ্নি যেন আমাদের উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন। এই মন্ত্রে অগ্নির নানা স্বরূপ বর্ণিত হলেও অতিথিরূপটি বিশেষত্বের

দ্যোতনা করে। অগ্নি অতিথিরূপে পরিতুষ্ট হলে উৎকৃষ্ট অন্নাদি লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মানবকুলের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতার সাধনে অগ্নির আনুকূল্য এখানে যাজ্ঞিকের দ্বারা প্রার্থিত হয়েছে-

'মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।

কবিং সম্রাজতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।।'[২৬]

এই মন্ত্রে অগ্নিকে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোকের সর্বব্যাপকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতারাও অগ্নিকে মুখস্বরূপ বলে মান্যতা দেন এবং মনুষ্যজগতের কাছে অগ্নির উপস্থিতি অতিথিবৎ। সমস্ত লোকনির্বিশেষেই অগ্নি অতিথিরূপে রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেন।

তিনলোকের রক্ষক হিসেবে অগ্নির অতিথিরূপী উপস্থাপনার স্তুতি করা হয়েছে এই মন্ত্রে-

'ইমমু ষু বো অতিথিমুষ র্বুধং বিশ্বাসাং বিশাং পতিমৃঞ্জসে গিরা।'[২৭]

অর্থাৎ হে বীতহব্য, তুমি প্রাতঃপ্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাব পবিত্র এই অতিথিকে অর্থাৎ অগ্নিকে প্রসন্ন কর। অগ্নিপ্রসন্নতা লাভ করলে প্রদেয় হব্যবস্তু দেবতারা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের তুষ্টিতে যাজ্ঞিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়। যজ্ঞক্ষেত্রে যজমানকে বারংবার অগ্নিরূপী অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা দানের কথা বলা হয়েছে। কারণ দেবতাদের যজ্ঞস্থলে আহ্বানকারী, স্বর্গরাজ্যের মার্গ নির্দেশক, যজ্ঞ সম্পাদক, দীপ্তিযুক্ত অগ্নি অতিথির ন্যায় পূজ্য-

'দ্যুতানং বো অতিথিং স্বর্ণরমগ্নিং হোতারং মনুষঃ স্বধ্বরম্।'[২৮]

স্তুতিযোগ্য অগ্নিকে স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যার মাধ্যমে অতিথিজ্ঞানে আপ্যায়ণ আবশ্যক। এই অভ্যর্থনা রীতি হবে নিরবচ্ছিন্ন এবং ইন্ধনাদির দ্বারা পূজনীয় অগ্নিকে আরাধনা করতে হবে এবং অতিথির নিরতিশয় প্রীতিভাজন হলে যেমন নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তেমনি অগ্নিকে অতিথি রূপে স্তোতারা বন্দনা করবেন-

'অগ্নিমগ্নিং বঃ সমিধা দুবস্যত প্রিয়ং প্রিয়ং বো অতিথিং গৃণীষণি।'[২৯]

গার্হস্থ্যাশ্রমীকে অর্থাৎ যজমান সর্বজ্ঞান প্রদায়ক অগ্নিদেবতাকে অতিথির ন্যায় প্রিয়জ্ঞানে স্তুতি করবেন এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

'আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্।

স্যোন আ গৃহপতিম্।।'[৩০]

ষষ্ঠ মণ্ডলে অগ্নিদেবতা ছাড়াও আতিথ্য প্রসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রের পরিতুষ্টিতে প্রস্তোক এবং দিবোদাস কর্তৃক বহু ধনপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তধনের উৎসর্গীকরণ দেখা যায়।[৩১]

সপ্তম মণ্ডলে অতিথি প্রসঙ্গ বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। অভীষ্ট প্রদানকারী অগ্নিদেবকে অতিথিরূপে যজ্ঞভূমিতে সম্বোধন করা হয়েছে-

'নিশিশানা অতিথিমস্য যোনৌ দীদায় শোচিরাহুতসা বৃষ্ণঃ।'[৩২]

এই মন্ত্রে অগ্নিকে যুবতম অতিথি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আহুত অগ্নি অতিথিরূপে যাজ্ঞিকের সকল অভীষ্ট প্রদান করেন। অগ্নি কেবলমাত্র যজ্ঞভূমিতে নয় দেবলোকেও তিনি অতিথিরূপে প্রতিভাত-

'অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ।'[৩৩]

দীপ্যমান অগ্নি দেবগণের অতিথিরূপে প্রজ্জ্বলিত, যাঁর মধ্যে পূরু প্রভৃতিকে অভিভূত করার শক্তি রয়েছে। অগ্নি জ্ঞানী, ক্রান্তদর্শী, অমিত পরাক্রমী, দীপ্তিযুক্ত, শোভন গৃহযুক্ত, বন্ধুস্বরূপ, অতিথিরূপী এবং সকলের মঙ্গলসাধনকারী-

'অমুরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্তসুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।'[৩৪]

অতিথি অগ্নির বরানুকূল্যে নিকটগামী ব্যক্তি লাভ করেন প্রভূত ধনসম্পদ; এই অগ্নি বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত থাকেন, প্রতিগৃহে সুনিহিত হয়ে প্রীতিলাভ করেন- সেই অগ্নি সকলের অতিথি হয়ে থাকেন-

'যদাবীরস্য রেবতো দুরোণে স্যোনশীরতিথিরাচিকেতৎ।

সুপ্রীতো অগ্নিঃ সুধিতো দম আ স বিশেদাতি বার্যমিয়ত্যৈ।।'[৩৫]

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে বেশ কিছু সূক্তে অতিথি অভ্যাগত সৎকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এই সৎকারাদি ক্রিয়া সমাধাকল্পে বেশ কিছু দানস্তুতি সম্বদ্ধ হয়েছে- যা অতিথিসৎকারের অঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যে দানস্তুতিগুলি উপঢৌকন প্রদানের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং এই মন্ত্রগুলিতে পৃষ্ঠপোষকদের প্রশংসা করা হয়েছে। দানস্তুতির সাধারণতঃ কোন বিশেষ আচারগত পার্থক্য নেই। ভারতীয় শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে উপহার প্রদান একটি ধার্মিক কর্ম এবং মানুষের অপরিহার্য কর্তব্যগুলির একটি। বৈদিক সাহিত্যে দক্ষিণা, দান প্রভৃতিকে চারিত্রিক উদারতার মান্যতা দেওয়া হয়, এই উদারতাকে পুণ্যময় কাজ হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে।

অসঙ্গের পুত্র স্বনদ্রথ অন্যান্য শ্রদ্ধেয় রাজা নিন্দিতাশ্ব, প্রপথিন্, পরময়ের সাথে যজ্ঞ করেছিলেন। স্বনদ্রথ যজ্ঞীয় উপহার হিসেবে মেধ্যাতিথিকে দুটি সাদা ঘোড়া ও হিরণ্ময় চর্মাস্তরণে আবৃত ধন প্রদান করেন।[৩৬] ঋগ্বেদে পালিত পশুদের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুর উল্লেখও কোথাও কোথাও আছে।

এই পালিত পশুগুলি অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার কাজে ব্যবহৃত হত। চেদিবংশীয় কশু রাজার শত উষ্ট্র ও দশ সহস্র ও গোদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৭] পরশু নামক রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা পাওয়া যায় অষ্টম মন্ডলে। শর্যণা হ্রদের তীরে যদুবংশীয় পরশু রাজার পুত্র তিরিন্দিরের নিবাস ছিল। তিনি শত ও সহস্র ধন দান করেন। পর্জ্জ ও সামকে তিনি তিন শত অশ্ব ও এক হাজার গোদান করেন।[৩৮]

গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি ঋষি ইন্দ্রের দানের প্রশংসা করেন।[৩৯] অগ্নি দেবতার স্তুতি করে অগ্নির অতিথি স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে-

'প্রশংসমানো অতিথির্ন মিত্রয়োঽগ্নী রথো ন বেদ্যঃ।

ত্বে ক্ষেমাসো অপি সন্তি সাধবস্ত্বং রাজা রয়ীণাম্।।'[৪০]

ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি উষ্ণিক্ ছন্দে অগ্নির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অগ্নির স্তুতি করেছেন। মেধাবিগণ মনুষ্যদের অতিথি ও বনস্পতিদের পুত্র, তাঁরা অগ্নির স্তুতি করেছেন-

'অতিথিং মানুষাণাং সূনুং বনস্পতীনাম্।'[৪১]

বিরূপ ঋষি ছিলেন অঙ্গিরার পুত্র। তিনি অগ্নি দেবতার অতিথি স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন-

'সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈবোধয়তাতিথিম্।

অস্মিন্ হব্যা জুহোতন।।'[৪২]

অর্থাৎ অতিথিরূপী অগ্নিকে পরিচর্যা করা উচিত, হব্যদ্বারা জাগরিত করে তাতে আহুতি প্রক্ষেপ করতে হয়।

দানের মহিমা হিসেবে শুতর্বা রাজার দানকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুতর্বার থেকে অধিক অশ্ব আর কোন মানুষ দান করতে পারবে না।[৪৩] সোভরি ঋষি অগ্নির অতিথি স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন এই মন্ত্রে-

'প্রেষ্ঠমু প্রিয়াণাং স্তুহাস্যবাতিথিম্।

অগ্নি রথানাং যমম্।।'[৪৪]

এখানে প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নি হলেন স্তুত্য। বাসপ্রদ অগ্নি অতিথিরূপে অনেকের স্তুত এবং দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী। সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি অতিথিরূপে এখানে আত্মপ্রকাশ করেছেন।[৪৫]

তৈত্তিরীয় সংহিতা

কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতাগুলির মধ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রধান। এছাড়া কাঠক, কপিষ্ঠল কঠ এবং মৈত্রায়ণী নামক আরও তিনটি পাঠপ্রণালী পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংহিতায় গদ্যাংশের সঙ্গে পদ্যাংশ মিশ্রিত হয়ে অবস্থান করে। এই সংহিতার ৭ টি কাণ্ড, ৪৪ টি প্রপাঠক, ৬৩১ টি অনুবাক ও মন্ত্রসংখ্যা ২১৯৮। এই শাখাটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। এই সংহিতার কাণ্ডগুলিতে অতিথির প্রসঙ্গ ও আতিথেয়তার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে সোমকে অতিথিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মানবরূপী অতিথি সমাগত হলে তাঁকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করা হয় তেমন যজ্ঞক্ষেত্রে সোম উপস্থিত হলে তাকে অতিথিজ্ঞানে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়ে থাকে-

'অগ্নেরাতিথ্যম্ অসি সোমস্যাতিথ্যম্ অসি।'[৪৬]

অগ্নির আতিথ্য সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে- যুদ্ধাশ্ব ও নিখাদ সুবর্ণ সহযোগে ধনসম্পদপূর্ণ বাহনে অগ্নি যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি যজমানের মিত্র, যজমানের রক্ষক; তাঁর আতিথেয়তা যজমানকে সম্যকরূপে করতে হয়।[৪৭] দেবতারা পরম ঋষি রূপে অগ্নি, রাজা এবং মনুষ্যকুলের অতিথিদের জন্য তাঁদের মুখমণ্ডলের অনুরূপ ও উপযুক্ত পাত্র নির্মাণ করেছেন- আতিথ্যের জন্য।[৪৮] সূর্যকে ঘর্ম বা উত্তপ্ত রান্নার পাত্র হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে, প্রবর্গীয় রীতিতে

‘মহাবীরপাত্র’ নিঃসন্দেহে প্রকাশমান সূর্যের প্রতীক।[৪৯] ইন্দ্রের অতিথিরূপে চর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- ‘ইন্দ্রস্য চর্মো অতিথিঃ’। চর্ম হল উত্তপ্ত রন্ধনপাত্র-যা ইন্দ্রের অতিথি। রাজা যখন রথে উপবিষ্ট হয়ে প্রতীকীরূপে তার বিজয়ী কর্মজীবন শুরু করেন তখন যে মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয় সেখানে রাজাকে ভূমণ্ডলের অতিথিরূপে কল্পনা করা হয়।[৫০] রাজা তাঁর অভিযান শেষে রথ থেকে পৃথিবীতে পরম আতিথেয়তাযুক্ত হয়ে অবতরণ করেন। ভরত নামাঙ্কিত অগ্নি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি সূর্যের মত উজ্জ্বল দ্যুতিতে ভাস্বর। যুদ্ধে তিনি পুরুকে পরাজিত করেছেন, স্বর্গের অতিথিরূপে তিনি পূর্ণ প্রফুল্লতায় জাজ্জ্বল্যমান।[৫১] জাতবেদারূপ অগ্নি হলেন গৃহস্থের অধিপতি, যিনি ইন্ধনরূপে প্রতিভাত, তাঁকে কোমল স্থানে আতিথ্য দিতে হয়-

‘আ জাতম্ জাতবেদসি প্রিয়ম্ শিশিতথিম্।

স্যোন আ গৃহপতিম্।।’[৫২]

যজ্ঞীয় দণ্ড দ্বারা অগ্নিকে সেবা প্রদান করতে হয়, স্বচ্ছ ঘৃতাদির দ্বারা অতিথিরূপী অগ্নিকে জাগরিত করে নৈবেদ্য উপস্থাপন করতে হয়-

‘সমিধাগ্নিম্ দুবস্যতা ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।

অস্মিন্ হব্যা জুহোতন।।’[৫৩]

যখন কোন অতিথি উপস্থিত হন তাঁকে আতিথেয়তা প্রদান করা হয় সম্যক ঘৃতাদির দ্বারা। রথারোহী এবং অন্য পশু বাহিত যানে আগত অতিথিরা গুরুত্ব পান অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে।[৫৪] একজন রাজার সাথে আগত সমস্ত অনুগামীদের আতিথেয়তা দেওয়া হয়।[৫৫]

অথর্ববেদ

ঋগ্বেদের জগৎ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ, জীবনের ছন্দে পরিস্পন্দিত। ঋগ্বেদের ঋষিগণ বিশ্ব প্রকৃতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যে-মাধুর্যে মুগ্ধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে তাঁরা ঐ সমস্ত দেবতাদের সাথে পিতাপুত্র সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, অনুনয়বিনয়ের সাথে তাঁদের কাছে অভীষ্ট বস্তুর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। অথর্ববেদের ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদের ঋষিগণ অপেক্ষা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি বাস্তববাদী। অথর্ববেদের যুগে গৃহস্থের পারিবারিক জীবনে আতিথেয়তা ছিল অনস্বীকার্য কর্ম। অথর্ববেদে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি সূক্ত রয়েছে। অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের ২য় থেকে ৭ম সূক্ত পর্যন্ত অতিথির মাহাত্ম্য, সজ্জনের সেবা যজ্ঞ ফলতুল্য এবং আতিথ্যের প্রশংসা করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অতিথির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য বা আতিথ্য গৃহকর্মের এক অবিভাজ্য অংশ ছিল। অথর্ববেদের যুগে প্রত্যেক বাড়িতে অতিথিদের অভ্যর্থনা ও সেবা করা হত। অথর্বসংহিতায় এ সম্পর্কে 'আবসথ' নিয়ে আলোচনা রয়েছে-'যদাবসথান্ কল্পয়ন্তি সদোহবির্ধনান্যেব তৎ কল্পয়ন্তি।'[৫৬] কিন্তু অতিথিসেবার জন্য তা আসলে একটি বড় কামরা ছিল কিনা বলা শক্ত। এজাতীয় বাড়ি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর বৈদিক দরিদ্র জনগণের।

অতিথি-প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে বিশদে এবং বারংবার উল্লেখ হলেও অথর্ববেদেও অতিথিকে দেবত্বে উন্নীত করে প্রদর্শিত করা হয়েছে। অথর্ববেদে অতিথিকে ব্রহ্ম ও প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বলা হয়েছে- আতিথেয়তা প্রদর্শন একটি ত্যাগের কাজ। অতিথিকে অভ্যর্থনা করলে যজমানের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অতিথি সৎকারের দ্বারা পরমার্থ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। অতিথি খাদ্যগ্রহণের আগে যদি গৃহস্থ খাদ্যগ্রহণ করে সে প্রকৃতপক্ষে সারবত্তা, সতেজতা, সমৃদ্ধি, বংশ, গবাদি পশু, খ্যাতি, গৌরব, সৌভাগ্য ও গৃহের সম্প্রীতি হারিয়ে ফেলে।

অতিথিসৎকারের সম্পূর্ণ ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সাথে যজ্ঞসম্পাদনের প্রায়োগিক ক্রিয়ার সাযুজ্য প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যজ্ঞে আধান ক্রিয়া, হবির্প্রদান, পুরোডাশ নিবেদন, সোমপ্রণয়ন, বষট্কারের প্রয়োগ, অন্নদান প্রভৃতি কর্ম আবশ্যিক। এরূপ অতিথিসেবার ক্ষেত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, পানীয়, উপহার, আসন প্রদান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ অঙ্গকর্ম। অথর্ববেদের ঋষি এক অভিনব সাদৃশ্য স্থাপন করেছেন যজ্ঞ ও অতিথিসেবার মধ্যে। যজ্ঞের প্রতিটি সম্পাদিত পর্যায়ের সাথে অতিথিপরায়ণতার প্রতিটি স্তরের সাযুজ্য বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ হল-

যে ব্যক্তি অতিথির দর্শন করেন তিনি দেবযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন-

‘যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবযজনং প্রেক্ষতে।’[৫৭]

অতিথিকে অর্পিত খাদ্য যজ্ঞীয় পুরোডাশের সমতুল-

‘যৎ পুরা পরিবেষাৎ খাদমাহরান্তি পুরোডাশাবেব তৌ।’[৫৮]

অতিথিকে ভোজনের আমন্ত্রণের সাথে তুলনা করা হয়েছে যজ্ঞক্ষেত্রে হবির্দ্রব্য গ্রহণের জন্য দেবতার আহ্বানকে-

‘যদশনকৃতং হ্বয়ন্তি হবিষ্কৃতমেব তধ ধ্বয়ন্তি।’[৫৯]

যিনি অতিথিকে বারংবার ভোজনের অনুরোধ করেন তিনি প্রাণশক্তির বৃদ্ধি করেন-

‘যদাহ ভূয় উদ্ধরেতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে।’[৬০]

যিনি অতিথির উদ্দেশ্যে আহার্য প্রদান করেন তিনি যজ্ঞীয় হবির্দ্রব্য প্রদান করেন-

‘উপ হরতি হবীষ্যাং সাদয়তি।’[৬১]

অতিথি ঐ পরিবেশিত ভোজ্যের দ্বারা মনে মনে যজ্ঞ সম্পাদন করেন-

‘তেষামাসন্নামাতিথিরাত্মন্ জুহোতি।’[৬২]

অতিথির হাত হল স্রুচা, প্রাণ হল যূপদারু আর খাওয়ার সময় উত্থিত আওয়াজ হল বষট্কার। অতিথি প্রিয় বা অপ্রিয় যেই হন না কেন তিনি যজমানকে স্বর্গলোকে নিয়ে যান।[৬৩] অতিথি যার অন্ন গ্রহণ করেন তাঁর সকল পাপকে বিনাশ করেন। অতিথিকে যে অন্নদানে সেবা করে না তার পাপের বোঝা বাড়ে।[৬৪]

অতিথিকে অন্নদান দ্বারা সেবাসৎকারের বিষয়টি যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন সোমলতা নিষ্কাশন ও যজ্ঞের পূর্ণতা প্রদানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতিথিকে অন্নদান প্রাজাপত্য যজ্ঞের সমতুল এবং অন্নদানকারী প্রজাপতির সমান পরাক্রমী। অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা বা আহ্বান, আপনালয়ে ভোজন করানো এবং ভোজ্য অন্ন পাক করার আধার পর্যায়ক্রমে অগ্নির তিন স্বরূপের সাথে অর্থাৎ আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নির সাথে তুলনাযুক্ত।[৬৫]

অতিথিসৎকারের আরও নানা ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি গৃহে সমাগত অতিথির অন্নগ্রহণের পূর্বে ভোজন করে সে তার ইষ্টাপূর্তির ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হয়, গৃহের দুগ্ধ, পানীয় বা তরলজাতীয় রসাদি দ্রব্যকে ধ্বংস করে, বল এবং সমৃদ্ধি বিনাশ করে, গৃহের সন্তানাদি ও পালিত পশু ভক্ষণের ন্যায় পাপ অর্জন করে, কীর্তি এবং যশের বিনাশ ঘটায়, গৃহের শ্রী ও সৌন্দর্যের হানি করে।[৬৬] শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই অতিথিরূপে অভিহিত হন তাই তাঁর পূর্বে যজমানের ভোজন অনুচিত। অপরপক্ষে অতিথির ভোজনের পরে যে যজমান ভোজন করে সে নিরবচ্ছিন যজ্ঞ নিষ্পাদন করে ব্রত উদযাপন করে।[৬৭]

অতিথিকে না দিয়ে স্বাদু দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিথি দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মাংসাদি দ্বারা অভ্যর্চিত হবেন। অতিথি দুগ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হলে যজমান বা গৃহস্থ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করেন। ঘৃত দ্বারা অতিথির সেবা হলে অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়, অতিথিকে মধু নিবেদনে সত্র ফলপ্রাপ্তি আর মাংস নিবেদন করলে যজমান দ্বাদশাহ যজ্ঞের ফল পান।[৬৮] তাই অতিথি সৎকারের দ্বারা অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সত্র ও দ্বাদশাহ যাগের সমান ফলপ্রাপ্তি হয় বলে অতিথি সৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতিথিকে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের প্রেক্ষাপটটি যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।

যে অতিথিসৎকার কর্তা অতিথিদের ভোজন পরিবেশন করে আপন ভোজ্য গ্রহণ করেন, তিনি যজ্ঞের পরে অবভৃথ স্নানের ন্যায় ফলপ্রাপ্ত হন-

‘যদ্ বা অতিথিপতিরতিথীন্ পরিবিষ্য গৃহানুপৌদৈত্যবভৃথমেব তদুপাবৈতি।’[৬৯]

হোতৃ পুরুষেরা সোমরস আহুতি দেন অধ্বর্যুর নির্দেশিকায় ও অগ্নীধ্র পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে। অথর্ববেদের ঋষি অতিথির আপ্যায়নের মাধ্যমে স্বর্গ ও বিভিন্ন ত্যাগের ফললাভের সহজ উপায় বর্ণনা করেছেন। সমাজে যখন অতিথিসেবার দ্বারা যজ্ঞীয় ফললাভের বর্ণনা পাওয়া যায় তখন পূর্ববর্তী ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ জটিল শ্রৌতকর্মে অনীহা প্রকাশ পায়। অতিথি আপ্যায়নের গৃহ্যরীতিকে জনপ্রিয়তা প্রদান এবং অতিথিসেবাকে প্রতীকী যজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা ও অতিথি-বিনোদনের উপস্থাপনা সত্যই অথর্ববেদে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়গুলির মত চমকপ্রদ।

শতপথব্রাহ্মণ

বৈদিক মন্ত্রের নানাপ্রকারে ব্যাখ্যাসহ বেদের যে অংশে যাগযজ্ঞাদির বিবরণ পাওয়া যায় তাই ব্রাহ্মণ সাহিত্য নামে পরিচিত। Martin Haug প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য

বেদ বিশেষজ্ঞের মতে 'ব্রহ্মণ্' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ যজ্ঞের অধ্যক্ষতুল্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তিনি ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদবিৎ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থসমুহ এই ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের অনুশাসন ও উক্তিসমূহ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের লক্ষণ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন বিবুধমণ্ডলী বিবিধ বিবৃতি দিয়েছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শনের রচয়িতা আচার্য জৈমিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ প্রসঙ্গে সূত্র করেছেন- 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ'।[৭০] কিন্তু যজ্ঞপরিভাষাকার আপস্তম্বের লক্ষণটি এক্ষেত্রে অধিক যথার্থ- 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি'[৭১] অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের চোদনা অর্থাৎ নির্দেশ যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি বিষয়ের মধ্যে বিধি অংশ ব্রাহ্মণের প্রধান অংশ। এই অংশে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ফললাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রৌতকর্মের নির্দেশ বা বিধান পাওয়া যায়। অধ্যাপক Weber এর মতে ব্রাহ্মণ শব্দ যাগানুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ অর্থে সর্বপ্রথম শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায়। এই ব্রাহ্মণ মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব এই দুই শাখায় বিধৃত। মাধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণে একশোটি অধ্যায় আছে বলে এর নাম শতপথব্রাহ্মণ। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে এই গ্রন্থটিকে বিশেষ মূল্যদান করেছে। শতপথব্রাহ্মণ চৌদ্দটি কাণ্ডে বিভক্ত। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ কাণ্ডে পশুবন্ধযাগ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দ্বাদশাহ সত্র, সৌত্রামণিযাগ এবং অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞের বর্ণনাবসরে অতিথিসেবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে প্রাপ্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের মাধ্যমে অতিথি-অভ্যাগত সৎকারের ধারণাটি প্রাচীন হলেও চিরকালীন।

শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত সোমযোগে কয়েক ফোঁটা সোমরস অগ্নিদেবকে প্রদান করা হয়। অগ্নিতে সোমরস উৎসর্গ করার সময় অগ্নিকে অতিথিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবতারা অগ্নিকে যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে প্রেরণ করে থাকেন।[৭২] যজ্ঞকারী ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর

সাথে ও অগ্ন্যাধান কর্মের আগের রাতে উপবাস পালন করেন, এই অগ্ন্যাধানের নিয়মাবলীতে বর্ণিত হয়েছে অতিথির পূর্বে গৃহস্বামী আহার্য গ্রহণ করলে তাতে যজ্ঞীয় ফলের প্রত্যবায় ঘটে। অতিথিরূপে আগত রাজা অথবা ব্রাহ্মণের জন্য আতিথেয়তার অঙ্গ হিসেবে একটি বলদ অথবা বন্ধ্যা গরু রান্না করে দেওয়া হত।[৭৩] প্রায়নীয়েষ্টি যাগের বর্ণনায় সোমকে রাজার মতো অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। এই অভ্যর্থনা প্রদানের মাধ্যমে সোমের অতিথি সত্তা আরোপিত হয়েছে।[৭৪] সোমযাগের বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে 'সোম উদ্ভিদক্রয়' নামে একটি আচার রয়েছে। সোম ক্রয়ের পরে রাজার মত সোম যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন যজ্ঞকারীর অতিথিরূপে সোম প্রতিভাত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞকারী সোমকে আতিথেয়তামূলক সম্বর্ধনা দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যখন কোনও রাজা বা ব্রাহ্মণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন, তখন তাঁদের জন্য একটি বড় বলদ বা ষাঁড় বা একটি বড় পুং ছাগল বলি দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে রাজার ন্যায় সোমের জন্য গৃহস্বামী আতিথ্য প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য যে সোম কেনা হয় তা হল অতিথি; তাই রাজার জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য, মানুষের হব্য হিসেবে যেমন বড় ষাঁড় বা বড় হাতি বা বড় ছাগল রন্ধন করা হয় দেবতাদের জন্যেও অতিথিরূপী সোমকেও সেই আতিথ্যই করা হয়- 'অতিথির্বা এষ এতস্যা আগচ্ছতি যৎ সোমঃ ক্রীতস্তস্মা এতদ্ যথা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং বা মহাগজং বা মহাজং বা পচেত্তদহ মানুষং হবির্দেবানামস্মা এতদাতিথ্যং করোতি।'[৭৫] যজ্ঞক্ষেত্রে সোমকে রাজার ন্যায় অতিথিজ্ঞানে অর্ঘ্য দানের কথা বলা হয়েছে কারণ এই আতিথেয়তা সোমকে শক্তিশালী করে।[৭৬] আত্যিথেষ্টি যাগে সোমকে আতিথ্য প্রদান করা হয়।[৭৭] রাজসূয় যজ্ঞে পবিত্র হওয়ার পর রথ থেকে রাজার পৃথিবীতে অবতরণ করার কথা। রাজা পৃথিবীর ভয়ে ভীত হয়ে ভেবেছিলেন পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ না করতে পারে তাই তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করে নিজেকে গৃহে বসবাসকারী অতিথি, স্বর্গে বসবাসকারী রাজহংস এবং বেদীতে উপবিষ্ট হোতৃ পুরুষের সাথে তুলনা করেন।[৭৮] গৃহে বসবাসকারী অতিথির বাসস্থান ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে পরিস্ফুট হয় যে অগ্নি সকল প্রাণীর অতিথি।[৭৯] যজ্ঞবেদী নির্মাণের সময় 'অগ্নিচয়ন' কর্ম সম্পাদনে ঘৃত নিবেদন করতে হয়। ঘৃত নিবেদনের অব্যবহিত পরে অগ্নিকে অতিথি বলে সম্বোধন ক'রে, জেগে ওঠার আবেদন করা হয়।[৮০] আহবনীয় অগ্নিবেদীর প্রস্তুতিতে রাজা সোমকে অর্পণ করা হয় যখন তাকে অতিথি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৮১] সোম ক্রয় করবার পরে সোমকে রাজার সম্মান দেওয়া হয় যজ্ঞক্ষেত্রে। এই সময় অতিথিকে যেমন আহার্য দিয়ে অতিথিসৎকার করা হয় তেমনি সোমকেও নৈবেদ্য প্রদানের রীতি আছে।[৮২]

শতপথব্রাহ্মণের একাদশকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' অংশটি দৃষ্ট হয়। গৃহস্থ যজমান পাঁচটি কর্ম প্রত্যহ অনুষ্ঠান করবেন। যজ্ঞগুলি হল ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ। এগুলি নামে যজ্ঞ হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি শ্রৌতযজ্ঞ নয়। যজ্ঞ শব্দটি এখানে রূপক অর্থে প্রযুক্ত। তাই এই কর্মগুলি শ্রৌতকর্ম নয় গৃহ্যকর্ম। একজন গৃহস্থ যজমান কর্তব্যকর্ম হিসেবে কিছু আহুতি মনুষ্যেতর প্রানীর উদ্দেশ্যে, প্রয়াত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে, অতিথি বা মনুষ্যগণের উদ্দেশে প্রদান করবেন। যেহেতু পাঁচটি কর্ম একত্রে করণীয় তাই এগুলিকে মহাযজ্ঞ বলা হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় সত্রের মত সারাজীবন পালনীয় তাই এই কর্মকাণ্ডকে 'মহাসত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে; এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল জীবনমাত্রেরই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির কালে এই জীবজগৎ, প্রয়াত পিতৃগণ, দেবগণ ও মানুষের প্রতি এবং ব্রহ্মযজ্ঞে অধীত বিদ্যার প্রতি ঋণ জন্মায়। পঞ্চমহাযজ্ঞ যেন সেই ঋণ স্বীকার বা ঋণশোধের বৈদিক প্রক্রিয়ামাত্র। ভারতীয় ও বৈদিক জীবনাদর্শে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার যে ঐকান্তিক আবেদন তাই যেন এইসব আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়- 'অহরহর্ভূতেভ্যো বলিং হরেৎ। তথৈব ভূতযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যাদোদপাত্রাৎ। তথৈতং মনুষ্যযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধা

কুর্যাদোদপাত্রাৎ। তথৈতং পিতৃযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহা কুর্যাদাকাষ্ঠাৎ। তথৈতং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি।'[৮৩]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রাহ্মণসাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঋগ্বেদীয় কবিত্বের সহজ দৃষ্টিভঙ্গি ও উপনিষদের গভীর তত্ত্বান্বেষণের মধ্যবর্তী স্তরে ব্রাহ্মণসাহিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের অলৌকিক মহিমাকে ব্যক্ত করেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানই এই যুগে শ্রেষ্ঠকর্ম বলে পরিগণিত হয়। যে যজ্ঞানুষ্ঠান ইষ্টপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ছিল, কালক্রমে তা-ই মানবজীবনের মুখ্য লক্ষ্যতে পর্যবসিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণকে 'Manual Of Sacrifice' বা যজ্ঞের প্রক্রিয়াপঞ্জি বলেছেন। Maxmuller ব্রাহ্মণগ্রন্থকে 'Theological twaddle' অর্থাৎ 'ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বরমাত্র' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগ্রন্থ পর্যালোচনায় উপলব্ধ হয় যে কেবলমাত্র যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকাণ্ডের কথা নয় যাগযজ্ঞের বর্ণনার সাথে সাথে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি থেকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও আর্যজাতির তদানীন্তন যে সকল মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির প্রাচীন গ্রন্থে তাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও জীবনধারার তাদৃশ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণগ্রন্থের একটি বড় আকর্ষণ হল তার গল্পাংশ। বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণকারেরা সামান্য সুযোগেই কোন না কোন আখ্যায়িকার অবতারণা করেছেন। এই আখ্যায়িকাগুলির প্রাঞ্জল বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৈনন্দিন মনুষ্যজীবনে অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। আশা, সম্ভাবনা, বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ, উৎসাহজনক বক্তৃতা ও কর্ম, ত্যাগ,

ধর্মাচরণ, শিশু ও গবাদি পশুর পালন- এই সমস্ত কিছু সেই মূর্খ ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অতিথিকে আপ্যায়ন করেনা।[৮৪] গৃহে আগত অতিথিকে সম্মান জানানো হয় তাঁর সামনে প্রথমে আলোক প্রজ্বলনের মাধ্যমে এবং তারপর তাঁকে খাদ্য ও আহার্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয়- 'অথো যথাতিথ্যম্ জোতিষ্কৃত্ব পরিবেবেষ্টি'।[৮৫] অতিথিসৎকারের সম্যক রীতির বর্ণনাবসরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অতিথি আপ্যায়নের প্রসঙ্গটি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে ও সামাজিক রীতিনীতি পালনের আবশ্যকতা সজীব স্নিগ্ধতা লাভ করেছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

প্রত্যেক সংহিতার অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুটি- ঐতরেয় এবং কৌষীতকি বা শাঙ্খ্যায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের শাকল শাখার অন্তর্গত। অধ্যাপক কীথের মতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণধর্মী অংশগুলি বা তার থেকেও প্রাচীনতর। ইতরাপুত্র মহিদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা বা সংকলন কর্তা হিসেবে পরিচিত। এই ব্রাহ্মণের চল্লিশটি অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলি আবার আটটি পঞ্চিকায় বিভক্ত। পাঁচটি অধ্যায়কে একত্রিত করলে হয় পঞ্চিকা। যজ্ঞকর্মের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও বৈজ্ঞানিক মহত্বের বিশ্লেষণের সাথে আতিথেয়তারূপ পরমধর্মের প্রসঙ্গটিও এই ব্রাহ্মণে আলোচিত হয়েছে।

সোমযোগের বর্ণনাবসরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একজন রাজা বা একজন সম্মানীয় ও যোগ্য প্রার্থিত ব্যক্তি যখন অতিথিরূপে আসেন তখন তাঁর আতিথ্যের জন্য লোকেরা তাঁর আতিথেয়তা সম্পাদন করতে একটি ষাঁড় বা গরু প্রদান করে- 'তদ্যথেয়িবাদো মনুষ্যরাজে

আগতেন্যস্মিন্বার্হত্যু ক্ষানং বা বেহন্তং বা ক্ষদন্ত এবমস্মা এতৎ ক্ষদন্তে যদাগ্নিম্ মথনন্তি'।[৮৬] রাজা বা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি অতিথি হিসেবে এলে ষাঁড় বা বন্ধ্যা গরুর রান্নার প্রসঙ্গ অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৮৭] সন্ধ্যাকালে কোন অতিথি এলে সেই অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত- 'তস্মাদাহুর্ন সায়ম্ অতিথিরপ ঋধ্য ইতি'।[৮৮] রাজা যখন আসেন তখন তাঁর সাথে আগত সমস্ত অনুগামীদেরও রাজার মত আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে হয়।[৮৯] রাজসূয় যাগের বর্ণনাতে বলা হয়েছে- সমস্ত প্রাণী খাদ্যের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। বেদ ঘোষণা করে যে, খাদ্যই জীবন, তাই খাদ্য নিজে গ্রহণের সাথে সাথে অপরকে সেবার নিমিত্তও খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। কারণ অতিথিকে অন্যান্য যা কিছু নিবেদন করা হোক না কেন খাদ্যের নিবেদনই সর্বোৎকৃষ্ট নিবেদন।[৯০]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ

ঋক্ মন্ত্রসমূহ সামবেদে পুনরুক্ত হলেও প্রধান পার্থক্য এই যে, মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদে গানরহিত আর সামবেদে মন্ত্রগুলি সামগানযুক্ত বা গানসহিত। উভয় সংহিতার একরূপ হলেও ঋগ্বেদে গানের রাহিত্য ও সামবেদে গানের সাহিত্য দুটি সংহিতাকে আলাদা করে। সামবেদের সহস্র শাখা ছিল- এই কিংবদন্তী ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ সমর্থিত। বর্তমানে এই বেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়। সামবেদের তাণ্ডি শাখার ব্রাহ্মণ তাণ্ড্য। ব্রাহ্মণটি ২৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাই একে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণও বলা হয়। আকৃতিতে বিশাল এই ব্রাহ্মণ মহাব্রাহ্মণ বা প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ নামেও খ্যাত। সোমযোগের বর্ণনাই প্রতিপাদ্য বিষয়। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বহু প্রাচীন আখ্যান, উপাখ্যান, সেযুগের ভৌগোলিক রূপ স্পষ্টতা পেয়েছে। সোমযোগে অতিথিরূপী অগ্নিকে পরম সমাদর করা হয়েছে। বৈশ্বানর অগ্নিকে বলা হয়েছে জ্ঞানী, সর্বজনীন-সার্বভৌম এবং সকল যাজ্ঞিক পুরুষের অতিথি।[৯১] অগ্নি কামনা করেছেন প্রতিগৃহে তিনি অতিথিরূপে অধিষ্ঠান

করতে চান ও গৃহে গৃহে মানুষ তাঁকে আতিথেয়তা দেবেন।[৯২] অগ্নি হলেন যজ্ঞভূমিতে প্রিয়তম অতিথি। অগ্নি- তাঁর প্রতি সদয় হন যিনি অতিথির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিজনক ব্যবহার প্রদর্শন করেন।[৯৩]

ঐতরেয় আরণ্যক

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের ব্রাহ্মণভাগের যে অংশে কর্ম ও জ্ঞানের সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হয়েছে তাকে আরণ্যক বলা হয়। সায়ণাচার্য ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে আরণ্যক শব্দের অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন-

‘অরণ্যাধ্যয়নাদেতদ্ আরণ্যকমিতীর্যতে।

অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রবক্ষ্যতে।।’[৯৪]

অর্থাৎ অরণ্যের নির্জন ও শান্ত পরিবেশে পাঠযোগ্য গ্রন্থকে আরণ্যক বলা হয়। বানপ্রস্থাবলম্বীদের জন্য আরণ্যক গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁরা অরণ্যবাসী হয়ে মনন, চিন্তন, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান এবং ধর্মীয় কার্যাদিতে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। আরণ্যক গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় যজ্ঞানুষ্ঠান বা যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তরালে নিহিত গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যের উন্মোচন। কর্মমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গে যাবার সোপান হল আরণ্যক। আরণ্যকে ক্রিয়াবহুল দ্রব্যযজ্ঞ আন্তরযাগ বা জ্ঞানযজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছিল। আরণ্যকের ঋষিরা ক্রিয়াবহুল বাহ্যযজ্ঞের দ্বারা অভীষ্টলাভের পরিবর্তে জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রেয়স্তত্ত্বোপলব্ধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। আরণ্যক গ্রন্থগুলিতে মূলতঃ গদ্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও পদ্যাত্মক ও ছন্দোবদ্ধ ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে; ভাষার প্রয়োগশৈলী দুর্বোধ্য না হলেও সাঙ্কেতিক প্রকাশভঙ্গির জন্য

আরণ্যকের অন্তর্নিহিত অর্থ সবক্ষেত্রে বুঝতে পারা সহজ নয়। বেদের অন্যান্য শাখার তুলনায় আরণ্যকের সংখ্যা কম।

ঐতরেয় আরণ্যক ঋগ্বেদের শাকল শাখার অন্তর্গত একে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট বলা হয়। এর আঠারোটি অধ্যায় এবং অধ্যায়গুলি পাঁচভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলিও আরণ্যক নামে পরিচিত। প্রথম আরণ্যকে আছে মহাব্রতের বর্ননা। আচার ও রূপকধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে মহাব্রত অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে অতিথির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মোন্নতির চেষ্টা করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে; সে প্রকৃতপক্ষে অতিথি। যে ব্যক্তির মধ্যে এই চেষ্টার অভাব থাকে তিনি আতিথেয়তার যোগ্য নন-

'যো বৈ ভবতি যঃ শ্রেষ্ঠতামশ্নুতে স বা অতিথির্ভবতি।

ন ব অশ্নুতেমাতিথ্যায় আদৃয়ন্তে।।'[৯৫]

উপনিষদ্

বৈদিক সাহিত্যের চারটি পর্যায়- মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগকে অবলম্বন করেই বেদের অবশিষ্ট তিনটি ভাগ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচিত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড- এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, কারণ সেগুলির বিষয়বস্তু যজ্ঞীয় কর্মানুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। আরণ্যক ও উপনিষদ্ গুলিতে প্রধানতঃ উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা অধিগ্রহণের বিষয় আলোচিত হয়েছে। মূল বৈদিক সাহিত্যধারায় উপনিষদ্ সর্বশেষ স্তর; এখানেই জ্ঞানকাণ্ডের চরম পরিণতি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই জিজ্ঞাসু মানবমন পরমতম শ্রেয়োলাভের উপায়টি খুঁজে বার করতে প্রয়াসী হয়েছে। ঋক্ সংহিতায় স্তবস্তুতি সহযোগে

দেবতাদের আরাধনা করে তুষ্ট করতে পারলে অভীষ্ট লাভ সম্ভব এই ধারণাই প্রকটিত। ব্রাহ্মণসাহিত্যে বা কর্মকাণ্ডের যুগে যাগযজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানই কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায় বলে প্রচার করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যজ্ঞ মাত্রেই কর্ম এবং প্রত্যেক কর্মের কোন না কোন ফল থাকে। সেই ফল ঐহিকও হতে পারে আবার পারত্রিকও হতে পারে। ঐহিক সুখসমৃদ্ধি কিংবা স্বর্গসুখ লাভ ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। বৈদিক যুগের এই যজ্ঞানুষ্ঠান কালক্রমে অত্যন্ত জটিল ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। বহু অনুষ্ঠানের মূল তাৎপর্য লোকে বিস্মৃত হতে থাকে। ক্রমশঃ মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয় এবং বেদোক্ত পরিচ্ছিন্নফলপ্রদ কর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তাঁরা মননশীলতার দ্বারা, বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শ্রেয়স্তত্ত্বোপলব্ধির সাধনায় ব্রতী হন। তাঁদের এই জ্ঞান সাধনার ফলশ্রুতিই উপনিষদে বিধৃত হয়েছে। উপনিষদকে প্রাচীন ভারতের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত বলা যায়।

উপনিষদ্ 'বেদান্ত' নামে অভিহিত। বেদ + অন্ত = বেদান্ত। উল্লেখ্য এখানে 'অন্ত' শব্দটি 'শেষ' অর্থে নয়, 'নির্যাস' অর্থে প্রযুক্ত। কাম্যকর্ম বর্জিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক ভাবনাই বেদান্ত-বেদের নির্যাস। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Hauer এর মতে তপস্যা ও ধ্যানলভ্য রহস্যজ্ঞানই উপনিষদ্। উপ-নি-√সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে উপনিষদ্ শব্দটি নিষ্পন্ন। সাধারণতঃ উপ- শব্দের অর্থ সমীপে বা সত্বর। নি-শব্দের সাধারণ অর্থ নিঃশেষ বা নিশ্চয়। √সদ্-ধাতু প্রধানতঃ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত ১. বিশরণ বা বিনাশ, ২. গতি বা প্রাপ্তি ৩. অবসাদন বা শিথিলীকরণ। ধাত্বর্থ অববোধের জন্য উপনিষদের অর্থও বিবর্তিত হয়-

১. গুরুসকাশে নিশ্চয় সহকারে অর্থাৎ সংশয়নিরাশপূর্বক অধিগত যে বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাই উপনিষদ্।

২. যে বিদ্যা সত্বর ও নিশ্চিতভাবে নানা অনর্থসঙ্কুল অবিদ্যা ও সংসারের কারণকে অবসন্ন বা শিথিল করে তাই হল উপনিষদ্।

৩. যে বিদ্যার সমাশ্রয়ে মুমুক্ষুর নিশ্চিতভাবে সংসারের সারত্ববুদ্ধি বিনষ্ট হয় তাই উপনিষদ্।

উপনিষদের সংখ্যা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। এগুলির সংখ্যা ১০৮ টি থেকে আরম্ভ করে ২০০ পর্যন্ত বলা হয়েছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ টি উপনিষদের নাম রয়েছে। মাত্র চৌদ্দটি উপনিষৎকে পন্ডিতগণ প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই উপনিষৎগুলির নাম হল- ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, মৈত্রায়ণী এবং মহানারায়ণীয়। এই চৌদ্দটির মধ্যে শঙ্করাচার্য দশটি উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন। এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে-

‘ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরিঃ।

ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।।’[৯৬]

উপনিষৎগুলিতে কেবল মানবজীবনের দুঃখময়তা ও পার্থিববস্তুর প্রতি মানুষের আসক্তির ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদও যে অসার তা উপনিষদের তত্ত্ব আলোচনাতে বোঝা যায়। উপনিষদে মানবজীবনের দুঃখময়তার কথা বলা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই দুঃখময়তাই উপনিষদের প্রধান তত্ত্ব ও চরম কথা নয়। সংসার চক্রের আবর্তনে যে দুঃখবোধ তা নিত্য এবং শাশ্বত নয়। সেই দুঃখ থেকে মানুষ মুক্তি পেলে চিরন্তন সুখ ও আনন্দ পায় যা শুধুমাত্র আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা সম্ভবপর। আর এই আত্মজ্ঞান হল অমৃত, যার মধ্যে দুঃখের লেশটুকুও নেই। তাই এই আত্মজ্ঞান বা মোক্ষকে ‘আনন্দৈকরস’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মোক্ষলাভের পর বা আত্যন্তিক মুক্তিলাভের পর মানুষকে আর সংসারের দুঃখাবর্তে

পড়তে হয় না- 'ন স পুনরাবর্ততে'। মোক্ষপ্রাপ্তিতে সব শোক, সব মোহ নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত কার্যফলের ঘটে অত্যয়। সুতরাং উপনিষদ্ অবিমিশ্র সুখ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান দিতে তৎপর, দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবাদ তার প্রতিপাদ্য নয়। উপনিষদে বর্ণিত নানা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে অতিথি-অভ্যাগত প্রসঙ্গ ও আতিথ্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদ্ সাহিত্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই আতিথেয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, শুধু তাই নয় অতিথিসৎকারকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কয়েকটি উপনিষদের আধারে অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে-

কঠোপনিষদ্

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কঠোপনিষদে দুটি অধ্যায় আছে। প্রতি অধ্যায়ে তিনটি করে বল্লী রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীতে আতিথ্যের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। ঋষি বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ নিস্পন্ন করে যখন দানকার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন সেইসময় পুত্র নচিকেতা পিতাকে বারবার প্রশ্ন করেন- 'আপনি আমাকে কোন ঋত্বিককে দান করবেন?' (কস্মৈ মাং দাস্যতীতি)।[৯৭] বারবার এই একই প্রশ্ন করায় পুত্রের অভিপ্রায় না জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষি বলেন, 'তোমায় যমকে দিলাম' (মৃত্যবে ত্বা দদামীতি)।[৯৮] এমতাবস্থায় সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা পিতৃবাক্য প্রতিপালনের জন্য যমদ্বারে উপস্থিত হন এবং সেইসময় যমপুরীতে অনুপস্থিত ছিলেন ধর্মরাট্ যমরাজ। যমের পরিজনেরা আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ, বালক নচিকেতাকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে অতিথিসৎকার করতে চাইলেও নচিকেতা গৃহকর্তা যমের অনুপস্থিতিতে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যমরাজ প্রবাস থেকে ফিরলে তাঁর পরিজনেরা তাঁকে জানান-

'বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।

তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্।।'[৯৯]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে সমাগত হন, অগ্নি যেমন তার দাহিকা শক্তির দ্বারা সবকিছু প্রজ্বলিত করেন তেমনি অতিথিকে যদি সন্তুষ্ট না করা হয় তাহলে ঘরবাড়ি সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। অতিথির সমুচিত সমাদর না হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। এজন্য অতিথিসৎকারের সূচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে 'তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি' অর্থাৎ হে সূর্যপুত্র যমরাজ আপনি সত্বর অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন করুন। এর ব্যতয় যাতে না ঘটে, তারপরেই বলা হয়েছে-

'আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।

এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।।'[১০০]

অর্থাৎ যার গৃহে ব্রাহ্মণ-অতিথি অনাহারে বাস করেন, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের আশা (বা অপরিচিত বস্তুপ্রাপ্তির বাসনা), প্রতীক্ষা (বা বিজ্ঞাত বস্তুপ্রাপ্তির ইচ্ছা), সাধুসঙ্গের ফল, প্রিয়বাক্য প্রয়োগের ফল, যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন ফল, সাধারণের জন্য কূপতড়াগাদি দান করার ফল, পুত্র ও পশু-এই সমস্তই অতিথির উপবাসের ফলে বিনষ্ট হয়। অতিথিসৎকারে কোন ত্রুটি হলে গৃহকর্তা নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে করতেন। এক্ষেত্রে যম নিজে গৃহকর্তা, সে হিসেবে তাঁর দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ আচরণ হয়েছে। যম নিজে ধর্মরাজ তাই তিনি পাপস্খলনের জন্য তিনটি বর নচিকেতাকে দিতে চাইলেন। সুতরাং অতিথির মর্যাদা কিভাবে দিতে হয় সেই শিক্ষা প্রদানের জন্যই ধর্মরাজের এই অনুপম আচরণ। যদিও ধর্মরাজ যম দেবতা এবং তিনি বালক নচিকেতার পূজার্হ, কিন্তু এক্ষেত্রে যমরাজ গৃহস্বামী তাই আদর্শ গৃহস্থের ধর্ম যে কি তা নিজে আচরণ করে জগতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন-

'তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।

নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মণ্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীস্ব।।'[১০১]

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণই যেমন একমাত্র ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যকও তেমনি একমাত্র আরণ্যক। এই আরণ্যকেরই শেষ ছয়টি অধ্যায়কে সম্বলিত করে বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ রচিত। এই উপনিষদ্টি তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত- মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড ও খিলকাণ্ড। এই প্রতি কাণ্ডের দুটি করে অধ্যায়। এই সকল অধ্যায় আবার ব্রাহ্মণে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে ছটি করে ব্রাহ্মণ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি, পঞ্চম অধ্যায়ে পনেরোটি এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান। ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য, পরলোকতত্ত্ব, কর্মফলতত্ত্ব, বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা এই উপনিষদে পাওয়া যায়। আয়তনের বিশালতায়, বিষয়ের বহুলতায়, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, তত্ত্বের গভীরতায়, যুক্তির সারবত্তায় এবং অর্থের গুরুতায় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সকল উপনিষদের শিরোমণি। এই উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টিতে সকল বস্তু ব্রহ্মময়। ব্রহ্মলাভেচ্ছু মানুষ আত্যন্তিক মুক্তির প্রতি আকুলতা প্রদর্শনের পাশাপাশি জীবসেবায় ব্যাপৃত হবে এই নির্দেশ পাওয়া যায়। আশ্রয় ও খাদ্য দ্বারা পরম অতিথিরূপে জীবসেবার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে-

'অথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যো অশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণাং।'[১০২]

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দশটি অধ্যায় বা প্রপাঠক আছে। এর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়কে তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলা হয়। এই উপনিষদের তিনটি ভাগ- শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী। এই তিনটি বল্লী আবার কতগুলি অনুবাকে বিভক্ত। বল্লী অনুযায়ী অনুবাকগুলির সংখ্যা যথাক্রমে বারো, নয় এবং দশ। শিক্ষাবল্লীতে শিক্ষাপ্রণালী, বর্ণের উচ্চারণবিধি, উপাসনা ও আচরণীয় নিয়মাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীকে আচরণ এবং জীবনাদর্শের পথও দেখানো হয়েছে শিক্ষাবল্লীতে। বেদ-বেদন্তাদি অধ্যাপনান্তে গুরুগৃহ ত্যাগের সময় গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছেন-

'সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।।'[১০৩]

শুধুমাত্র মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান নয় সদাচারের সহজপাঠ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এই উপনিষদে। দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে মনোযোগী হবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত কর্ম অনিন্দিত তা করতে বলা হয়েছে; মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা করতে বলা হয়েছে –

'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি।'[১০৪]

গৃহী হিসেবে অতিথিকে ভোজন করানো ও তার যথাসম্ভব আপ্যায়ন করা অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। গুরু নির্দেশ দিয়েছেন- অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আপ্যায়ন করতে হয়-

'অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ।'[১০৫]

গার্হস্থ্য জীবনে অনুপ্রবেশের প্রাক্কালে গুরু প্রদত্ত এই সদাচারের নির্দেশ শিষ্যের ভাবী জীবনকে কলুষমুক্ত হতে সাহায্য করে। পালনীয় বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে অভ্যাগত সৎকারের মহৎ প্রসঙ্গটি গুরুবাক্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

সামবেদীয় তাণ্ড্য শাখার অন্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায় ছান্দোগ্যোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন বৈদিক উপনিষৎগুলির মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অন্যতম ও বিশালাকায় এই উপনিষদ্ গদ্যে রচিত। বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে হৃদয়ের গভীরে অবস্থিত আত্মা বা ব্রহ্মকে প্রাপ্তির পথনির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাম' শব্দের অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে উদ্গাতার উদ্দেশ্যে জীবসেবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই জীবসেবা মনুষ্যযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞেরই নামান্তরমাত্র-

'অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেনানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত।'[১০৬]

মুণ্ডকোপনিষদ্

মুণ্ডকোপনিষদ্ অথর্ববেদের শৌনক শাখার অন্তর্গত। উপনিষদ্টির মুণ্ডক নামকরণের ব্যাখ্যা নানা ভাবে করা হয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক শিষ্যগণ কর্তৃক অধীত হতো বলে এর নাম হয়েছে মুণ্ডক। মস্তক মুণ্ডন ত্যাগের প্রতীক (বাহ্যিক প্রতীক) আবার প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ রাধাকৃষ্ণণের মতে এই উপনিষদ্ অবিদ্যা মুণ্ডন করে মুক্তির পথ দেখায় বলে এটি মুণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মতে অথর্ববেদের আঠাশটি উপনিষদের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠতম। তাই একে মুণ্ড(শির) বলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন মুণ্ডক ঋষি এটির মন্ত্রদ্রষ্টা বলে তাঁর নামানুসারে এই উপনিষৎটি মুণ্ডকোপনিষদ্। সমগ্র উপনিষৎটি তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত; প্রতিটি মুণ্ডক আবার ছয়টি খণ্ডে আধারিত। শিষ্যগণকে পরা-অপরা বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষাদানাবসরে ব্যবহারিক জগতের পালনীয় কর্তব্যবিধির উপদেশ দেওয়া হয়েছে- এই প্রসঙ্গে অতিথিসেবার মহনীয় দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে-

'যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শপৌর্ণমাসম্ অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্ আসপ্তমাংস্তস্যলোকান্ হিনস্তি।।'[১০৭]

ভারতবর্ষ তার জীবন ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলির প্রায় প্রতিটির জন্যই উপনিষদের কাছে ঋণী। তাই উপনিষদ্ না বুঝে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব। উপনিষদ্ হল তেজ ও সৃজনীশক্তির চিরন্তন প্রবাহিনী প্রস্রবন। এই সৃজনশীলতা ও তেজ আহৃত হয়েছে উপনিষদ্-লালিত মানবসত্তার আত্মস্বরূপতাবোধ, মানব ব্যক্তিত্বের শাশ্বত, অনন্ত ব্যাপ্তিবোধ থেকে। উপনিষদের মূল চিন্তা হলো মানবাত্মার মুক্তি এবং বাণী হলো নির্ভীকতা, প্রেম ও সেবাপরায়ণতা। উপনিষৎগুলি প্রত্যেকটিই বৃহৎ সামাজিক, রাজনৈতিক বা

ধর্মীয় আন্দোলনকে তথা জীবনের ঘটনাবলীকে, প্রতিটি জীবের জন্মগত মুক্তি লাভেচ্ছার- একটি কোষ বা দেহে, একটি সমাজরীতিতে বা শাসন ব্যবস্থায়, একটি ধর্মবিশ্বাসে বা দার্শনিক মতবাদে, একটি পারস্পরিক বন্ধনে বা সম্পর্কজালে আবদ্ধ অনন্তের মুক্তি সংগ্রামের- এক একটি স্ফূরণ বলে বুঝিয়ে দেয়। শাশ্বত মানবাত্মার গভীরতম মন্ত্রবাণীর চিরন্তন সত্যোপলব্ধির মহিমময় এবং আশ্চর্যময় প্রকাশ ঘটেছে উপনিষদেই। উচ্চস্তরের কবিত্বে পূর্ণ উপনিষদ্ সাহিত্যে মহান সৃষ্টির আলোকে মানুষ তার অন্তরের দীপশিখাটি জ্বালাতে সমর্থ হয়েছে মনন ও সাধনার ঊষালগ্ন থেকে। শুধু ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তাই নয়- কর্মচোদনার মাধ্যমে ঈপ্সিত পরমার্থলাভের পথ দেখায় উপনিষদ্। অতিথিসৎকারের ন্যায় ফলপ্রসূ ব্রহ্মোপাসনার অনন্য রূপটি চমৎকাররূপে বর্ণিত হয়েছে উপনিষদে। বর্তমান জগতে মানুষের জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী নব মূল্যায়নের পরিকল্পনায় উপনিষদ্ বর্ণিত জীবনচর্যার আঙ্গিকে অতিথিসেবার প্রসঙ্গটি প্রকৃতই অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যপঞ্জি

১. ঋগ্বেদ ১০/১/৯১

২. ঐ ১০/৪৫/১

৩. ঐ ১/৪৪/৪

৪. ঐ ১/৫৮/৬

৫. ঐ ১/৭৩/১

৬. ঐ ১/১২৭/৮

৭. ঐ ১/১২৮/৪

৮. ঐ ১/১৮৬/৩

৯. ঐ ১/৩১/১৫

১০. ঐ ২/২/৮

১১. ঐ ২/৪/১

১২. ঐ ৩/২৬/২

১৩. ঐ ৪/১/২০

১৪. ঐ ৪/২/৭

১৫. ঐ ৪/৪/১০

১৬. ঐ ৪/৪০/৫

১৭. ঐ ৫/১/৮

১৮. ঐ ৫/১/৯

১৯. ঋগ্বেদ ৫/৪/৫

২০. ঐ ৫/৩/৫

২১. ঐ ৫/৮/২

২২. ঐ ৫/১৮/১

২৩. ঐ ৫/২৮/২

২৪. ঐ ৬/২/৭

২৫. ঐ ৬/৪/২

২৬. ঐ ৬/৭/১

২৭. ঐ ৬/১৫/১

২৮. ঐ ৬/১৫/৪

২৯. ঐ ৬/১৫/৬

৩০. ঐ ৬/১৬/৪২

৩১. ঐ ৬/৪৭/২০-২৩

৩২. ঐ ৭/৩/৫

৩৩. ঐ ৭/৮/৪

৩৪. ঐ ৭/৯/৩

৩৫. ঐ ৭/৪২/৪

৩৬. ঋগ্বেদ ৮/১/৩২-৩৩

৩৭. ঐ ৮/৫/৩৭

৩৮. ঋগ্বেদ ৮/৬/৪৬-৪৭

৩৯. ঐ ৮/১৫/৪-৫

৪০. ঐ ৮/১৯/৮

৪১. ঐ ৮/২৩/২৫

৪২. ঐ ৮/৪৪/১

৪৩. ঐ ৮/৭৪/১৫

৪৪. ঐ ৮/১০৩/১০

৪৫. ঐ ৮/১০৩/১২

৪৬. তৈত্তিরীয় সংহিতা ১/২/১০

৪৭. ঐ ১/২/১৪

৪৮. ঐ ১/৪/১৩

৪৯. ঐ ১/৬/১২

৫০. ঐ ১/৮/১৫

৫১. ঐ ২/৫/১২

৫২. ঐ ৩/৫/১১

৫৩. ঐ ৪/২/৩

৫৪. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫/২/২

৫৫. ঐ ৬/২/১

৫৬. অথর্ববেদ সংহিতা ৯/৩/২/৬

৫৭. ঐ ৯/৩/২/৩

৫৮. ঐ ৯/৩/২/১২

৫৯. ঐ ৯/৩/২/১৩

৬০. ঐ ৯/৩/৩/২

৬১. ঐ ৯/৩/৩/৩

৬২. ঐ ৯/৩/৩/৪

৬৩. ঐ ৯/৩/৩/৫-৬

৬৪. ঐ ৯/৩/৩/৮-৯

৬৫. ঐ ৯/৩/৩/১০-১৩

৬৬. ঐ ৯/৩/৪/১-৬

৬৭. ঐ ৯/৩/৪/৭-৮

৬৮. ঐ ৯/৩/৫/১-৮

৬৯. ঐ ৯/৩/৭/৫

৭০. জৈমিনিসূত্র ২/১/৩৩

৭১. আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষাসূত্র ১/৩৫

৭২. শতপথব্রাহ্মণ ৪/২/৪/২৪

৭৩. ঐ ২/১/৪/২

৭৪. ঐ ৩/২/৩/২০

৭৫. ঐ ৩/৪/১/২

৭৬. ঐ ৩/৪/৩/১২

৭৭. ঐ ৯/৫/১/২১

৭৮. ঐ ৫/৪/৩/২২

৭৯. ঐ ৬/৭/৩/১১

৮০. ঐ ৬/৮/১/৬

৮১. ঐ ৭/৩/২/১

৮২. ঐ ৭/৩/১/৪

৮৩. ঐ ১১/৫/৬/২

৮৪. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/১১/৮/৩-৪

৮৫. ঐ ২/১/৩

৮৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১/১৫

৮৭. ঐ ৩/৪

৮৮. ঐ ২৫/৫

৮৯. ঐ ১১/৯

৯০. ঐ ৩৩/১

৯১. তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ৪/৬/২১

৯২. ঐ ১৪/২/৩৭

৯৩. ঐ ১৪/১২/১

৯৪. তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য ৬

৯৫. ঐতরেয় আরণ্যক ১/১/১

৯৬. মুক্তিকোপনিষদ্ ১/৩০

৯৭. কঠোপনিষদ্ ১/১/৪

৯৮. ঐ ১/১/৪

৯৯. ঐ ১/১/৭

১০০. ঐ ১/১/৮

১০১. ঐ ১/১/৯

১০২. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১/৪/১৬

১০৩. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১/১১/১

১০৪. ঐ ১/১১/২

১০৫. ঐ ১/৯/১

১০৬. ছান্দগ্যোপনিষদ্ ২/২২/২

১০৭. মুণ্ডকোপনিষদ্ ১/২/৩

তৃতীয় অধ্যায়

বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ

বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্ময়কর সুসম বিকাশ ঘটেছে বৈদিকযুগের হাত ধরে। বৈদিক সাহিত্যে নিহিত ধর্মচিন্তার অফুরন্ত সঞ্জীবনী সুধা থেকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে যুগ থেকে যুগান্তরে নানা বিচিত্র রূপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি সেদিন পরিচিতি ছিল বৈদিক আর্যসংস্কৃতি রূপে। এই আর্যধর্মের শাশ্বত অনুশাসনের মধ্যেই প্রথম মানব-সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির সনাতন রূপটি সার্থকরূপে উন্মোচিত হয়েছিল। সত্যদ্রষ্টা আর্য বৈদিক ঋষির তপঃস্নিগ্ধ অনুশাসন মানুষের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়বিধ উন্নতি বিধান ও সমাজব্যবস্থার কার্য রূপায়ণের জন্য প্রভূত কার্যকরী হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুরই সুন্দর দিগ্নির্ণয় ও তত্ত্ববিন্যাস। মনুষ্যজীবনে অন্তনির্হিত দেবত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুশাসনের। ভারতীয় সংস্কৃতির নির্ধারিত পালনীয় অনুশাসন বা সদাচার বা বিধির মধ্যে অতিথিসেবা বৈদিকযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগেও সমাদৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যসমূহে অতিথি-আতিথেয়তা প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত হওয়ার কারণে অনুপ্রাণিত মানবকুল অতিথিসৎকার দ্বারা পরমেষ্টি লাভের নিদর্শন রাখতে পেরেছে; সেই আতিথ্যগুণের ধারা বেদের যুগের পরেও অব্যাহত ছিল। সুবৃহৎ বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে জ্ঞানকাণ্ড চরম পরিণতি লাভ করে উপনিষদের আঙিনায়। সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে- ভূমানন্দ লাভের, পরমশ্রেয়োলাভের উপায় কি? বৈদিকসংহিতায় দেবস্তুতি, ব্রাহ্মণসাহিত্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানমূলক কর্ম পরমার্থ বা কল্যাণলাভের একমাত্র উপায় বলে নির্দিষ্ট হলেও শ্রেয়োলিপ্সু মানবমন শুধু এই পদ্ধতিকে শিরোধার্য ক'রে ইষ্টলাভের দিকে এগোয়নি। বৈদিকযুগের সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, সমুন্নত দার্শনিক চিন্তাধারা, পরাবিদ্যার পারমার্থিকত্ব

স্বরূপ গভীর তত্ত্বালোচনার সাথে সাথে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে আচরিত কর্তব্যের মধ্যে অতিথিসৎকারকে অন্তর্ভুক্ত করে বেদপরবর্তী-সমাজ এগিয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবমুক্ত বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে অতিথিসেবার প্রসঙ্গ বারবার আপন গৌরবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদবিহিত জীবনচর্যার অঙ্গ হিসেবে বেদের যুগে আতিথেয়তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ যেমন ছিল তেমন বেদ-পরবর্তী সময়কালেও প্রাত্যহিক জীবনের উৎকর্ষতা সাধনের অঙ্গ হিসেবেও এই সদাচার গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা বিমর্শ দুটি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে-

ক. ধমর্শাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তা

খ. পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত আতিথেয়তা

ধর্মশাস্ত্রসমূহ হল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ও ভারতীয় জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ দলিল। বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষে দুই বৃহদায়তন মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে- রামায়ণ ও মহাভারত। ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরাণের ব্যাপকতা বিশাল। মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও কথাসাহিত্য- যেগুলি বেদরচনার বহু পরে সমগ্র মানবজাতিকে উওরণের মার্গ নির্দেশ করার জন্য রচিত হয়েছিল সেখানেও অতিথি-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নানা আঙ্গিকে কল্যাণার্থ নবতররূপে অতিথির প্রসঙ্গ প্রকাশোন্মুখ হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় বেদোত্তরকালীন সুদীর্ঘ সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ পল্লবিত হয়েছে।

ক. ধর্মশাস্ত্রে তথা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আতিথেয়তা

কালের সাথে সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে চলেছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত অতীতের দিকে অবলোকন করলে দেখা যায়, তার ললাট উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মহামূল্য মণিরত্নে খচিত বৈদিক যুগের তরুণ আর্যজাতির আধ্যাত্মিক পিপাসায়, উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতির এক আবেগোচ্ছ্বল সন্মার্গ নির্দেশক বাণীতে এবং জীবনের দার্শনিকদের নৈতিক নিষ্ঠায়। খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় ভারতীয় সংস্কৃতির-সভ্যতার ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে রেখেছে অমর মহাকাব্যগুলির আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজনবোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-প্রবণতা এবং ক্রান্তদর্শী, স্থিতপ্রজ্ঞ ভারত-মনীষার অনাবিল পবিত্রতা, বিমল ভক্তি ও সর্বোপরি কর্তব্যবোধ। ভারতীয়দের সংস্কারসাধনের প্রবল ইচ্ছাপ্রবাহ ধাবিত হয়েছে যুগান্তকারী আচরণগত কর্তব্য পালনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির উজ্জ্বল গৌরবময় ক্রমোন্নতির কথা পর্যালোচনা করলে ভারতীয়দের অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায়, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তুলনায় উৎকর্ষতায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপী অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক সন্মোহনের দোর্দ্দণ্ড প্রভাবে নতুন ভারতের অধিবাসীরা অধিকাংশই অভিভূত হয়ে পড়লেও, কতগুলি অশুভ প্রভাব তরঙ্গায়িত হয়ে ভারতীয়দের নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার ও ভারতমনকে বিপথগামী করার তীব্র প্রয়াস চালালেও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে বর্ণিত মানবীয় উৎকর্ষসাধনের দিকগুলি এখনও সমুজ্জ্বল। ঠিক এই কারণেই ভারতীয় সনাতন আদর্শগুলি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে এক উচ্চতর স্থানে উপনীত করেছে। মানবিক উৎকর্ষসাধনের ধ্যানধারণাকে সমগ্র আধুনিক মানবজাতি বিসর্জন দিয়ে শুধু তিনটি প্রবৃত্তির অন্বেষণে রয়েছে ব্যাপৃত, সেগুলি হল– ভোগসুখ,

সম্পদবৃদ্ধি ও ক্ষমতার্জন। চারিত্রিক সমৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে তোলার ও সমাজের উন্নতিকল্পে সচেতন হয়ে ওঠার জন্য যে বীরত্বব্যঞ্জক উৎসাহ ও উদ্দীপনার দরকার হয়– আমরা ক্রমাগতই সেই পথ বিস্মৃত হতে বসেছি। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামনে জীবনের লক্ষ্যকে এত ঊর্ধ্বে, এত অতীন্দ্রিয় স্তরে স্থাপন করা হয়েছে যে, সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া কোটি কোটি মানুষের পুষ্টিসাধন অপূর্ণ থেকে গেছে, এমনকি মানুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জীবনের কাঙ্খিত উচ্চ লক্ষ্য থেকে শুধুমাত্র বোধগম্যতার অভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়েছে। জনসাধারণের সামান্য কিয়দংশই বোঝে ধর্ম হল 'মোক্ষ' বা আধ্যাত্মিক মুক্তির একটি উপায়। কিন্তু ধর্মের আরেকটি সংজ্ঞা আছে, যেখানে ধর্ম বলতে চারিত্রিক গুণাবলী, সামাজিক সচেতনতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সমাজসেবা প্রভৃতি বোঝায়। এগুলিকে আমরা নৈতিক জীবনের উৎকর্ষসাধনের এক একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করতে পারি। কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় জগতের উৎকর্ষভাবনার ওপর আলোকপাত না ক'রে যে ইতিবাচক গুণগুলি, যে সুকুমার বৃত্তিগুলি আমাদের সক্রিয় নৈতিকতার উপাদানস্বরূপ যা আমাদের ব্যষ্টিজীবন বা সমষ্টিজীবনের মানবিক সম্ভাবনাগুলির পথ উন্মুক্ত ক'রে সমগ্র মানবকুলের জন্য এক সুন্দর, পরিশীলিত জীবন গড়ে তুলতে পারে তার সযত্ন পরিপালনে ব্রতী হওয়া উচিত। বৈদিকসাহিত্যসমূহ থেকে ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে সেই পথনির্দেশ করা হয়েছে। জাগতিক পারিবারিক জীবনে নানা আচরিতব্য কর্তব্যগুলির মধ্যে এক অতি বিদিত-প্রাঞ্জল সামাজিক রীতি হল আপ্যায়নের রীতি। সরল-শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবিক জীবনে এই আপ্যায়নের রীতিকে ধর্মশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে সহজ রীতিযুক্ত এই অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের রীতি অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত হলেও এই সনাতন রীতির পালনে অমনোযোগী হলে সামাজিক মানুষ মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তির উচ্চ লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং ফলস্বরূপ চারিত্রবল, কর্মদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও মানবকল্যাণের যে সম্ভবপর

লক্ষ্য তাও অনার্জিত থেকে যায়। মুক্তি লাভের গৌরীশৃঙ্গে উঠতে হলে একজন মানুষকে প্রথমে ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে উত্তরণের অভিলাষী হতে হয়– যেগুলি সহজবোধ্য। যারা এই ছোট ছোট উত্তরণের ধাপগুলি জয় করতে ব্যর্থ হয় তারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুপ্রকারের বিফলতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাবধান বাণী তাই শ্রুত হয়– 'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে'[1] অর্থাৎ কর্মের প্রাথমিক শৃঙ্খলাবোধ ছাড়া মানুষ ধ্যানাদির নিয়মনিষ্ঠা থেকে কিছুই লাভ করতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে মোক্ষলাভ বা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করার যে পদ্ধতি তা কখনই আধ্যাত্মিক পথের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নৈতিকতা রক্ষা করা অথবা মানুষের সাথে মানুষের মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে না। মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে পদ্ধতি মূলতঃ ধ্যানাভ্যাস ও অন্তর্মুখীনতা; উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ বা মানবীয় উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি হলো কাজের মধ্য দিয়ে, কর্তব্যকর্মাদি সমাধার মাধ্যমে, সামাজিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শরীর-মন ও ইন্দ্রিয়গুলির এক সুসংযত প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় এই পদ্ধতিকে অবহেলা করলে মানব চরিত্রের মূল ভিত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; তাই সামাজিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উৎকর্ষলাভের অর্থ তথা নানান মানুষের স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার আধার হিসেবে সমাজকে গ্রহণ করা, সমাজমুখী ইচ্ছাশক্তি ও সমাজকল্যাণমুখী সদাচার গড়ে তোলার ক্ষেত্র হিসেবে সমাজকে গ্রহণ করা। এই সামাজিক বন্ধনের মধ্যে মানবিক অবস্থানের আনন্দকে জীবনে পাথেয় করা। এই সামাজিক গুণাবলী ও বিকশিত সুকুমার বৃত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হল অতিথিপরায়ণতা। এই অতিথি কে? তাঁর স্বরূপ কি? তাঁর আপ্যায়নের রীতিনীতি উল্লেখপূর্বক ধর্মশাস্ত্রগুলি মানবীয় উৎকর্য প্রতিস্থাপনের এক সরলতম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন। প্রাত্যহিক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্যরাজির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে অতিথিসৎকার তার স্থান করে নিয়েছে।

ধর্মশাস্ত্র স্মৃতি নামে অভিহিত। ভারতীয় সনাতন শিক্ষা অনুসারে বিদ্যা দুই প্রকারের- পরা ও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যার আবার দুটি ধারা- শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি হল বেদ। বৈদিকী শিক্ষাকে স্মরণে রেখে শ্রুতি-পরবর্তী যুগে স্মৃতিসাহিত্যের উৎপত্তি। স্মৃতিশাস্ত্রই হল ধর্মশাস্ত্র। 'ধর্ম' শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হলেও ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল বৈদিকী শিক্ষার আলোকে ভারতীয় জীবনকে পরিশীলিত করে পরম পুরুষার্থলাভের পথ প্রশস্ত করা। ধর্ম অভিপ্রেত ফল বর্ষণ করে বলে ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম বৃষরূপে কল্পিত। বেদ সেই বৃষের পরিচয় দিয়েছে -

'চত্বারি শৃঙ্গাঃ ত্রয়োঽস্য পাদাঃ।

দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।।

ত্রিধা বদ্ধোবৃষভো রোরবীতি।

মহোদেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ।।'[২]

এই বিলক্ষণ বৃষরূপ ধর্মের তিনটি চরণ বা বিষয়। এগুলি হলো আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। আর্যভারতের অনুসরণীয় ধর্মবিধি ও পরিত্যাজ্য প্রতিষেধবিধি ধর্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ধর্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্যসূচীর অন্যতম হল আচার পর্ব। ভারতীয়দের প্রাত্যহিক কর্তব্য, দেশাচার, লোকাচার, বর্ণ ও আশ্রমধর্ম, গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সংস্কার, বেদাধ্যয়নবিধি আচারপর্বের আলোচ্য বিষয়। খাদ্যাখাদ্যবিধি, স্নাতকধর্ম, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধিও আচারকাণ্ডে পর্যালোচিত হয়েছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আচারপর্বের বিষয়সমূহ বর্ণনায় বলেছেন -

'ভার্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্ত্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ।

নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ।।'[৩]

আতিথেয়তার গুরুত্ব আলোচনায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মশাস্ত্র তথা স্মৃতিশাস্ত্রকে উপজীব্য করে গবেষণা কর্মের বিস্তৃতি প্রদর্শিত হল-

মনুসংহিতা

পরমাত্মজ্ঞান লাভই ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা। নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে পরমপুরুষার্থ লাভের যে পথ ধর্মশাস্ত্রসমূহ নির্দেশ করেছে তা পালনীয় অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বর্ণাশ্রমধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজজীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৈদিক বিধিকে আশ্রয় করে ধর্মশাস্ত্র পুরুষার্থের পথ দেখিয়েছে। সাধারণ মনুষ্য সমাজের সামনে আদর্শ জীবনের রূপরেখা স্থাপনই ছিল ধর্মশাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য। বৈদিক শিক্ষাকে সাধারণ মনুষ্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অবিচল ছিল ধর্মশাস্ত্রসমূহ। মহর্ষি মনুর উক্তিতে –

'যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।

স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।।'[৪]

বেদপরবর্তী যুগের পথ প্রদর্শক হিসেবে ধর্মশাস্ত্রগুলিই যে পুরোধা ছিল একথা মনু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন –

'আচারো পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।

তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।।[৫]

সদাচার ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে সামাজিক মনুষ্যবর্গকে সর্ব্বোচ্চ সাফল্যে পৌঁছে দেবার যে মহতী উদ্দেশ্য ধর্মশাস্ত্র গ্রহণ করেছিল তার অন্যতম উপায় হিসেবে অতিথিসৎকারের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনুষ্যজীবনে 'চতুরাশ্রম' প্রথা প্রবর্তিত ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার পর্যায় ছিল চতুরাশ্রমের ভিত্তি। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রম হল জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই আশ্রমেই সেবা ও যজ্ঞ সম্পাদনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। গৃহী অন্যান্য আশ্রমিক জীবনের আশ্রয়স্থল ও প্রাণস্বরূপ। অন্যের প্রতি ঘৃণা, অহংবোধ, আচরণের রূঢ়তা, হিংসা গৃহীর সর্বতোভাবে বর্জনীয়। গার্হস্থ্যাশ্রমের একটি একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মনু গৃহস্থের বহু কর্তব্যকর্মের বা ধর্মপালনের নির্দেশ দিয়েছেন; যার মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত। এই যজ্ঞগুলি হল ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ –

'ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং যথাশক্তি ন হ্যপয়েৎ।।'[৬]

অর্থাৎ ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ– এই পাঁচ প্রকার মহাযজ্ঞ আছে, যাদের পরিত্যাগ করা উচিত নয়। গৃহীকে প্রত্যেকদিন এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হত। যেহেতু গার্হস্থ্যশ্রমে থেকে গৃহস্থ নিজের বিবিধ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সমাধা করেন এবং এই ক্রমে গৃহস্থ অনেক প্রকার ভুলত্রুটিও করে ফেলেন। এই সমস্ত ভুলত্রুটি নিবারণের জন্যই পাঁচপ্রকার যজ্ঞের চর্চা করা হয়, যা পঞ্চমহাযজ্ঞ নামে খ্যাত-

'পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।

কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।।'[৭]

অর্থাৎ চুল্লী বা পাক করার স্থান বা উনুন, পেষণী বা জাঁতা বা শিলনোড়া, উপস্কর বা সম্মার্জনী (মেধাতিথির মতে, গৃহের উপযোগী হাঁড়ি-কড়া প্রভৃতি), কণ্ডনী বা উদূখল-মূষল-ঢেঁকি-হামানদিস্তা প্রভৃতি এবং জলকুম্ভ বা কলসী-এই পাঁচটি ধর্মশাস্ত্রের পরিভাষায় সূনা বা পশুবধস্থান। এগুলি নিয়ে কাজ করতে গেলে অজ্ঞাতসারে যে প্রাণিহিংসা ঘটে, তার জন্য গৃহস্থ পাপযুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে গৃহীর জীবনযাত্রায় উনুন, শিলনোড়া, সন্মার্জনী প্রভৃতি জিনিসগুলি অপরিহর্তব্য। কিন্তু এগুলি ব্যবহারের সময় কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির প্রাণনাশ ঘটতে পারে। এজন্য এই দ্রব্যগুলিকে প্রাণিবধস্থান বলা হয়েছে। তাই এগুলি ব্যবহারের ফলে গৃহস্থের যে পাপ উদ্ভূত হয় তার জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই যজ্ঞগুলি প্রতিদিন অনুষ্ঠেয়, তাই পঞ্চমহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম -

'তাসং ক্রমেণ সর্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।

পঞ্চ ক্লপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্।।'[৮]

অর্থাৎ সূনাস্থানীয় চুল্লী প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য মহর্ষিরা গৃহস্থদের যথাক্রমে পাঁচটি পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন-

'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।'[৯]

বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্ন-উদকাদির দ্বারা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পনের নাম পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিতে ঘি, চরু প্রভৃতি আহুতিরূপ হোমের নাম দেবযজ্ঞ (পশুপাখীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত) বলিকর্মের (খাদ্যদ্রব্য উপহারের) নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ। আলোচ্য নৃযজ্ঞ অতিথিযজ্ঞ নামেও পরিচিত। এই যজ্ঞে অতিথিদের প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। অতিথিদের প্রতি গৃহস্থের হৃদয়ে সেবার ভাব উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞের আয়োজন। এই যজ্ঞের গুরুত্ব প্রতিপাদনে ব্যক্ত হয়েছে –

‘দেবাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।

ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি।।’[১০]

অর্থাৎ দেবতা, অতিথি, অবশ্যভরণীয় বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, পিতৃলোক এবং স্বয়ং– এই পাঁচজনের পোষণার্থে যে ব্যক্তি অন্নদান করে না, সে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করলেও বাস্তবিকপক্ষে জীবিত নয়। এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দের ব্যাপক অর্থ কর্তব্য আর পাপক্ষালন তার আনুষঙ্গিক ফল। ঋষিগণ, পিতৃকুল, দেবতাগণ, প্রাণিসমূহ এবং অতিথিবৃন্দ, অভ্যাগত কুটুম্ব সপত্নীক গৃহীদের থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন-

‘ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।

আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা।।’[১১]

অতএব ধর্মজ্ঞ গৃহীর অবশ্য কর্তব্য হল তাঁদের প্রতি নির্ধারিত কর্তব্যপালন করা। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থব্যক্তির ‘প্রতিপাল্য প্রাত্যহিক নিত্য কর্তব্য।’ কোন কোন স্মার্তপুরুষের মতে পাঁচটি মহাযজ্ঞ যথাক্রমে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত এবং প্রাশিত নামে অভিহিত–

'অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।

ব্রাহ্ম্যং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষ্যতে।।'[১২]

'জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো ভৌতিক বলিঃ।

ব্রাহ্ম্যং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণম্।।'[১৩]

বেদাধ্যয়নরূপ জপ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞকে অহুত বলা হয় কারণ, বেদাধ্যয়ন ক্রিয়াটি জপার্থক অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠই তার প্রয়োজন; জপ এর অর্থ স্মরণাত্মক মানসিক ক্রিয়া বা মনে মনে আবৃত্তি করা, অগ্নিতে যে হোম করা হয় তার নাম হুত, ভূতবলি অর্থাৎ প্রাণীদের উদ্দেশ্যে খাদ্য দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়ার নাম প্রহুত, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-অতিথির অর্চনাকে অর্থাৎ বিশেষ আতিথ্যকর্মকে ব্রাহ্ম্যহুত বলা হয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন অর্থাৎ অন্ন বা আহার্য বা পানীয় প্রদান পিতৃযজ্ঞাখ্য প্রাশিত নামে অভিহিত।

গৃহস্থাশ্রমী পরম্পরাক্রমে অন্যান্য আশ্রমবাসীদের প্রাণকেন্দ্র। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যয়নের বিধি আছে, বানপ্রস্থাশ্রমেও বেদব্যাখ্যানরূপ অধ্যাপনার বিষয় উদ্ধৃত আছে, কিন্তু একই সাথে জ্ঞান ও অন্ন বিতরণের মাধ্যমে সেবামূলক কর্মের যোগ্যতা গৃহী ব্যতীত আর কারোরই নেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে যে অন্নের উপর নির্ভর করে, তা যোগায় গৃহস্থ। ভিক্ষুও তার জীবিকার জন্য গৃহস্থের মুখাপেক্ষী। এই কারণেই গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠ আশ্রমী বলা হয়েছে-

'যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।

গৃহস্থৈরেব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।।'[১৪]

প্রাচীন ঋষিরা যে অসীম জ্ঞানের ভান্ডার বেদাদিগ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছেন ও শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন- গৃহস্থের কর্তব্য কেবলমাত্র তার আচরণপূর্বক সেই জ্ঞানের দীপ্তি প্রতিদিন নিয়মপূর্বক বিস্তার ঘটানো। তাই গৃহস্থকে আদেশ দেওয়া হয়েছে–

'স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্মণি।

দৈবকর্মণি যুক্তো হি বিভর্তীদং চরাচরম্।।'[১৫]

'মনুষ্যযজ্ঞ' বা 'নৃযজ্ঞ' নামক কর্তব্য পালনের বিধিতে অতিথিসেবার বিধান দেওয়া হয়েছে। অতিথির সংজ্ঞা ও অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বিষয়ে মনুর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অতিথির মূল অর্থ হল– যার কোনও নির্দিষ্ট তিথি নেই, একরাত্রির বেশি স্থায়িত্বও নেই-

'একরাত্রং তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মিণঃ স্মৃতঃ।

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।'[১৬]

অতিথি শব্দটির প্রকৃত অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ নয় তাই অতিথির লক্ষণ করা হয়েছে– যিনি অপরের গৃহে একরাত্রিকাল বসবাস করেন তিনিই হলেন অতিথি। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতীয়রা অতিথি পদবাচ্য নন। অন্যের গৃহে আগত ব্রাহ্মণের অনিত্য স্থিতি বলে অর্থাৎ তিনি একটিমাত্র তিথি ব্যাপী স্থায়িত্ব নিয়ে অবস্থান করেন অর্থাৎ এক দিনরাত্রি, ভিন্ন তিথিতে তিনি অবস্থান করেন না বলে তাঁর নাম অতিথি। মনুস্মৃতির প্রথিতযশা ভাষ্যকার কুল্লুকভট্টের ভাষ্যে পাওয়া যায়– 'একরাত্রমেব পরগৃহে নিবসন্ ব্রাহ্মণোঽতিথির্ভবতি অনিত্যাবস্থানাৎ ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথিঃ' মেধাতিথির জবানিতে পাওয়া যায় অতিথি একরাত্রিকাল সময় পার করে দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনেও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করতে পারেন। এমতাবস্থায় অবশ্য অতিথির

আচরণের সাথে শব্দটির মূল অর্থের সঙ্গতি থাকে না। একরাত্রিকাল অবস্থানের পরেও যদি অতিথি অবস্থান করেন সেক্ষেত্রে অতিথির পরিচর্যাদি করা বা না করা গৃহস্থের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন। কিন্তু যদি গৃহস্থ নিজের বিশেষ অভ্যুদয় প্রার্থী হন তাহলে তিনি পরবর্তী দিনগুলিতে অবস্থানকারী অতিথির আপ্যায়ন-পরিচর্যাদি কর্মে ব্যাপৃত থাকবেন। তবে এটি নৈময়িক নয় অর্থাৎ অতিথিসৎকার সেক্ষেত্রে করতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অতএব বিশেষ ফলাকাঙ্খী ব্যক্তির পক্ষে একরাত্রি স্থিতিকালের পরেও অবস্থানকারী অতিথির দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রভৃতি দিনে অতিথি সেবা কর্তব্য। অতিথি শব্দটির এই অর্থকেই ব্যঞ্জিত করার জন্য ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হয়েছে- 'অনিত্যং হি স্থিতিঃ' এই আপ্যায়নাদির বিধি হিসেবে মনু নির্দেশ করেছেন- গৃহে স্বয়ং সমাগত অতিথিকে গৃহস্থ বসবার জন্য আসন, হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জল এবং সামর্থ্যানুসারে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদিযুক্ত অন্ন বিধিসম্মতভাবে দান করবেন-

'সংপ্রাপ্তায় ত্বথিতয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।

অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্।।'[১৭]

যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন শিলোঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষেতের ত্যক্ত পতিত শস্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করেন এককথায় যে ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র ও দীনভাবে কালাতিপাত করেন বা যিনি নিত্য পঞ্চাগ্নিতে হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁর বাড়িতে আগত ব্রাহ্মণ অতিথি যদি অনার্চিত হয়ে বাস করেন তবে সেই অতিথি গৃহস্থের অর্জিত সকল পুণ্য হরণ করেন অর্থাৎ গৃহীর গৃহে সমাগত সকল ব্রাহ্মণ অতিথি যথাযুক্ত সমাদৃত না হলে তিনি গৃহস্থের সকল পুণ্য হরণ করে চলে যান ও গৃহস্থের সংযত জীবনের পুণ্য ও পঞ্চাগ্নি হোমের পুণ্য সমস্ত বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুধর্মসূত্রে এই কথাই অনুরণিত হয়-

‘অতিথির্যস্য ভগ্নাংশোগৃহাত্ প্রতি নিবর্ততে।

স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।।’

একমাত্র ব্রাহ্মণই অতিথি পদবাচ্য হবেন, এমন নির্দেশ থাকলেও মনুর বিস্তৃত আলোচনাবসরে বিষয়টি সম্যকরূপে অনুধাবন করা যায়-

‘ন ব্রাহ্মণস্য ত্বতিথির্গৃহে রাজন্য উচ্যতে।

বৈশ্যশূদ্রৌ সখা চৈব জ্ঞাতয়ো গুরুরেব চ।।’[১৮]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীর মানুষকে অতিথি বলা যায় না, কারণ ব্রাহ্মণের তুলনায় এঁরা নিকৃষ্ট জাতি আর সখা বা বন্ধু এবং জ্ঞাতিরা আত্মীয় বলে এঁরা অতিথি হতে পারেন না। কারণ এঁরা দুজন গৃহস্থের নিজেরই সমপর্যায়বাচী তাই তাঁরা অতিথি নন এবং গুরু প্রভু হওয়ার কারণে যেহেতু তাঁকে প্রভুর ন্যায় সেবা দিতে হয় তাই তিনিও অতিথি পদবাচ্য নন। মূলকথা এই যে, ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অতিথি হতে পারেন, বৈশ্য ও শূদ্র নয়; আবার বৈশ্যের গৃহে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অতিথি রূপে প্রতিভাত হতে পারেন শূদ্র নয়।

আবার ব্রাহ্মণ হলেই যে তাঁর অতিথি হওয়ার যোগ্যতা থাকবে তা নয়। মনুস্মৃতি অনুসারে–

‘নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।

উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা।।’[১৯]

অর্থাৎ যিনি গৃহস্থের একই গ্রামে বসবাস করেন, তিনি সন্ধ্যার সময় বৈশ্বদেবকালে উপস্থিত হলেও অতিথি নন। মেধাতিথির মতে ‘একস্মিন্ গ্রামে যো বসতি বৈশ্বদেবকালোপস্থিতোঽপি নাতিথিঃ।’ ‘সাঙ্গতিক’ শব্দের অর্থ সহাধ্যায়ী অর্থাৎ যিনি সখা বা বন্ধুর থেকে ভিন্ন বা যে ব্যক্তি নানারকমের চটুল পরিহাসাদির দ্বারা সকলের সাথে মিলিত হন তিনি হলেন সাঙ্গতিক। মেধাতিথি ব্যাখ্যা করেছেন– ‘সাঙ্গতিকঃ সহাধ্যায়ী সখ্যুরন্যঃ। যোঽপি সর্বেণ সংগচ্ছতে বিচিত্রপরিহাসকথাভিঃ স সাঙ্গতিকশব্দেন যুক্তঃ।’

অতিথি নন কারা এ বিষয়ে স্মার্তকারদের মত হল–

১. ‘সাঙ্গতিকং বিচিত্রবিদ্যোতিহাসকথাভিঃ সংগত্যা প্রত্যর্থিনম্’ – রাঘবানন্দ

২. ‘অতিথিলক্ষণযুক্তমপ্যেকগ্রামবাসিনং তথা সাঙ্গতিকং সঙ্গতেন চরন্তং ক্বচিদতিথিত্বেন সঙ্গতপূর্বমিতি যাবৎ তৎ নাতিথিং বিদ্যাৎ’ – নন্দন

৩. ‘বিপ্রং গৃহে উপস্থিতং বৈশ্বদেবসময়ে প্রাপ্তমতিথিং ন বিদ্যাৎ তথা সাঙ্গতিকং সহাধ্যায়ী চ চিত্রকথাভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে তমতিথিং ন বিদ্যাৎ’ – রামচন্দ্র

৪. ‘সমানগ্রামনিবাসিনং যং চ সংগত্যা লোকযাত্রয়া চরিতং বিচিত্রপরিহাসকথাজীবনং যস্য স ভার্যাগ্নয়ঃ তস্মিন্নেব গ্রামে সংপ্রাপ্তঃ তং বৈশ্বদেবকালেঽপি সম্প্রাপ্তমতিথিং ন বিদ্যাৎ’– গোবিন্দরাজ

৫. ‘তথা যত্র যস্য প্রবাসিনোঽপি ভার্যা অগ্নয়ো বা সহ গচ্ছন্তি তদন্যতমং স্বে গৃহে উপস্থিতমাগতমপি অতিথিং ন বিদ্যাৎ। নাতিথিধর্মেণার্চয়েৎ’– সর্বজ্ঞনারায়ণ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে অথবা পঞ্চাগ্নির সাথে প্রবাসযাত্রা করেন তাঁকে অতিথি বলে গণ্য করা হবে না।

গৃহে উপস্থিত বন্ধু, জ্ঞাতি বা গুরু অতিথি পদবাচ্য হতেন না। যেসব গৃহস্থ পরের অন্ন ভোজনের দোষ না জেনে কেবলমাত্র আতিথ্যের লোভে পরের বাড়ির অন্নভোজন করে বেড়ায় তারা অতিথি নয়, পাপী বলে পরিগণিত হয়–

'উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাম্।।'[২০]

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ মনে করে আমি অতিথিরূপে গিয়ে উপস্থিত হলে অবশ্যই খেতে পাবো এবং এইরকম চিন্তা করে যেকোন স্থানে গিয়ে হাজির হয় সেই রকম ব্রাহ্মণের নিন্দা মনু করেছেন। অন্য ব্যক্তি যে অন্ন পাক করেছে সেই অন্ন বারংবার ভোজন করা যার স্বভাব সে যদি কখনও কদাচিৎ অর্থাৎ দু-একবার এরকম করে তাহলে তা দোষগ্রাহ্য হয় না। বারবার অন্নাদি ভোজনকারী ব্যক্তি 'তেন' অর্থাৎ সেই কাজের জন্য 'প্রেত্য' পরজন্মে 'পশুতাং' বলদ-বৃষ প্রভৃতি জাতিতে জন্ম 'ব্রজতি' প্রাপ্ত হয়। এইরকম ব্যক্তি ঐ অন্নাদিপ্রদানকারী লোকের বাড়িতে গর্দভ, হস্তি, অশ্ব, বৃষ প্রভৃতি ভারবাহী পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার স্থালীপাক (বৈশ্বদেবাদি) কর্তব্য, তারই পক্ষে এরকম করা দোষের।

মনুর মতে, সায়ংকালে গৃহে উপস্থিত অতিথিকে গৃহস্থ কখনোই প্রত্যাখ্যান করবেন না। অতিথি সময়ে-অসময়ে যখনই আসুন না কেন অতিথিকে কোন মতেই উপবাসী রাখা যাবে না–

'অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্যাঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।।'[২১]

অর্থাৎ এখানে গৃহমেধকর্মে যারা অধিকারী তারা হলেন গৃহমেধী; অর্থাৎ গৃহস্থ। সূর্য অস্তমিত হলে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর সায়ংকালে কোনও অতিথি গৃহে উপস্থিত হলে গৃহস্থ তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন না। তাঁকে ভোজন, আসন, শয্যা প্রভৃতি দিয়ে পরিচর্যা করতে হবে অতিথি সায়ং বৈশ্বদেবকালে অর্থাৎ সায়ংকালীন ভোজন গৃহস্থের হয়নি তখন যদি উপস্থিত হন বা অকালে অর্থাৎ যখন সায়ংকালীন ভোজন হয়ে গেছে তখনও যদি উপস্থিত হন সেই অতিথি যেন গৃহমেধীর বাড়িতে অনশনে অবস্থান না করেন অর্থাৎ তাঁকে অবশ্যই ভোজন করাতে হয়।

অতিথি সৎকারের দ্বারা সদাচার সম্প্রাপ্ত হন বলে গৃহস্থ দরিদ্র বা অকিঞ্চন হলেও তাঁরপক্ষে অতিথি সেবারূপ কর্মের সরলীকৃত সমাধান দেওয়া হয়েছে –

তৃণানি ভূমিরূদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যাপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।[২২]

অর্থাৎ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে অতিথিসেবা মর্যাদা পেলেও দরিদ্র-অর্থহীন গৃহস্থের পক্ষে যদি অর্থব্যয়সাধ্য অন্নদান করা সম্ভবপর না হয় তবুও প্রকারান্তরে অতিথিসেবা করাই যায়। অতিথি বসার জন্য কুশকাশাদি তৃণের আসন, বিশ্রামের জন্য ভূমি বা স্থান, হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য বা পানের জন্য জল এবং চতুর্থতঃ হিতকারী মিষ্টিবচন– এগুলি ধার্মিক ব্যক্তিদের বাড়িতে অভাব হয় না। তৃণাসন, ভূশয্যা, পানীয় জল এগুলি প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান; এগুলি প্রদান করতে অর্থব্যয় করতে হয় না- সদ্ব্যক্তির বাড়িতে কখনও অভাবও হয় না আর মিষ্টিকথা বা হিতকর প্রবচন প্রয়োগে সজ্জনব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধতা থাকে– এই চারটি জিনিস দিয়ে আতিথেয়তা করতে পারেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই।

অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের ফলে গৃহস্থের মান, সমৃদ্ধি, যশ, আয়ু এবং পরকালে স্বর্গলাভ হয়-

'ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্।'[২৩]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে মনুর উপদেশ হলো- অতিথিকে ভোজন না করিয়ে গৃহস্থ কোন খাদ্যই নিজে গ্রহণ করবেন না। মেধাতিথির মতে- 'সূপঘৃতদধিশর্করাদি যদুৎকৃষ্টমন্নং তৎ স্বয়ং নাশ্নীয়াৎ, অতিথৌ সন্নিহিতে যাবৎ তস্মৈ ন দত্তম্। যত্তু আতুরস্য যবাগূরসকটুকাদি তদনিচ্ছতে দেয়ম্। তাদৃশমদত্তমশ্নতো ন দোষঃ। সর্বথা ন সংস্কৃতমন্নং স্বয়ং ভোক্তব্যম্। কদন্নমতিথি র্ন ভোজনীয়ঃ ইত্যেবংপরমেতৎ।' অর্থাৎ ভাল খাবার জিনিস যা থাকবে, অতিথি উপস্থিত থাকতে যতক্ষণ না তাকে খাওয়ানো হয়, ততক্ষণ গৃহস্থ তা নিজে খাবেন না। তবে যবাগূরস, কটুক প্রভৃতি যেসব দ্রব্য রোগীর পথ্য সেগুলি সেই অতিথি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ না করলে সেসব খাদ্যদ্রব্য যদি গৃহস্থ অতিথিকে না দিয়ে নিজে খান, তাহলে তা দোষব্যঞ্জক হয় না। মূলকথা এই যে, ভালোভাবে প্রস্তুত সুস্বাদু অন্ন গৃহস্থ নিজে খাবেন না, তা অতিথি সৎকারের জন্য বরাদ্দ থাকবে। কিন্তু কোনপ্রকারেই খারাপ খাদ্য অতিথিকে দেওয়া চলবে না। ঘি, দুধ, দই, ফল প্রভৃতি যেসব উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথি-অভ্যাগতকে ভোজন করানো হবে না- সেগুলি গৃহস্থও কখনই খাবেন না। এইপ্রকার অতিথিপরায়ণতার দ্বারা প্রভূত আয়ু ও সম্পত্তি লাভ সম্ভব হয়।

যেগৃহে একসাথে অনেক অতিথি সমাগম হয়, সেখানে উত্তম, মধ্যম ও অধম বিবেচনা করে সেই অতিথিদের বসবার আসন, আবসথ অর্থাৎ বিশ্রামের স্থান, খট্বাদিশয্যা, অনুব্রজ্যা অর্থাৎ চলে যাওয়ার সময় পেছনে পেছনে অতিথির সাথে কিছুদূর একসাথে যাওয়া

এবং উপাসনা অর্থাৎ অতিথির গৃহে স্থিতিকালীন পরিচর্যা বা অতিথির কাছে কথাবার্তা বলার জন্য বা বার্তালাপের জন্য অতিথি-সমীপে উপস্থিত থাকা– এগুলি উত্তম অতিথির প্রতি উত্তমভাবে (যেমন-উত্তম অতিথি চলে যাওয়ার সময় তাঁর পেছনে বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া, মধ্যম অতিথির পেছনে নাতিদূর যাওয়া এবং হীন বা অধম প্রকৃতির অতিথির পেছনে কয়েক পা মাত্র যাওয়া), অধম অতিথির প্রতি ন্যূন এবং সমান অতিথির প্রতি তুল্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে হয়–

'আসনাবসথৌ শয্যামনুব্রজ্যামুপাসনম্।
উত্তমেষূত্তমং কুর্যাদ্ধীনে হীনং সমে সমম্।।'[২৪]

ভোজনের আশায় কোনও ব্রাহ্মণ কোন গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে যদি নিজের কুল ও গোত্রের নাম উল্লেখ করতেন তবে তা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হত। কারণ ভোজনের জন্য যাঁরা নিজ কুল ও গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন, বিবুধমহল তাঁকে 'বান্তাশী' বা উদ্গীর্ণভোজী নামে অভিহিত করেন–

'ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হি তে শংসন্ বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।'[২৫]

যদি কোন ক্ষত্রিয় অতিথিধর্মানুযায়ী অর্থাৎ অতিথিরূপে (এখানে অতিথির ধর্ম হল– যে ক্ষত্রিয়ের পথ্য ও অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি ভিন্নগ্রামবাসী অথচ ঠিক ভোজনকালে ব্রাহ্মণের অতিথিরূপে বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন) ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হন, তাহলে ঐ ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণ-অতিথি (এবং অতিথি নন এমন অন্যান্য ব্রাহ্মণ)

ভোজন করার পর গৃহী-ব্রাহ্মণ অভ্যাগত ক্ষত্রিয়কে নিজের ইচ্ছামত ভোজন করানোর মাধ্যমে অতিথি সৎকার করতে পারেন–

'যদি ত্বতিথিধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাব্রজেৎ।

ভুক্তবৎসূক্তবিপ্রেষু কামং তমপি ভোজয়েৎ।।'[২৬]

বৈশ্য ও শূদ্র অতিথি ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণ গৃহস্থের পূজার্হ না হলেও অবশ্যই অনুগ্রহ বা অনুকম্পার পাত্র হতে পারেন। এঁরা শাস্ত্রবিহিত যথার্থ অতিথি পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত নন। অতএব এঁরা অতিথি-জনোচিত সমাদরের অধিকারী নন। মহর্ষি মনুর মতেও তাই ব্রাহ্মণের কুটুম্ব অর্থাৎ বাড়িতে যদি (গ্রামান্তর থেকে) বৈশ্য ও শূদ্র অতিথিধর্মানুযায়ী অর্থাৎ অভ্যাগতরূপে ভোজনকালে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে (ক্ষত্রিয় অতিথির ভোজনের অব্যবহিত পরে কিন্তু গৃহস্থ দম্পত্তির ভোজনের আগে) ব্রাহ্মণ গৃহস্থ গৃহভৃত্যদের ভোজনের সময় অনুকম্পা করে ঐ বৈশ্য ও শূদ্র অতিথির সৎকার করবেন–

'বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্মিণৌ।

ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্।।'[২৭]

সখা অর্থাৎ বন্ধুসদৃশ জ্ঞাতি, সহাধ্যায়ী প্রভৃতি অন্যান্য যেসব ক্ষত্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়িতে প্রীতিবশতঃ এসে উপস্থিত হন (অর্থাৎ যাঁরা প্রকৃতই স্নেহবশতঃ এসে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু অতিথির ধর্মানুসারে এসে উপস্থিত হননি), গৃহস্থ তাদের জন্যও সাধ্যমত ভালোভাবে অন্নাদি প্রস্তুত করে তাঁর পত্নীর সাথে বসিয়ে অর্থাৎ পত্নীর ভোজনকালে তাঁদের ভোজন করাবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, পত্নী বা ভার্যার পৃথক কোন ভোজনকাল থাকে না, স্বামীর ভোজনের জন্য যেসময় বিহিত রয়েছে তাই ই ভার্যার ভোজনের

সময়। এখানে তাৎপর্য্য এই যে, সখা প্রভৃতিকে একা বসিয়ে খাওয়ানো হবে না, গৃহস্থপত্নীও সেখানে খাদ্যগ্রহণ করবেন–

‘ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্।

প্রকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্যয়া।।’[২৮]

কিন্তু বিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অতিথিগণ, স্ব অর্থাৎ স্বকীয় জ্ঞাতিগণ এবং পরিচারকবর্গের ভোজন শেষ হওয়ার পর আহার্য অন্নের যা অবশিষ্ট থাকবে, গৃহস্থ দম্পতি সব শেষে সেই অন্নই গ্রহণ করবেন–

‘ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।

ভুঞ্জীয়াতাম্ ততঃ পশ্চাদ্বশিষ্টন্তু দম্পতী।।’[২৯]

এখানে ‘অবশিষ্টং তু দম্পতী’ এই শ্লোকাংশের অর্থ করা যায়, সকলকে দিয়ে ভোজন করানোর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই ই স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর আলাদা ভোজনের সময়কালীন আলোচনা অবান্তর। মেধাতিথির মতে, স্বামীর সখা প্রভৃতি উপস্থিত হলে স্বামী বা গৃহস্থ যদি সেসময় উপস্থিত না থাকেন, তাহলে গৃহস্বামীর সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদর্শনের জন্য গৃহস্থ পত্নী তাঁর সাথে একত্র ভোজন করবেন।

সুবাসিনী অর্থাৎ নববিবাহিতা বধূ, পূত্রবধূ, কন্যা, বালক, রোগী এবং গর্ভবতী নারী এরা যদি গৃহে থাকে তাহলে কোন বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকেই অতিথি-অভ্যাগত সেবার পূর্বেই এদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করতে হয়। স্বাস্থ্যগত বিচার করলে এদের আহার্য গ্রহণে দেরী হলে স্বাস্থ্যহানির প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তাই অতিথিভোজনের আগে এদের ভোজন করালে তাতে গৃহস্থের দোষপ্রাপ্তি ঘটে না–

'সুবাসিনঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।

অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্।।'[৩০]

ভাষ্যকার মেধাতিথি 'অগ্নে'র স্থানে 'অন্বক্' পাঠ করেছেন, এতে অর্থ দাঁড়ায়-অতিথিদের ভোজনের অব্যবহিত পরেই সুবাসিনী প্রভৃতিদের ভোজনাদির ব্যবস্থা করতে হয়।

গৃহস্থ অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ (অতিথি প্রভৃতি), পিতৃপুরুষগণ ও গৃহদেবতাদের হব্য-কব্য-অন্নাদির দ্বারা অর্চনা করে সর্বশেষে সস্ত্রীক অবশিষ্ট খাবার ভোজন করেন-

'দেবানৃন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৃ্ণ্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।

পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ।।'[৩১]

কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অতিথি থেকে আরম্ভ করে ভৃত্যপর্য্যন্ত সকলকে আহারাদি প্রদান না করে আগে নিজেই ভোজন করে মৃত্যুর পর তার শরীর কুকুর-শকুন ছিঁড়ে খাওয়ার মত পাপ সে অজ্ঞাতেই অর্জন করে ফেলে-

'অদত্ত্বা তু য এতেভ্যঃ পূর্বং ভুঙক্তেঽবিচক্ষণঃ।

স ভূঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ।।'[৩২]

মনুসংহিতায় অতিথি পূজাপ্রসঙ্গে বা গৃহে সমাগত অন্য কোন অভ্যাগত সেবা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- রাজা অর্থাৎ যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন, পুরোহিত, স্নাতক অর্থাৎ বিদ্যা ও ব্রত উভয় বিষয়েই যিনি স্নাতক হয়েছেন, কিন্তু গৃহী হননি অথবা যিনি সম্প্রতি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন, জামাতা স্থানীয় প্রিয় ব্যক্তি, শ্বশুর, মাতুল- এঁরা বৎসরান্তে গৃহে সমাগত হলে গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহ্যসূক্তে বর্ণিত মধুপর্ক নামক কর্ম দ্বারা তাঁদের আপ্যায়ন করবেন।

এই মধুপর্ক হল জল, মধু, ঘি, দই ও চিনি মিশিয়ে তৈরি দ্রব্য, এই মধুপর্কের সাথে মাংস বা পরমান্ন জাতীয় আহার্য দানের মাধ্যমে অতিথিসৎকারের রীতি ছিল–

'রাজর্ত্বিক্স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।

অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুণঃ।।'[৩৩]

মেধাতিথির মতে এইসব ব্যক্তি যদি পরিগত অর্থাৎ অতিক্রান্ত হয়েছে সম্বৎসর হওয়ার পরে আসেন তাহলে মধুপর্কাদি সম্বলিত অতিথি সমাদর পাবেন, কিন্তু তার আগে অর্থাৎ সম্বৎসর চলাকালীন সময়ে এলে মধুপর্ক প্রভৃতি দিয়ে অভ্যর্থনা পাবেন না।

পরিবারের বাইরে থাকেন এমন মামা, কাকা, শ্বশুর ও অন্য কোনও গুরুজন বাড়িতে এলে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অভিবাদন করতে হয়; মামী, মাসী, শাশুড়ী, পিসি প্রভৃতি গুরুজন মাতার মত পূজনীয়া; এঁদের গৃহাগমন ঘটলে গাত্রোত্থান পূর্বক অভিবাদন করতে হয়–

'মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।

অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ।।'[৩৪]

এবং

'মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।

সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্যয়া।।'[৩৫]

মনু প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থায় গৃহস্থ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কালাতিপাত করতে সক্ষম হতো না। গৃহস্থের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মাদিও খুব সহজ ছিল না। পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও গৃহীর কর্তব্য সম্পর্কে মনু যে নির্দেশাবলী নির্ধারিত করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই বিশ্বচরাচরকে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে পরিপালনের জন্য গৃহস্থকেও অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হত- এদের মধ্যে অতিথি পরিচর্যা ছিল অন্যতম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

পঞ্চমহাযজ্ঞ ও সমাজকল্যাণমূলক যে সমস্ত কর্মের বিধান মর্হষি মনু গৃহস্থকে প্রদান করেছেন প্রায় অনুরূপ গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বিধান অপর স্মৃতিশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্যও গৃহস্থকে নির্দেশ করেছেন। ষড়েবদাঙ্গের অন্যতম কল্পের অন্তর্গত ধর্মসূত্রগুলি কালক্রমে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিগ্রন্থে পরিণতি লাভ করেছে। স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রকে 'সংহিতা' নামে অভিহিত করা হয়। স্মৃতি গ্রন্থগুলি পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-বিধানের সঙ্কলন বলে এগুলিকে 'সংহিতা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিথিলাবাসী যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির স্থান মনুসংহিতার পরেই। মনুসংহিতার তুলনায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কলেবর। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় রয়েছে তিন অধ্যায়ে বিভক্ত প্রায় সহস্র শ্লোক; এর প্রথমাধ্যায়ের নাম আচারাধ্যায় বা আচারকাণ্ড, ব্যবহারাধ্যায় বা ব্যবহারকাণ্ড হল এর দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এর তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হল প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় বা প্রায়শ্চিত্তকাণ্ড। মনুসংহিতার প্রথম সাতটি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ আচারাধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা আদ্যোপান্ত ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাষার থেকে এই গ্রন্থের ভাষা রচনাশৈলীর দিক থেকে

জটিলতামুক্ত ও অতিবিস্তারবিস্তীর্ণ নয়। মানবের পালনীয় বা আচরিতব্য কর্তব্যরাজির সুস্পষ্টতা ও সুসংবদ্ধতার কারণে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। আচারাধ্যায়ে বর্ণিত নানাপ্রকার বিষয়ের মধ্যে গৃহস্থের কর্তব্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন, অতিথিসৎকারাদি সামাজিক বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সযত্নে বর্ণিত হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আচারকাণ্ডে অতিথি কে? অতিথি-সৎকারের প্রণালী বিধৃত রয়েছে–

‘বলিকর্ম্মস্বধাহোমস্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।

ভূতপিত্রমরব্রহ্মমনুষ্যাণাং মহামখাঃ।।’[৩৬]

বলিকর্ম্ম, তর্পণ, হোম, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও অতিথিসৎকার এগুলি যথাক্রমে ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ- এই পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য।

‘বালং সুবাসিনীবৃদ্ধগর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ।

সম্ভোজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনম্।।’[৩৭]

বালক, সুবাসিনী অর্থাৎ বিবাহিত হয়েও যে পিতৃগৃহে অবস্থান করে, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা অন্তঃস্বত্তা নারী, পীড়িত ব্যক্তি, কুমারী, অতিথি ও ভৃত্যগণকে ভোজন করিয়ে স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবেন।

‘অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্বশঃ।

অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়মপি বাগ্‌ভূতৃণোদকৈঃ।।’[৩৮]

গৃহে অতিথি উপস্থিত হলে যথাসামর্থ্যানুযায়ী বর্ণানুসারে আতিথ্য প্রদান করতে হয়। সায়ংকালেও যদি অতিথির সমাগম ঘটে তাহলে অতিথিসৎকার বাঞ্ছনীয়। গৃহে যদি কিছু না থাকে তাহলে সুবচন, ভূমিশয্যা বা তৃণাসন এবং জল দ্বারা আতিথেয়তা প্রদর্শন করতে হয়।

'সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ।

ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখিসম্বন্ধিবান্ধবান্।।'[৩৯]

ভোজনকালে আগত সখি-সম্বন্ধি-বন্ধুবান্ধবদের ভোজন করাতে হয় অতিথিজ্ঞানে।

'মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।

সৎক্রিয়াণ্বাসনং স্বাদু ভোজনং সুনৃতং বচঃ।।'[৪০]

শ্রোত্রিয় গৃহে অতিথিরূপে আগত হলে তাঁর প্রীত্যোৎপাদনের জন্য 'এ সকল আপনার' এই বলে মহোক্ষ বা বৃহৎ বৃষ বা মহাজ বা বৃহৎ ছাগ সামনে রাখতে হবে। তাঁর স্বাগত-প্রশ্ন, আসন-দানাদি ইত্যাদি সমাধা করে সৎকার করতে হবে। তিনি উপবেশন করলে তবেই গৃহস্বামী আপন আসন গ্রহণ করবেন। আগত অতিথিকে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়ে, তাঁর আগমনে গৃহস্বামী ধন্য হয়েছেন ইত্যাদি মধুর বাক্য প্রয়োগ করে যথাযথ আতিথেয়তা প্রদর্শন করবেন।

'অধ্বনীনোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।

মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ।।'[৪১]

পথিক ব্যক্তিকে অতিথিজ্ঞানে মান্যতা দিতে হবে এবং বেদপারগকে শ্রোত্রিয় বলে জানতে হবে। এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক-গমনেচ্ছু গার্হস্থ্য ধর্ম পালনকারীর অবশ্য

মান্য। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ববেদাধ্যায়ী এবং বেদপারগ অর্থাৎ এক শাখাধ্যায়ী–এই দুইপ্রকার অতিথির সৎকার ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু আত্যন্তিক মুক্তিকামী গৃহীর অবশ্য মাননীয় বলে 'মিতাক্ষরা' টীকাতে পাওয়া যায়।

'অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমাসীমান্তমনুব্রজেৎ।

অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ।।'[৪২]

শ্রোত্রিয়-অতিথিকে উত্তম আহার্য-ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করা উচিত। ইতিহাসপুরাণবেত্তা, কাব্যকথায় সুচতুর, সন্তোষজনক আলাপে সুনিপুণ বন্ধুদিগের সাথে অবশিষ্ট দিবাভাগ অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি আতিথেয়তা সমাধা করতে হয়।

'প্রতিসংবৎসরন্ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্যপাথির্বাঃ।

প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুণঃ।।'[৪৩]

ত্রিবিধ স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র, জামাই, মাতুল, শ্বশুর স্থানীয় ব্যক্তি যদি গৃহে অভ্যাগত রূপে অবতীর্ণ হন তাহলে বছরে একবার মধুপর্ক দ্বারা আতিথ্য প্রদর্শন করতে হয়।

'মাতৃপিত্রাতিথিভ্রাতৃজামিসম্বন্ধিমাতুলৈঃ।

বৃদ্ধবালাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ।।'[৪৪]

পিতা-মাতা, অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাই, সধবা স্ত্রী, সম্বন্ধী অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্যালক-শ্বশুর প্রভৃতি, মামা, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, পিতা-মাতা উভয়কুলের বন্ধু-বান্ধব ঋত্বিক, পুরোহিত, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, দাসদাসী, সনাভি অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী বা

জ্ঞাতিবর্গের সাথে গৃহস্থ ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ পূর্বক সংসারযাত্রা নির্বাহ করলে সেই গৃহী প্রাজাপত্যাদি সমস্ত শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন।

আলোচ্য শ্লোকসমূহে অতিথির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যাজ্ঞবল্ক্য যথাযথরূপে প্রদর্শন করেছেন। 'তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী'– এই মনুবচনের প্রতিধ্বনি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে প্রকৃতই পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মশাস্ত্রসমূহ সমকালীন সমাজব্যবস্থার দর্পণ। সামাজিক স্থিতি বজায় রাখার জন্যই ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিয়ম। মনুষ্য জীবন এক চলমান প্রবাহ। নদীখাতের পরিবর্তনের ন্যায় মনুষ্যজীবনও পরিবর্তনের পথ ধরেই প্রবাহিত হয়। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ধর্মশাস্ত্র যুগে যুগে রচিত হয়েছিল। সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়নি এপর্যন্ত একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মানবজীবনের পরমার্থ প্রাপ্তির পথকে সুপ্রশস্ত করার জন্য যে আচরিতব্য পথ প্রদর্শন করা হয়েছে তার মধ্যে অতিথি-পূজন, আতিথেয়তা সমধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচিত। মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাকে প্রামাণ্য হিসেবে পরিগণিত করলেও অন্যান্য প্রধান-অপ্রধান ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনকি অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গটিতে প্রামাণ্য দুটি স্মৃতিগ্রন্থকে হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে; মৌলিকতার খুব একটা প্রকাশ দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও আলোচ্য এই প্রসঙ্গটি বারংবার প্রায় অনেক ধর্মশাস্ত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রথিতযশা ধর্মশাস্ত্রকাররূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কুড়িজন সংহিতাকারের নাম উল্লেখ করেছেন। লিঙ্গপুরাণে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। পদ্মপুরাণ ১৮ টি স্মৃতিগ্রন্থকে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন ভাগে ভাগ করেছে–

'বাশিষ্ঠং চৈব হারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।

ভারদ্বাজং কাশ্যপং চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ।।

যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরীয়ং দাক্ষমেব চ।

কাত্যায়নং বৈষ্ণবং চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।।

গৌতমং বার্হস্পত্যং চ সাংবর্তং চ যমং স্মৃতম্।

শাস্ত্রং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ।।'[৪৫]

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকার হলেন– মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ। পৈঠনসীস্মৃতিতে ৩৬ জন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়, মনুস্মৃতিতে, অপরার্ক ও বালভট্টের টীকা প্রভৃতিতে উল্লিখিত ধর্মাচার্যগণের সংখ্যা পরিসংখ্যা হিসেবে রচিত হয়নি। উল্লিখিত স্মৃতিকারদের অতিরিক্ত আরও অনেক স্মৃতিকার রয়েছেন, যাঁরা অন্যত্র উল্লিখিত বা একেবারেই অনুল্লিখিত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় আচার্য বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্ট করেই বলেছেন– 'নেয়ং পরিসংখ্যা কিন্তু প্রদর্শনার্থমেতৎ।' তাই কয়েকটি বিশেষ ধর্মশাস্ত্রে আতিথেয়তার প্রসঙ্গটি গবেষণার পরিসরে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

বিষ্ণুসংহিতা

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পর বিষ্ণুসংহিতা বা বিষ্ণুধর্মসূত্র মর্যাদাপূর্ণ স্মৃতিশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। বৈজয়ন্তী টীকা অনুযায়ী বিষ্ণুসংহিতা কঠ নামক যজুর্বেদীয়

শাখার সাথে সম্বন্ধিত। বিষ্ণুধর্মসূত্র ১০০ টি অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম দুটি অধ্যায় পদ্যে রচিত, অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত। বিষ্ণুধর্মসূত্রে বিবিধ দৈববিষয় বর্ণিত হলেও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা-গৃহস্থের কর্তব্য প্রভৃতি বিশদে আলোচিত হয়েছে। অতিথি প্রসঙ্গে মহর্ষি বিষ্ণুর অভিমত হল–

'নৃযজ্ঞশ্চাতিথিপূজনম্।

দেবাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনস্তথা।

ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি।।

ব্রহ্মচারী যতির্ভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ।

তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ।।

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।

দদাতি চ গৃহস্থস্ত তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী।।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যাতিথয়স্তথা।

আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী।।'[৪৬]

অর্থাৎ অতিথিসৎকার মনুষ্যযজ্ঞ। যে ব্যক্তি দেবতা (ভূতবর্গ), অতিথি, পোষ্য (অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি), পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্বপন (অন্নদান) না করে, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী, যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থী) এঁরা গৃহস্থাশ্রম থেকেই জীবিকানির্বাহ করেন; অতএব এঁরা গৃহে অভ্যাগত রূপে উপস্থিত হলে গৃহস্থ এঁদের কখনই অবমাননা করবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তিই যাগ করে, গৃহস্থই সেবা করে, গৃহস্থই তপস্যা করে,

গৃহস্থই দান করে অতএব গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ; জীবনের এই পর্যায়ে অভ্যাগতাদি সেবার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদিত হয়।

'অতিথিপূজনে চ পরং ফলমধিতিষ্ঠেৎ।

সায়মতিথিং প্রাপ্তং প্রযত্নেনার্চ্চয়েৎ।

অনাশিতমতিথিং গৃহে ন বাসয়েৎ।

যথা বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুর্যথা স্ত্রীণাং ভর্ত্তা তথা গৃহস্থস্যাতিথিঃ।

তৎপূজায়াং স্বর্গমাপ্নোতি।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।

তস্মাৎ সুকৃতমাদায় দুষ্কৃতন্তু প্রযচ্ছতি।।

একরাত্রং হি নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

অনিত্যা হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।

নৈকাগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।

উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা।

যদি ত্বতিথিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাগতঃ।

ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপি ভোজয়েৎ।

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ।

ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্।

ইতরাণ্যপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্।

প্রকৃতান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া।

সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিনীং গুর্ব্বিণীং তথা।

অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্।।’[৪৭]

‘স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসা তথা।

ন চাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা ত্বতিথিপূজনাৎ।

সায়ং প্রাতস্ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।

অন্নঞ্চৈব যথাশক্ত্যা সংকৃত্য বিধিপূর্বকম্।

প্রতিশ্রিয়ং তথা শয্যাং পাদাভ্যঙ্গং সদীপকম্।

প্রত্যেকদানেনাপ্নোতি গোপ্রদানসমং ফলম্।।’[৪৮]

অর্থাৎ অতিথিসৎকারে পরম ফল আছে। বৈশ্বদেবের পরেও যদি অতিথি আসেন যত্নপূর্বক তাঁর অর্চনা করতে হয়। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখা উচিত নয়। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকের প্রভু স্বামী, তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ অতিথির পূজা করলে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। অতিথি যাঁর বাড়ি থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যান সেই অতিথি গৃহস্থের ধর্ম গ্রহণ অর্থাৎ পুণ্য সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে নিজের পাপ গৃহস্থকে অর্পণ করেন। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ

অতিথি বলে পরিগণিত হন। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেজন্যই তিনি অতিথি। একগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্গতিক (নানাপ্রকার আলাপচারিতার দ্বারা মিলেমিশে জীবিকা নির্বাহ করে যে তাকে সাঙ্গতিক বলে) অতিথি নয়। যেখানে স্ত্রী এবং আহিত অগ্নি থাকে সেখানে কেউ উপস্থিত হলেও তিনি অতিথি বলে পরিগণিত হবেন না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি ধর্মানুসারে বাড়িতে এসে উপস্থিত হন, তাহলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর সেই ক্ষত্রিয়কে ইচ্ছামত ভোজন করানো যায়। যদি বাড়িতে বৈশ্য-শূদ্র ব্যক্তিও অতিথি ধর্মাবলম্বী হয়ে উপস্থিত হন তাহলে দয়াপরবশতঃ ভৃত্যদের সাথে তাদের ভোজন করানো যেতে পারে। সখা প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি ও প্রীতিপূর্বক গৃহে উপস্থিত হলে ভার্যার সাথে বর্তমান থেকে তাদের গৃহে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করানো যায়।

নববিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী–এদেরকে নিঃসঙ্কোচে অতিথির আগেই ভোজন করাতে হয়। যে মূর্খ ব্যক্তি এদেরকে অন্নদান না করেই আগে নিজে ভোজন করে সেই ব্যক্তি কুকুর ও শকুন দ্বারা তার নিজদেহ ভক্ষন করালেও ভোজন করবার সময় তা বুঝতে পারে না। ব্রাহ্মণ-ভৃত্যবর্গ-আত্মীয়স্বজন ভোজন করার পর স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহস্থিত দেতাদের পূজার পর গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক ক'রে ভোজন করে অর্থাৎ দেবতাদের দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে, অন্ন নয়। গৃহস্থ অতিথি সৎকারের ফলে যেসকল লোকপ্রাপ্ত হয়- স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রার্থিত লোকপ্রাপ্ত হয় না। অতিথিকে দিনে-রাতে সমাদরপূর্বক যথাবিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদপ্রক্ষালন-জল এবং অন্ন প্রদান করতে হবে। প্রতিশ্রয়, শয্যা, পাদাভ্যঙ্গ অর্থাৎ পায়ে তৈল

প্রদান এবং দীপ-অতিথিকে এগুলির মধ্য থেকে যে কোন একটি প্রদান করলে গোদানের তুল্য ফল হয়।

অতিথিপূজক ব্যক্তি লক্ষ্মীর সান্নিধ্যলাভ করেন এই তথ্যও বিষ্ণুসংহিতাতে পাওয়া যায়-

'আচারসেবিন্যথ শাস্ত্রনিত্যে বিনীতবেষে চ তথা সুবেষে।

সুশুদ্ধদান্তে মলবর্জিতে চ মৃষ্টাশনে চাতিথিপূজকে চ।।'[৪৯]

হারীতসংহিতা

মহর্ষি হারীত একজন সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার। হারীতধর্মসূত্রের ভাষা ও বিষয়সূচী দেখে অনুমেয় যে হারীতসংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্ট ও মানবধর্মসূত্রের সাথে হারীতসংহিতার সাদৃশ্যের নিবিড়তা থেকে স্থির করা যায় হারীত কৃষ্ণযজুর্বেদের সাথে সম্বদ্ধ ছিলেন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, বসিষ্ঠ প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রকারেরা হারীতের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আপস্তম্ব মহর্ষি হারীতকে এত বেশী উদ্ধৃত করেছেন যে মনে করা হয় এঁরা উভয়েই একই বেদশাখার অন্তর্গত ছিলেন। হারীতসংহিতার দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়-লঘু হারীত ও বৃদ্ধ হারীতসংহিতা। প্রথমটির সাতটি অধ্যায়ে মোট ২৫০টি শ্লোক রয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে আটটি অধ্যায়ে ২৬০০ শ্লোক। হারীতসংহিতা একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থ, এতে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলির মত বিবিধ বিষয় আলোচিত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে হারীতের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অতিথি বিষয়ক আলোচনায় হারীতের সুচিন্তিত মত পাওয়া যায়-

'বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্যাদ্বলিকর্ম বিধানতঃ।

গোদোহনাত্রমাকাঙ্খে দতিথিং প্রতি বৈ গৃহী।।

অদৃষ্টপূর্ব্বযজ্ঞাতমতিথিং প্রাপ্তমর্চ্চয়েৎ।

স্বাগতাসনদানেন প্রত্যুত্থানেন চাম্বুনা।।

স্বাগতেনাগ্নয়স্তুষ্টা ভবন্তি গৃহমেধিনঃ।

আসনেন তু দত্তেন প্রীতৌ ভবতি দেবরাট্।।

পাদশৌচেন পিতর প্রীতিমায়ান্তি দুর্লভান্।

অন্নদানেন যুক্তেন তৃপ্যতে হি প্রজাপতিঃ।।

তস্মাদথিতয়ে কার্য্যং পূজনং গৃহমেধিনা।

ভক্ত্যা চ শক্তিতো নিত্যং বিষ্ণোরর্চাদনন্তরম্।।'[৫০]

অর্থাৎ যে কালের মধ্যে গো-দোহন হতে পারে, সেই কাল পর্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করতে হবে। যাঁকে কখনও দেখা যায়নি এবং যাঁর পরিচয় অজ্ঞাত সেইরকম অতিথি গৃহে সমাগত হলে গৃহী তাঁকে স্বাগত আসন প্রদানপূর্বক অভ্যর্চনা করবেন। অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করলে গৃহমেধীর অগ্নিসকল তুষ্ট হন, আসন প্রদান করলে দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃপুরুষগণ দুর্লভ প্রীতি লাভ করেন। যথাযোগ্য অন্ন প্রদান করলে প্রজাপতি তৃপ্ত হন। সেই কারণে বিষ্ণুপূজার পর গৃহস্থ ভক্তি ও আপন সামর্থ্যানুযায়ী অতিথির পূজা করবেন। অতএব গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রযত্নের সাথে গৃহস্থের পালনীয় অবশ্য কর্তব্য কর্মাদির মধ্যে অতিথিসৎকাররূপ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ধর্ম্মাচরণ করলে গৃহী ব্যক্তির ভগবান হরির সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হবেন-হারীত এই সত্য প্রতিপাদন করেছেন।

উশনঃসংহিতা

মহর্ষি উশনা পৌরাণিক ঋষি ভৃগুর পুত্র। উশনার পুত্র ঔশন উশনঃসংহিতা বা ঔশনস্ সংহিতার প্রবক্তা। পিতৃপ্রণীত শাস্ত্র পুত্র ঔশন্ শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের অনুরোধে বর্ণনা করেন। মানবজীবনের আচরণীয় বহুবিধ নিয়মনীতির বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই ধর্মশাস্ত্র। আত্যন্তিক মুক্তি লাভের নানা পথের মধ্যে গুরুজন সম্পর্কে অচল শ্রদ্ধাভক্তির বর্ণনায় গুরুসেবার নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির পাপক্ষয় হয় ও সে অমৃতত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই গুরু কে? সেই প্রসঙ্গে পিতামাতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মাধ্যমে অতিথি-অভ্যাগতের গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন মহর্ষি–

‘গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং সর্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ।।’[৫১]

অর্থাৎ অগ্নি হলেন দ্বিজাতিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ-সকল জাতির গুরু বা চতুর্বণের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরু, স্ত্রীলোকের পতি বা স্বামী হলেন গুরু এবং অভ্যাগত বা অতিথি হলেন সকলের গুরু।

উশনঃ সংহিতাটি আদ্যোপান্ত শ্লোকাকারে রচিত। বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণে ৯ টি অধ্যায়ে মোট ৫২০টি শ্লোক রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মচারী হওয়ার বিধি ও তার কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে যথাযথ ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষেত্রে গুরু প্রসঙ্গটি উত্থাপিত এবং সেখানে অতিথির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্ণ-ধর্ম-আশ্রম নির্বিশেষে অতিথি বা অভ্যাগত ব্যক্তি সকলের কাছে পূজনীয়-এই বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রথম ধাপ–এই পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সান্নিধ্য এবং তার যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপনের শিক্ষা ব্রহ্মচারীকে দেওয়া হয়। তাই

উশনঃসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর জ্ঞাতার্থে অতিথির গুরুত্ব সম্যকরূপেই সম্পাদিত হয়েছে।

পরাশরসংহিতা

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম মহর্ষি পরাশর। পৌরাণিক তথ্যানুসারে মহর্ষি পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র ও শক্তির পুত্র। গুরুত্বের বিচারে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরেই পরাশরের স্থান। পরাশরের মতে কৃতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে সমস্ত ধর্মের উদ্ভব হলেও কলিযুগে মানুষের সদাচারের অভাবে সকল ধর্মই বিনষ্ট–‘সর্বে ধর্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।’ পরাশরসংহিতাই কলিযুগে মানবের দিগ্দর্শক। পরাশরসংহিতার প্রাপ্ত সংস্করণের বারোটি অধ্যায়ের আলোচনায় সংহিতাকার প্রসঙ্গক্রমে চতুর্বর্ণের কর্তব্য ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন- সত্য, ছটি কর্ম (যথা সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবার্চনা), অতিথিপূজন প্রতিটি মানুষের নিত্যকর্তব্য। আতিথ্যকে মহর্ষি প্রাধান্য দিয়েছেন সংহিতাতে, বর্ণনা করেছেন–

‘প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।

বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ।।

দূরাধ্বনং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্।

অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ।।

ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।

হৃদয়ং কল্পয়েৎ তস্মিন্ সর্বদেবময়ো হি সঃ।।

নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।

অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।

অপূর্ব সুব্রতী বিপ্রো অপূর্বো বাতিথিস্তথা।

বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ত্রয়োঽপূর্বা দিনে দিনে।।’[৫২]

অর্থাৎ প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হোক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হোক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসবেন অর্থাৎ গৃহে সমাগত হবেন তিনিই অতিথি এবং সেই অতিথিসেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়, দূরদেশ থেকে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হলে তাঁকে অতিথিরূপে পরিগণিত করতে হবে। যিনি পূর্বে আসেন কেবলমাত্র তিনিই অতিথি নন, অতিথির গোত্র, চরণ-স্বাধ্যায়, ব্রত ইত্যাদি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করেই তাঁর উপস্থিতিকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং হৃদয়বত্তার সাথে তাঁর যত্ন আত্তি করতে হবে, কারণ অতিথি হলেন সর্বদেবতাময়। আত্মীয়-কুটুম্বের সাথে বা কার্যসাধনের জন্য আগত ব্যক্তি এবং একই গ্রামের অধিবাসী বিপ্র অতিথি বলে বিবেচিত হবেন না। যে ব্যক্তি নিত্য আসেন না, তিনিই অতিথি পদবাচ্য। যিনি আগে কখনও আতিথ্য গ্রহণ করেননি, এমন অতিথি ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদচর্চায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ এই তিনব্যক্তি ‘অপূর্ব অতিথি’ শব্দ দ্বারা নিরূপিত।

অতিথিসৎকারের ফললাভ সম্পর্কে মহর্ষি পরাশর ব্যাখ্যা করেছেন–

‘পাপো বা যদি চণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।

বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ।।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাত্ প্রতিনিবর্ততে।

পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ।।

ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হ্যতিথিং বেদপারগম্।

আদদন্নমাত্রন্তু ভুক্ত্বা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্।।’[৫৩]

অর্থাৎ বৈশ্বদেব-সময়ে যিনি অতিথিরূপে প্রতিভাত হন তিনি যদি পাপী, চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হলেও তাঁর সৎকারপূর্বক গৃহস্থ স্বর্গলাভের পুণ্যার্জন করেন। আবার গৃহস্থের বাড়ি থেকে অতিথি যদি নিরাশ হয়ে গৃহত্যাগ করেন তাহলে সেই গৃহস্থের পিতৃপুরুষগণ হাজারবর্ষ অনাহারে থাকেন। যে গৃহস্থ বিপ্র, বেদপারঙ্গম অতিথিকে অন্নদান না ক'রে স্বয়ং ভোজন কর্মে ব্যাপৃত হন তিনি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেও সেই গৃহীত খাদ্যদ্রব্য পাপাদি ভক্ষণের সমতুল হয়।

মহর্ষি পরাশর নির্দেশিত আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্মপালক। আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং ধর্মও বিমুখ থাকেন। পরাশরমতে যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ষট্‌কর্মে নিরত ও নিত্য দেবতা ও অতিথির পূজাসম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট আহার্যরূপে ভক্ষণ করেন, তিনি কখনও অবসন্ন হন না। অতত্রব দ্বিজগণের প্রতিদিন নির্ধারিত কর্মসম্পাদনের তালিকায় অতিথিসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি অবশ্য কর্তব্য–

‘ষট্‌কর্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ।

হুতশেষন্তু সভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি।।’[৫৪]

পরাশর গৃহস্থের সাধারণ ধর্মাচারের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

‘স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জিতৈঃ।

নির্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ।।’[৫৫]

অর্থাৎ স্বয়ং চাষ করে স্বয়ং ধান্যাদি উপার্জন করে পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করতে হয়। এক্ষেত্রে এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে নৃযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞ প্রাধান্য পেয়েছে।

রচনারীতির উৎকর্ষতা ও প্রাচীনত্বের নিরিখে পরাশরসংহিতার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত। প্রাচীন সংহিতাকার হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরাশরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট উদার। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র থেকে পরাশরের মতাদর্শের কিছু কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু অতিথিসৎকাররূপ কর্মের প্রাধান্য তিনি সকলের মতই আলোচনা করেছেন। পরাশরস্মৃতির প্রতিষ্ঠা তার মৌলিকত্বই সাধন করেছে।

ব্যাসসংহিতা

পৌরাণিক তথ্যানুযায়ী মহর্ষি বেদব্যাস বা ব্যাসদেব পরাশর নন্দন, শক্তির পৌত্র ও বসিষ্ঠের প্রপৌত্র। কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা নন, ব্যাসদেব ছিলেন সনাতন ভারতীয় চিন্তা-ধর্ম-দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্নিহোত্রী। ভারতীয় সংস্কৃতির হৃদয় মন্থন করে তিনি মহাভারতরূপ অমৃত বিশ্বের দরবারে পরিবেশন করেছেন। বেদবিভাজন, অষ্টাদশ মহাপুরাণের গ্রন্থনাদির মত অবিস্মরণীয় কীর্তির দাবিদার মহর্ষি বেদব্যাস। বেদব্যাস পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে সমবেত ঋষিকুল সমীপে তাঁর ধর্মশাস্ত্র ও ব্যবহার বিষয়ক চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ২৫০ টি শ্লোকে সমৃদ্ধ ব্যাসসংহিতা ব্যাখ্যা করেন। ব্যাসসংহিতার ৩য় অধ্যায়ে মানুষের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মসমূহ আলোচিত হয়েছে; এই প্রসঙ্গে অতিথিপূজন যে গৃহস্থের বিহিত কর্ম তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসা, উত্তম গৃহস্থের গুণাবলী প্রভৃতি আলোচনাবসরে অতিথি ও আতিথ্যের বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যাত হয়েছে–

‘উপবিশ্য গৃহদ্বারি তিষ্ঠেদ্ যাবন্মুহূর্তকম্।

অপ্রমুক্তোঽতিথিং লিপ্সুর্ভাবশুদ্ধঃ প্রতীক্ষকঃ।।

আগতং দূরতং শান্তং ভোক্তুকামমকিঞ্চনম্।

দৃষ্টাসম্মুখমভ্যেত্য সৎকৃত্য প্রশয়ার্চ্চিনৈঃ।।

পাদধাবনসম্মানাভ্যঞ্জনাদিভিরর্চ্চিতঃ।

ত্রিদিবিং প্রাপয়েৎ সদ্যো যজ্ঞস্যাভ্যধিকোঽতিথিঃ।।

কালাগতোঽতিথির্দৃষ্টবেদপারো গৃহাগতঃ।

দ্বাবেতৌ পূজিতৌ স্বর্গং নয়তোঽধস্ত্বপূজিতৌ।।

বিবাহ্যস্নাতকক্ষ্মাভৃদাচার্য্যসুহৃদৃত্বিজঃ।

অর্ঘ্যা ভবন্তি ধর্ম্মেণ প্রতিবর্ষং গৃহাগতাঃ।।

গৃহাগতায় সৎকৃত্য শ্রোত্রিয়ায় যথাবিধিঃ।

ভক্ত্যোপকল্পয়েদেকং মহাভাগং বিসর্জয়েৎ।।

বিসর্জয়েদনুব্রজ্য সুতৃপ্তশ্রোত্রিয়াতিথীন্।

মিত্রমাতুলসম্বন্ধিবান্ধবান্ সমুপাগতান্।।’[৫৬]

অর্থাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞের ক্রম সম্পাদন হেতু গৃহস্থ গৃহদ্বারে বসে থেকে শুদ্ধচিত্তে তথা কায়মনোবাক্যে পবিত্র থেকে অতিথির প্রতীক্ষারত অবস্থায় কালক্ষেপ করবেন (কিয়ৎকাল)। যদি দেখেন যে বুভুক্ষু অর্থাৎ ক্ষুধার্ত, প্রকৃতিতে শান্ত, অকিঞ্চন অতিথি দূর থেকে আসছেন তাহলে কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে সেই আগন্তুকের সামনে উপস্থিত হয়ে বিনয়পূর্বক তাঁর

অভ্যর্চনা ক'রে অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। অতিথিকে হস্তপদাদি ধৌতিকরণের জন্য ব্যবস্থা, সম্মাননা জ্ঞাপন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা জানালে গৃহী স্বর্গলাভের অধিকারী হন। অতিথি যজ্ঞের থেকেও অধিক গুরুত্বমণ্ডিত। বৈশ্বদেবকালে সমাগত অতিথি এবং গৃহে উপস্থিত বেদকুশলী-এঁরা উভয়েই উত্তমরূপে পূজিত হলে গৃহকর্তা স্বর্গগামী এবং অনাদৃত বা অপূজিত হলে নরকগামী হন। জামাতা প্রভৃতি বিবাহসম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি স্নাতক, রাজা, আচার্য, বন্ধু এবং ঋত্বিকপুরুষ যদি বছর বছরও গৃহে আগত হন তাহলেও গৃহধর্মানুসারে গৃহস্থের কল্যাণার্থে অভ্যর্চনার যোগ্য। গৃহে উপস্থিত শ্রোত্রিয়কে সামর্থ্যমত যথাবিধি পূজা করে ভক্তিসংযুত হয়ে একটি গরু নিবেদন করে তারপর বিদায় জানাতে হয়। শ্রোত্রিয় অতিথিরা পরিতৃপ্ত হলে তাঁদের সাথে সাথে অনুসরণপূর্বক বিদায় জানাতে হয়। মিত্র, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবেরা অভ্যাগতরূপে উপস্থিত হলে তাঁদেরকে ভোজনপূর্বক সৎকার করতে হয়। কিন্তু ভোজনের অন্ন সম্পর্কে আরও বিশদে ধর্মশাস্ত্রকার বলেছেন যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন সেবন করেন সেই ব্যক্তি যদি অভ্যাগতদের সৎকারের জন্য অস্বাদু অন্ন প্রদান করেন তাহলে তিনি অধোগতিপ্রাপ্ত হন। আবার সায়ং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুযায়ী অবশ্য পূজার্হ। আতিথ্য যথাযথ না হলে সেই অতিথি গৃহীর পুণ্য হরণ করেন–

'সায়মপ্যতিথিঃ পূজ্যো হোমকালাগতোঽহনিশম্।

শ্রদ্ধয়া শক্তিতো নিত্যং শ্রুতং হন্যাদপূজিতঃ।।'[৫৭]

অতএব অতিথি সৎকারের বিধি সম্পর্কে ব্যাসদেবের কিছু সিদ্ধান্ত যেমন মৌলিক তেমনি স্বাতন্ত্রের দাবিদার। তাই ভারতে সর্বজনবিদিত ধর্মশাস্ত্রকার ব্যাসদেব অতিথি আপ্যায়নের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসায় ব্যক্ত করেছেন–

'গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো নাস্তি নাস্তি পুণঃ পুণঃ।

সর্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্ত পালয়েৎ।।'[৫৮]

শঙ্খসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ববর্তী স্মার্ত ব্যক্তিত্ব রূপে মহর্ষি শঙ্খ সুবিদিত চরিত্র। এই মহর্ষির বর্ণনা মহাভারতে উপলব্ধ হয়। মনুষ্য জীবনের যথোপযুক্ত উত্তণের চাবিকাঠি ছিল আচারাদি পালনে বা ধর্মাচরণে। সেই উদ্দেশ্যেই স্মৃতিশাস্ত্রকাররূপে মহর্ষি শঙ্খের অবতারণা। মহর্ষি রচিত শঙ্খধর্মসূত্র আর শঙ্খসংহিতা দুটি পৃথক গ্রন্থ। শঙ্খধর্মসূত্রটি মূলতঃ গদ্যে নিবদ্ধ আর শঙ্খধর্মশাস্ত্র বা শঙ্খসংহিতা পদ্যাত্মক। শঙ্খধর্মসংহিতাটি আকৃতিতে বিশেষ দীর্ঘ না হলেও বিষয়বস্ত অনেকগুলি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, এতে মোট ১৮টি অধ্যায় পাওয়া যায়। আলোচ্য সংহিতার ৫ম থেকে ৭ম অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রমের আচরণবিধি আলোচনা প্রসঙ্গে অতিথি প্রসঙ্গটি বিশদে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেহেতু মূল শঙ্খধর্মসূত্র অধুনা বিলুপ্ত তাই ৩৩০ টি শ্লোকান্বিত শঙ্খসংহিতায় বর্ণিত অতিথি-প্রসঙ্গই আলোচ্য। শঙ্খসংহিতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে অতিথি সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায়–

'যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।

অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ।।

ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাভিশ্চ বহ্নিশুশ্রূষয়া ন চ।

গৃহী স্বর্গমবাপ্নোতি যথা চাতিথিমাগতম্।।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গৃহস্থোঽতিথিমাগতম্।

আহারশয়নার্থেন বিধিবৎ পরিপূজয়েৎ।।’[৫৯]

অর্থাৎ সামাজিক আচারানুসারে যেমন স্ত্রীলোকের প্রভু হলেন স্বামী, চতুবর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ অনুরূপভাবে অতিথি হলেন গৃহস্থের প্রভু। যজ্ঞকর্ম দ্বারা কিংবা যজ্ঞান্তে বহু দক্ষিণাদি প্রদানের দ্বারা বা বহ্নিশুশ্রূষার দ্বারা স্বর্গেচ্ছু গৃহস্থের ইষ্টপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু অতিথি সেবা-সৎকারের মাধ্যমে গৃহীর স্বর্গপ্রাপ্তি বা ইষ্টপ্রাপ্তি হয় নিশ্চিত। তাই স্ত্রী জাতির স্বামীসেবা, ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষা, বানপ্রস্থীর বিলাস-ভোজন পরিত্যাগ, যোগিগণের স্ত্রীসংসর্গ পরিহার মুখধর্ম এবং গৃহস্থের মুখ্যধর্ম হল অতিথিসেবা। সেকারণে গৃহে আগত অতিথিকে প্রযত্ন সহকারে আহার্যদান, শয্যাদান এবং ধনদান পূর্বক অতিথি সৎকার গৃহস্থের অবশ্য করণীয়। শঙ্খসংহিতাতে কেবলমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের পালনীয় কর্তব্যই শুধু আলোচিত হয়নি, বানপ্রস্থাশ্রমে দ্বিজের অতিথি সৎকারের রীতি সম্বন্ধে দিগ্দর্শিত হয়েছে-

‘যদাহারো ভবেৎ তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।

তেনৈব পূজয়েন্নিত্যমতিথিং সমুপাগতম্।।[৬০]

বনবাসকালে বানপ্রস্থী বন্য ফলমূল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করে আহারাদি সমাধা করবেন, তার দ্বারাই পিতৃলোকের ও দেবতাদের অর্চনা করবেন এবং ঐ সংগৃহীত আহার্য দ্বারাই কুটীরে আগত অতিথির সেবা বিধান করে বানপ্রস্থাশ্রম ধর্মপালন করবেন।

অতএব বেদাধ্যয়ন, তপশ্চরণ প্রভৃতি কর্মের সাথে সাথে মোক্ষপ্রাপ্তির অন্যতম মার্গ হল অতিথিসেবা, মহর্ষি শঙ্খ চতুরাশ্রমেরই পালনীয় কর্তব্যরূপে অতিথিসৎকারকে প্রাধান্যপূর্বক ব্যাখ্যা করেছেন। পঞ্চমহাযজ্ঞ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অতিথি-অভ্যাগত সেবা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই ধর্মশাস্ত্রে পরিকীর্তিত হয়েছে।

লিখিতসংহিতা

মহর্ষি লিখিতের যথার্থকাল নিরূপণে মহাভারতের সহায়তায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধর্মশাস্ত্রকার লিখিত ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যুগের সমসাময়িক (আনুমানিক খ্রী.পূ.৩১০০ অব্দ)। আর অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মত লিখিত সংহিতার বৈশিষ্ট্য একরকম নয়, কারণ এই ধর্মশাস্ত্রের প্রারম্ভে বক্তা ও শ্রোতার নামোল্লেখ এবং শেষে উক্ত গ্রন্থপাঠের মাহাত্ম্য কীর্তন অনুপস্থিত। তাই লিখিত সংহিতার প্রাপ্ত সংস্করণটি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এই সংস্করণে মাত্র ৯২ টি শ্লোক পাই তা প্রকীর্ণ অধ্যায়ের মত। তাই আলোচ্য বিষয়সমূহের ক্রমবিন্যাস লিখিতসংহিতায় পাওয়া যায় না। রচনারীতির নিরিখে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ হলেও বর্ণিত বিষয়সমূহ অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রানুসারী। তাই মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের পরিপোষক হিসেবে অন্যান্য আচরণীয় কর্তব্যবিধির সাথে সাথে অতিথিপরায়ণতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। লিখিতসংহিতার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ইষ্টাপূর্ত্তি। ইষ্টাপূর্ত্তি শব্দটি যৌগিক। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, সত্যভাষণ, অতিথি পূজন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্মই ইষ্ট। আর পূর্ত্ত হলো জনকল্যান কর্ম। তাই মোক্ষপ্রাপ্তির সোপান স্বরূপ আতিথ্যগুণ আবশ্যক–

'অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।

আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে।।'[৬১]

অর্থাৎ নিত্য হোম, তপস্যা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, বেদোক্ত বিধিপালন, অতিথিসেবা এবং বলিবৈশ্ব ইত্যাদি কার্যকে ক্রান্তদর্শী ঋষিকুল ইষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। অতএব ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য অতিথিসেবা আবশ্যক।

লিখিতসংহিতা সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত ধর্মশাস্ত্র। মহর্ষি লিখিত অগ্রজ শঙ্খের সাথে সম্বদ্ধ হয়ে ধর্মশাস্ত্রটি রচনা করেন। এই কারণে এই সংহিতায় দুই ভ্রাতারই নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তপোসিদ্ধ মহর্ষি লিখিত সমকালীন সমাজব্যবস্থার দর্পণস্বরূপ তাঁর সংহিতাতে সামাজিক স্থিতি বজায় রাখার জন্য ধর্মশাস্ত্রোচিত বিধিনিয়ম প্রবর্তনের সাথে সাথে অতিথিসৎকারের গুরুত্ব বর্ণনাবসরে মোক্ষ লাভের উপায় বর্ণনা করেছেন।

দক্ষসংহিতা

বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রচেতা ও মারিষের মিলনে দক্ষের উৎপত্তি। তিনি প্রজাপতি, দেবতা-মানুষ সমগ্র ভূতগ্রামের জনক। তিনি অদিতির পিতা, তাই দেবতাদেরও আদিপুরুষ। শতপথব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে দক্ষ বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছেন। দক্ষ রচিত ধর্মশাস্ত্রটি দক্ষসংহিতা রূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। দক্ষসংহিতার নানান সংস্করণ রয়েছে, তাদের মধ্যে আনন্দাশ্রম প্রকাশিত সংস্করণে সাতটি অধ্যায়ে ২২৭ টি শ্লোকে মানুষকে সামাজিক শিক্ষার পাঠদান করা হয়েছে। এই সংহিতার ৩য় অধ্যায়ে ৩৩ টি শ্লোকে গৃহস্থের নয়টি সুকর্ম, নয়টি কুকর্ম, নয়টি গোপনীয় কর্ম, নয়টি কথিত কর্ম এবং নয়টি দানযোগ্য বস্তু সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে–

‘সুধা নব গৃহস্থস্থস্য শব্দয়ামি নবৈব তু।

তথৈব নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা নব।।

প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি তথা নব।

সফলানি নবান্যানি নিষ্ফলানি নবৈব তু।।

অদেয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্বদা।

নবকা নব নির্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ।।

সুধাবস্তূনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে।

মনশ্চক্ষুর্মুখং বাক্যং সৌম্যং দদ্যাচ্চতুষ্টয়ম্।।

অভ্যুত্থানমিহাগচ্ছ পৃচ্ছালাপপ্রিয়ান্বিতঃ।

উপাসনমনুব্রজ্যা কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ।।

ঈষদ্দানানি চান্যানি ভূমিরাপস্তৃণানি চ।

পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গমাশ্রয়ঃ শয়নং তথা।।

কিঞ্চিচ্চান্নং যথাশক্তি নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসৎ।

মৃজ্জলঞ্চার্থিনে দেয়মেতান্যপি সদা গৃহে।।

সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।

বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যমুদ্ধতঞ্চাপি শক্তিতঃ।।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং দীনানাথতপস্বিনাম্।

মাতাপিতৃগুরুণাঞ্চ সংবিভাগো যথার্হতঃ।।’[৬২]

অর্থাৎ গৃহস্থের আচরণীয় নয়টি কর্ম অমৃতত্বলাভে সহায়ক, তাই এই নয়টি কার্য হল অমৃত, এই নয়টি অমৃতত্ব সঞ্চারক কার্যকে মহর্ষি দক্ষ সুধা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। গৃহস্থের

নয়টি কর্ম, নয়টি বিকর্ম, গুপ্তকার্য নয়টি, প্রকাশ্য কার্য নয়টি, সফল ও নিষ্ফল কার্যও নয়টি করে এবং গৃহস্থের সর্ব্বদা অদেয় বস্তুর সংখ্যাও নয়টি। নয়টি বিষয়ের অন্তর্গত নয়টি করে কার্য বর্ণনা করা হয়েছে-যেগুলি 'সুধা' নামক পারিভাষিক শব্দে প্রকাশিত। এই নবধা সুধার যথাযথ আচরণে গৃহস্থের জীবনে প্রভূত উন্নতির সঞ্চার হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিথিরূপে গৃহীর গৃহে সমাগত হলে গৃহস্থের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সংযম প্রয়োজন, এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তরিন্দ্রিয় মন, কর্মেন্দ্রিয় বাক্, জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও মুখ এই চারটি বিশেষ ইন্দ্রিয়কে শোভনরূপে অতিথির সামনে উপস্থাপন করতে হয়। এরপর প্রত্যুত্থান করা, এখানে আগমন করুন বা অতিথিকে এখানে আসুন বলা, তাঁর স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টভাষার দ্বারা আলাপচারিতার মাধ্যমে ভোজনাদি দ্বারা অতিথিসেবা করা এবং অতিথির গমনকালে তাঁর অনুগমন করা-এই নয়টি কাজ অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে পালন করতে হয়। এছাড়াও অল্পকিছু দান, উপবেশনের স্থান, বসবার জন্য কুশাসনাদি প্রদান, হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জল প্রদান ও তা দ্বারা প্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গ নিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়নের জন্য শয্যা তৈরী করে প্রদান, সামর্থ্যানুসারে খাদ্যবস্তু দান, অতিথির ভোজন না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থ ব্যক্তি স্বয়ং ভোজন না করা, অতিথির ভোজন কার্য সমাধা হলে আচমনের জন্য জল ও মৃত্তিকা প্রদান রূপ কার্য গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবতার আরাধনা, বলিবৈশ্য, অতিথি অভ্যর্চনা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র-অনাথ-তপস্বী-মাতা-পিতা এবং অন্যান্য গুরুবর্গীয়দের যথা যোগ্য সম্মান জ্ঞাপন গৃহস্থের অবধারিত নিত্য কর্তব্য। যে গৃহস্থ নিষ্ঠাপূর্বক এই কর্মসমূহ প্রতিপালন করে থাকেন তিনি ইহলোকে কীর্তিমান ও ধার্মিক বলে প্রতিভাত হন।

অদ্বৈতবাদী ধর্মশাস্ত্রকার মহর্ষি দক্ষ প্রণীত দক্ষসংহিতাতে উন্নত মানবধর্মের পরিচায়ক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের বিধি প্রদান করা হয়েছে। মনুষ্যসমাজ সার্বিক প্রচেষ্টা ও

কর্তব্যেরই চরম ফলশ্রুতি। সকলের কথা ব্যতিরেকে আত্মমগ্ন হয়ে যে ব্যক্তি কেবল নিজের কল্পনায় কালাতিপাত করে সে জীবন্মৃত। সকলের তথা সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত মনুষ্যজীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন ও সার্থকতামণ্ডিত জীবন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আচরণ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সাফল্য লাভের চাবিকাঠি নির্ণীত হয়েছে। স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত উপায়ে সামাজিক শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মহর্ষি দক্ষ মানবের হিতসাধনে ব্রতী হয়েছেন–

'ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।

এতেষাম্ভ হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ।।'[৬৩]

চতুরাশ্রমের মধ্যে মহর্ষি দক্ষ গাহর্স্থ্যাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন– 'ত্রয়াণামাশ্রমাণাং তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে।'[৬৪]এই গাহর্স্থ্যাশ্রম হল সামাজিক শিক্ষার বিশ্বস্ত ক্ষেত্র–এখানেই অতিথিসেবার সুযোগ সবচেয়ে বেশি।

গৌতমসংহিতা

ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গনে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেন মহর্ষি গৌতম। গৌতম ছিলেন সামবেদীয় ধর্মশাস্ত্রকার। ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও 'গৌতম' নামটি বারংবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মহর্ষি পরাশর গৌতমকে ত্রেতাযুগের ধর্মশাস্ত্রের অধিকারী পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন– 'কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।'

গৌতম ধর্মশাস্ত্র গৌতম ধর্মসূত্রেরই স্মার্তরূপ। ধর্মশাস্ত্রের উপাদান হিসেবে গৌতম বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, বাক্যোবাক্য (উপকথা) ও উপবেদের উল্লেখ করেছেন। গৌতমসংহিতা অপেক্ষা গৌতম ধর্মসূত্র সমধিক প্রসিদ্ধই কেবল নয়

গৌতমসংহিতায় সমগ্র গৌতম ধর্মসূত্রই উদ্ধৃত হয়েছে। পার্থক্য কেবলমাত্র অধ্যায় বিন্যাসে। চতুর্দশ শতাব্দীর টীকাকার গৌতম এই ধর্মশাস্ত্রে ২৮টি অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। ধর্মশাস্ত্রটি তিনটি প্রশ্নে বিভাজিত। প্রথম প্রশ্নে নয়টি, দ্বিতীয় প্রশ্নে নয়টি ও তৃতীয় প্রশ্নে দশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম প্রশ্নে সদাচার, গৃহস্থধর্ম, গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে–'দেবপিতৃমনুষ্যভূতর্ষিপূজকঃ সর্বাতিথিঃ'[৬৫] অর্থাৎ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, এবং ঋষিদের যথোচিত অর্চনা করতে হয় এবং ইনারা নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথিরূপে সমাগত হতে পারেন।

বেদ, বেদজ্ঞানের স্মৃতি ও আচার এই তিনটি বিষয় হল ধর্মের মূল। আচার প্রতিপালনের দ্বারা ধর্মের সাধন হয়– এই আচারের মধ্যে অতিথি-অভ্যাগত সৎকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই ধর্মসেবী অতিথিসেবার মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূরণে সমর্থ হন। উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতবর্ষের সর্বত্র গৌতমধর্মসূত্র মান্যতাপ্রাপ্ত। পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক সমাজে গৌতমধর্মসূত্রের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক। নানাবিষয় বর্ণিত হলেও অতিথি প্রসঙ্গ সমভাবে গুরুত্ব সহকারে গৌতম ব্যাখ্যা করেছেন।

বসিষ্ঠসংহিতা

যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনুসংহিতায় মহর্ষি বসিষ্ঠকে ধর্মশাস্ত্রকাররূপে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসিষ্ঠ একটি সুবিদিত চরিত্র। বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের পাশাপাশি পৌরাণিক সাহিত্যে মহর্ষি বসিষ্ঠ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিভাত। বসিষ্ঠ গোত্র প্রবর্তক ঋষি। বাসিষ্ঠতন্ত্র নামক তন্ত্রগ্রন্থ, বাসিষ্ঠ লিঙ্গপুরাণ, যোগবাসিষ্ঠ নামক যোগগ্রন্থ, বাসিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ-মহর্ষি বসিষ্ঠের নামাঙ্কিত প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র পাওয়া গেলেও বসিষ্ঠের নামানুসারী

কোন শ্রৌত বা গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায় না। তাই বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রকে ঋগ্বেদের কল্পপূর্তি বলে গণ্য করা হয়। বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রের বেশ কয়েকটি সংস্করণ পাওয়া যায়। জীবানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে ২০টি সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ ২১তম অধ্যায় পাওয়া যায়। আনন্দাশ্রম সম্পাদিত বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে ৩০টি অধ্যায়ে ১০৩৯টি সূত্র রয়েছে। সদাচার মানবজীবনের দুঃখমুক্তির ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে–

'আচারঃ পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।

হীনাচার পরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।।'[৬৬]

অর্থাৎ আচার তথা সদাচারই সকলের পরমধর্ম, এটি একটি নিশ্চয়ীকৃত বিষয়। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোক পরলোক নির্বিশেষে সর্বত্রই বিনষ্ট হয়। এই সদাচার পালনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বসিষ্ঠসংহিতার অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে–

'সায়মাগতমতিথিং নাবরুন্ধ্যাৎ নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।

যস্য নাশ্নাতি বাসার্থী ব্রাহ্মণো গৃহমাগতঃ।

সুকৃতং তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সর্বমাদায় গচ্ছতি।।

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।।

নৈকগ্রামীনমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।

কালে প্রাপ্তে অকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।।'[৬৭]

অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে গৃহে আগত অতিথিকে অন্যত্র যেতে দিতে নেই। অতিথি অনাহারে গৃহস্থের বাড়িতে থাকা নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ অতিথি যার গৃহে অনাহারে অবস্থান করেন তিনি গৃহস্থের সকল পুণ্যফল গ্রহণ করে গমন করেন। যে ব্রাহ্মণ একরাত্রিমাত্র গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থান করেন, তাঁকে অতিথি বলে। অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের জন্যই এইরকম নামকরণ হয়েছে। একগ্রামবাসী বিপ্র বা বন্ধুবান্ধব (সাঙ্গতিক) অতিথিরূপে গণ্য হন না। তাই অতিথি যথানির্দিষ্টকালে হোক বা অনির্দিষ্টকালেই উপস্থিত হোন না কেন তাঁকে গৃহে অনাহারে রাখা যাবে না। অতিথির প্রতি গৃহস্থ শ্রদ্ধালু ও অলোলুপ আচরণ করবেন। বানপ্রস্থাশ্রমেও অতিথিসৎকার অর্থবাহী–

'মূলফলভৈক্ষেণাশ্রমাগতমতিথিমর্চ্চয়েৎ।'[৬৮]

আশ্রমাগত অতিথিকে ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষাপূর্বক সৎকৃত করতে হয়। অতিথিকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে হয় সেই দানের প্রতিগ্রহ করা কখনোও উচিত নয়। সুস্থ ও সংযত জীবনের জন্য বসিষ্ঠ কতগুলি মানবীয় সদ্গুণের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অতিথিসৎকার অন্যতম। অতিথিপরায়ণ, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই পরের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন ও অভিপ্রেত লোকপ্রাপ্ত হন।

ধর্মশাস্ত্রকারগণ মূলতঃ সমাজ সংস্কারক। আপস্তম্ব বৈদিক ঋষি, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ঋষি আপস্তম্ব, তিনি ঐ বেদের কল্পসূত্রের রচয়িতা। সমাজ সংস্কারকরূপে আপস্তম্ব মানুষের জীবনের পালনীয় কর্তব্যকর্মাদির বিধান দিয়েছেন আপস্তম্বসংহিতাতে।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকদের মধ্যে মহর্ষি শাতাতপ অন্যতম। তাঁর গ্রন্থ 'কর্মবিপাক' নামে প্রসিদ্ধ। শাতাতপ রচিত শাতাতপস্মৃতি বা শাতাতপসংহিতা কর্মবিপাক গ্রন্থেরই অংশবিশেষ। কর্মবিপাকে বর্ণিত শাতাতপস্মৃতি ছাড়াও শাতাতপ নামাঙ্কিত আরও দুটি

গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়- শাতাতপসংহিতা ও বৃদ্ধশাতাতপস্মৃতি। স্মৃতিসন্দর্ভে শাতাতপসংহিতার ছয়টি অধ্যায়ে ২২৮টি শ্লোক রয়েছে; আবার জীবানন্দ সম্পাদিত ও আনন্দাশ্রম সম্পাদিত শাতাতপস্মৃতিতে ছয়টি অধ্যায়ে ২৩২টি শ্লোক পাওয়া যায়। শাতাতপসংহিতাটি যুগপৎ গদ্য ও পদ্যে রচিত। পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধি, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াদির বর্ণনা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনাবসরে অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয়েছে–

‘প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খোপতিতো এব বা।

সম্প্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ সর্গসংক্রমঃ।।’

সমাজের সুশাসন ও মানুষের জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায়ে স্মৃতি সংহিতাগুলি রচিত হয়েছিল। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি মুখ্যতঃ যুগশাস্ত্র। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ও পরিবর্তিত হয়। অন্তরে সদা বিরাজমান বেদের স্মরণ দ্বারা আর্য ঋষিগণ বেদের আক্ষরিক পাঠ লিপিবদ্ধ না করলেও বেদের সম্যগর্থ নিবদ্ধ করে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এগুলি ঋষিদের রচিত ও চিন্তা প্রসূত বলে অপৌরুষেয় নয়। বেদের প্রামাণ্য মুখ্য, স্মৃতির প্রামাণ্য গৌণ। কোন স্মৃতিবাক্য বেদানুমোদিত হলেই আদৃত হয় বা প্রশস্ত বলে স্বীকৃত হয় এবং বেদবিরুদ্ধ হলে ত্যক্ত ও অনাদৃত হয়। বিভিন্ন শাখা উপশাখায় সম্বদ্ধ বেদের সম্যক অভ্যাসের ফলে বেদবিহিত কর্মগুলি ঋষিদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন প্রভৃতি মানুষের ব্যবহারিক জীবনেও প্রতিফলিত হত। স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষিরা প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সংসার যাপন করতেন সেগুলি বেদবিহিত নিয়ম সম্বলিত কর্মসূচী ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘স্মৃতি’ শব্দের দ্বারা তাই শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিদের আচার-ব্যবহারমূলক শিষ্টাচার নিরূপিত কার্যাবলীকেই নির্দেশ করে। এই স্মৃতি বা বেদার্থের স্মরণের মূলে কোন প্রমাদ বা

ভ্রান্তি নেই বলেই অতীন্দ্রিয় ধর্মাধর্ম বিষয়ে কেবলমাত্র বেদের স্মরণ হয়। বৈদিক অনুভূতি না থাকলে স্মৃতির অস্তিত্ব থাকে না বলে অর্থাপত্তির দ্বারা স্মৃতিবচনের মূলগত বৈদিক বচনের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। স্মার্তকর্মগুলি বৈদিককর্মসমূহের ন্যায় নিত্যত্ব নিরূপণে স্মরণীয় যে শ্রৌত যাগ-যজ্ঞাদিকর্মগুলির মত স্মার্তকর্মগুলির প্রত্যক্ষভাবে বেদের সাথে সম্বন্ধ না থাকলেও পরোক্ষভাবে আছে। কর্কাচার্য এসম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন–'প্রত্যক্ষা হি শ্রুতয়ঃ শ্রৌতেষু, স্মার্তেষু চ পুণঃ কর্তৃসামান্যাদনুমেয়াঃ শ্রুতয়ঃ। স্মার্তানামপি হি বেদমূলত্বমুক্তম্।' তাই স্মার্তকর্মগুলি নিত্যকর্মরূপে বিবেচ্য। ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ ভেদে স্মৃতি-দ্বিবিধতা নির্ধারণের অব্যবহতি পরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে স্মৃতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। আর্য ঋষিদের স্মরণ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে যা রচিত হয়েছে তা মন্বাদি রচিত স্মৃতিশাস্ত্ররূপ প্রত্যক্ষস্মৃতি আর বংশানুক্রমে এমন কিছু আচার-ব্যবহার পালিত হচ্ছে, যার আদি উৎস হয়ত বেদে পাওয়া যায় না। তখন অনুমেয় যে ঐ বংশের পূর্বপুরুষগণ বেদের যে বিশেষ শাখা পাঠ করে ঐ আচার পালন করতেন সেই বেদশাখা তাঁদের উত্তরসূরিরা অবগত নন বলে আচরণগুলির মূল অনুসন্ধান কার্যে সফল হতে পারেন না তাই পূর্বপুরুষদের আচরিত স্মৃতি হল পরোক্ষস্মৃতি।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, হারীত, উশনাঃ, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম ও বসিষ্ঠ সরাসরিভাবে তাঁদের রচনায় অতিথি-অভ্যাগত সৎকার প্রসঙ্গকে মনুষ্য জীবনের নিত্যকর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন, এছাড়াও অত্রি, আপস্তম্ব, অঙ্গিরা, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ও নারদ প্রভৃতি মুখ্য ধর্মশাস্ত্রকারগণ অতিথি প্রসঙ্গে সরাসরি বিশদ আলোচনা পূর্বক আলোকপাত না করলেও ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে কোথাও অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গটি কখনই গুরুত্বহীন হয়নি। স্মৃতিশাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে অতিথি অর্চনা সামগ্রিকভাবে মানুষের আচরণীয় অবশ্য কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। বেশিরভাগক্ষেত্রে অতিথি-প্রসঙ্গটি প্রায় একই

রকমভাবে পূর্বে পূর্বে আলোচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পুনরুক্তি দোষ দেখা গেছে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মহর্ষি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রামাণ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করে বাকি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রকারেরা অতিথিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, একেকজনের ব্যাখ্যায় অতিথিসৎকারের একেকটি নতুন মার্গের সন্ধান পাওয়া যায়।

ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র পরস্পরসাপেক্ষ। ব্যক্তির বৃহত্তর রূপ পরিবার, পরিবারের সমাজ আর সমাজের বৃহত্তর রূপ হল রাষ্ট্র। ব্যক্তি পরিশীলিত হলে পরিবার পরিশীলিত হবে। সুস্থ ও সুগঠিত পরিবারই সুস্থ সমাজের পূর্বশর্ত। মোক্ষ ভারতীয় জীবনের তূরীয় পর্যায়। সদাচারী ব্যক্তির নির্দেশনায় সামাজিক কল্যাণের মাধ্যমে এই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব। সদাচার পালনের অঙ্গ হিসেবে অতিথিসৎকার প্রসঙ্গটিকে প্রাধান্য দিয়ে ধর্ম তথা পরিপূর্ণ জীবনবোধকে কেন্দ্র করে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যেরা ধর্মশাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারের যথার্থই অনুভব করেছেন যে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-মহাবিশ্ব প্রভৃতি পরস্পর সাপেক্ষ, কেউ নিরপেক্ষ নয় তাই পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিসেবার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাপূর্বক সুন্দর ও সুস্থ পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি ধর্মশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধকারেরা যথা আচার্য বিশ্বরূপ, মেধাতিথি, অপরার্ক, কুল্লুকভট্ট, জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে অতিথিসেবার প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য এই ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা এবং নিবন্ধকারগণ নির্দিষ্ট স্মৃতি বা ধর্মসূত্রের ব্যাখ্যা নিজের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাখ্যা করলেও অতিথিসেবার মত স্বাভাবিক প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে প্রায় সর্বত্রই উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমানে মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ব্যতীত প্রায় সামগ্রিক প্রয়োজনসাধক স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ আমাদের আয়ত্তে নেই। যেগুলি আছে সেগুলি প্রায়ই খণ্ডিতাকারে প্রতিভাত। সারা পৃথিবী জুড়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভোগবাদ প্রাধান্য বিস্তার করায় শ্রুতি-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা ক্রমশই মানুষের মন থেকে অপসারিত হচ্ছে। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের বিধি-নিষেধ, পালনীয়-আচরনীয় কর্তব্যরাজির বিধিনিয়ম সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে সংহত করে প্রকৃতই প্রগতির পথ দেখায়। স্মৃতিসংহিতা কেবল আচার-ব্যবহারের পরিশুদ্ধি ঘটাতে ব্যাপৃত একথা মনে করা ভুল। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলির লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রসমূহ প্রনয়ণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে মানবের চিত্তশুদ্ধি-সংসিদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন। চিত্তশুদ্ধিই মানবধর্মের প্রথম ধাপ। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য যে মোক্ষ সেই মোক্ষ চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই লাভ সম্ভব। তাই সদাচার পালনের মাধ্যমে স্মৃতিশাস্ত্রে বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। অতিথি-অভ্যাগতকে যথাযোগ্য সম্মান জ্ঞাপন, তাঁর যথার্থ সৎকার সেই বর্ণিত সদাচারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং স্মৃতিসংহিতার বিধি-নিষেধ মেনে চললে মানুষের অন্তরে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়, আর সত্ত্বগুণের দ্বারাই মানব পশু প্রকৃতি বা আসুরী প্রকৃতি জয় করে দিব্য প্রকৃতি লাভের পথে অগ্রসর হয়। আর্য স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক সংহতি রক্ষার জন্য যোগশক্তির সাহায্যে শ্রুত বেদতত্ত্বকে সংহিতার আকারে জীবনের পথদর্শিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেগুলিকে যদি সমগ্র মানবকুল শুভবুদ্ধির সাথে গ্রহণ করে ও পালন করে তবেই জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়; অন্যথায় পথভ্রষ্ট দুরাচারী জীবের জীবনযন্ত্রণা দুর্বিষহ।

তথ্যপঞ্জি

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/৪

২. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/২১

৩. ঋগ্বেদ ৪/৫৮/৩

৪. মনুসংহিতা ২/৭

৫. ঐ ১/১০৮

৬. ঐ ৪/২১

৭. ঐ ৩/৬৮

৮. ঐ ৩/৬৯

৯. ঐ ৩/৭০

১০. ঐ ৩/৭২

১১. ঐ ৩/৮০

১২. ঐ ৩/৭৩

১৩. ঐ ৩/৭৪

১৪. ঐ ৩/৭৮

১৫. ঐ ৩/৭৫

১৬. মনুসংহিতা ৩/১০২

১৭. ঐ ৩/৯৯

১৮. ঐ ৩/১১০

১৯. ঐ ৩/১০৩

২০. ঐ ৩/১০৪

২১. ঐ ৩/১০৫

২২. ঐ ৩/১০১

২৩. ঐ ৩/১০৬

২৪. ঐ ৩/১০৭

২৫. ঐ ৩/১০৯

২৬. ঐ ৩/১১১

২৭. ঐ ৩/১১২

২৮. ঐ ৩/১১৩

২৯. ঐ ৩/১১৬

৩০. ঐ ৩/১১৪

৩১. ঐ ৩/১১৭

৩২. মনুসংহিতা ৩/১১৫

৩৩. ঐ ৩/১১৯

৩৪. ঐ ২/১৩০

৩৫. ঐ ২/১৩১

৩৬. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/১০২

৩৭. ঐ ১/১০৫

৩৮. ঐ ১/১০৭

৩৯. ঐ ১/১০৮

৪০. ঐ ১/১০৯

৪১. ঐ ১/১১১

৪২. ঐ ১/১১৩

৪৩. ঐ ১/১১০

৪৪. ঐ ১/১৫৭

৪৫. পদ্মপুরাণ - উত্তরখণ্ড ২৬৩/৮৬-৮৯

৪৬. বিষ্ণুসংহিতা ৫৯/২৫-২৯

৪৭. ঐ ৬৭/৩৬-৩৯

৪৮. বিষ্ণুসংহিতা ৬৭/৪৪-৪৬

৪৯. ঐ ৯৯/১৮

৫০. হারীতসংহিতা ৪/৫৫-৫৯

৫১. উশনঃসংহিতা ১/৪৭

৫২. পরাশরসংহিতা ১/৩৯-৪৩

৫৩. ঐ ১/৫১-৫৩

৫৪. ঐ ১/৩৭

৫৫. ঐ ২/৭

৫৬. ব্যাসসংহিতা ৩/৩৭-৪৩

৫৭. ঐ ৪/২

৫৮. ঐ ৩/৭০-৭১

৫৯. শঙ্খসংহিতা ৫/৭,১২,১৩

৬০. ঐ ৬/৩

৬১. লিখিতসংহিতা - ৫

৬২. দক্ষসংহিতা ৩/১-৯

৬৩. ঐ ১/৩

৬৪. দক্ষসংহিতা ২/৪৩

৬৫. গৌতমসংহিতা - ৩য় অধ্যায়

৬৬. বসিষ্ঠসংহিতা - ৬ষ্ঠ অধ্যায়

৬৭. ঐ - ৮ম অধ্যায়

৬৮. ঐ - ৯ম অধ্যায়

খ. পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত আতিথেয়তা

পুরাণ

সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক সাহিত্যের পরেই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে পুরাণের উল্লেখ করতে হয়। 'পুরাণ' শব্দের অর্থ প্রাচীন বা পুরাতন। পুরাতন কাহিনী অর্থে পুরাণ শব্দের ব্যবহার করা হয়। 'পুরাণম্ আখ্যানং পুরাণম্'- প্রাচীন আখ্যানই হল পুরাণ। ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের এবং পুরাণ-সমকালীন ঐতিহাসিক যুগের নানাবিধ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সন্নিবিষ্টরূপ হল পুরাণ। অথর্ববেদ অনুসারে পুরাণের উৎপত্তি ঋক্, সাম, যজু ও ছন্দের সাথে হয়েছিল- 'ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণাং যজুষা সহ।'[১] শতপথব্রাহ্মণে পুরাণকে বেদ বলা হয়েছে ছান্দোগ্যোপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে একত্রে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে- 'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং।'[২] বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদসমূহের মত পরমাত্মার নিঃশ্বাস বলা হয়েছে- 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসপুরাণম্......'[৩] মহাভারতে পুরাণের উল্লেখ রয়েছে- 'পুরাণসংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থসংশ্রিতা'[৪] ও 'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'।[৫]

বৈদিক ধর্মের ন্যায় প্রাচীন পুরাণ সাহিত্যে ধর্মীয় তত্ত্বগত উচ্চতর মতবাদের পাশাপাশি লোকধর্মের এক বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয় অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ধ্যানধারণা, আচার-বিচার, ভয়ভীতি, কুসংস্কার, আদর্শ ও নীতিবোধ সবই চিত্রিত। বৈদিক ধর্মাচরণে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার ও সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু পৌরাণিক ধর্মসম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে ও প্রকৃতিতে সার্বজনীন স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করে। পৌরাণিক ধর্মমতে

সত্য ও অহিংসা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সত্য শুধু উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনা নয়; কায়িক, বাচিক ও মানসিক বিশুদ্ধিকরণ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুরাণের সাথে ইতিবৃত্ত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতেরা এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন- ইতিবৃত্তে থাকে বিভিন্ন সময়ের সত্যকারের ঘটনা, আর পুরাণে থাকে পৌরাণিক কাহিনী বা ঘটনার সমাবেশ। একটিতে থাকে Historical events আর একটিতে থাকে Mythological and Legendary Lore; আর এজন্যই পুরাণকে ইতিহাসের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু পুরাণ ইতিবৃত্ত নয়। ইতিহাস শব্দের অর্থ 'ইতি হ আস' অর্থাৎ প্রাচীনকালে এরূপ ঘটনা সত্য সত্যই ছিল। ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত শব্দ বা পরিভাষা দুটির মধ্যে কিছুটা দ্যোতনার ও অর্থের পার্থক্য রয়েছে। বেদের গূঢ়তত্ত্ব যাতে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাইরে না চলে যায় তাই পুরাণের উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বেদ ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার সাথে পুরাণাদি পাঠের বিধান পাওয়া যায়-

'বেদার্থ পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।

জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ।।'[৬]

পুরাণসমূহে গুহিত হয়ে আছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস ও উত্তরকালে রচিত হওয়া সাহিত্যের আকরসম্ভার।

ঐতিহ্যানুসারে ব্যাসদেবকে পুরাণের রচয়িতা বলা হলেও তাঁকে প্রধানত সহায়তা করেছিলেন রোমহর্ষণ সূত। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণের নাম যথাক্রমে- ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব বা বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ,

বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। ১৮ টি পুরাণের নাম যাতে সহজে মনে রাখা যায় সেজন্য দেবীভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে অপূর্ব এক তালিকা রয়েছে-

'মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং ব চতুষ্টয়ম্।

অনাপলিঙ্গকুস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্।।'[৭]

এছাড়াও পুরাণের মত উপপুরাণের সংখ্যা ১৮ টি।

পুরাণগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বকোষ। পুরাণে আলোচিত হয়নি এমন বিষয় স্বল্প। পুরাণ কালগত দিক থেকে বিশাল সময়ের ইতিহাসকে বহন করে এবং কলেবরের দিক থেকেও বিশাল। তাই পুরাণের সামগ্রিকতাকে ব্যক্ত করা কষ্টসাধ্য। সাধারণ মানুষের আচার, ব্যবহার, ধর্মাচরণ ও সাধনা, ব্রত, উপবাস, দান, দয়া, তীর্থযাত্রা, উৎসব, পর্ব, শবদাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনার সাথে অতিথিসেবার প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে। বিস্তৃত পুরাণ-পারাবারের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ পুরাণে আলোচিত অতিথিসেবার বিষয়টি বর্ণনা করা হল-

বিষ্ণুপুরাণ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের ধর্মসাধনায় বিষ্ণুপুরাণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মোট ২৩ হাজার বা ২৪ হাজার শ্লোকের লোকশ্রুতি আছে। কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে প্রায় ছয় হাজার শ্লোক পাওয়া যায়। পুরাণগুলিতে সাধারণতঃ বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ পুরাণে সুসংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ব্যতিক্রম স্বরূপ। পুরাণটির রূপ ও গঠন প্রকৃতি আদ্যন্ত সুসংহত ও সুসংবদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণ ছয়টি খণ্ডে বা অংশে বিভক্ত। পুরাণটিতে মোট ১২৬ টি অধ্যায় আছে। বিষ্ণুপুরাণের প্রবক্তা পরাশর ও শ্রোতা মৈত্রেয়। এই পুরাণের তৃতীয়

অধ্যায়ে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে গৃহস্থের পালনীয় আচারবিধি বর্ণনা প্রসঙ্গে অতিথিসৎকারের রীতিনীতি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ঋভু ও নিদাঘের কাহিনীতে নিদাঘের আতিথ্যগুণের উৎকর্ষতা বর্ণিত হয়েছে বিশদে। অতিথিরূপী ঋভু ব্রাহ্মণ নিদাঘকে পরীক্ষা করার জন্য ও আতিথেয়তার উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদনের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন; কিন্তু নিদাঘের নিঃস্বার্থ অতিথিসৎকারের প্রচেষ্টায় তিনি অভিভূত হন। অতিথিরূপী মহর্ষি ঋভুর প্রসন্নতায় নিদাঘ পরমলোক প্রাপ্ত হন কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য। এই পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে পরাশর ঐতিহ্যশালী আতিথেয়তার প্রসঙ্গে বলেছেন-

‘দেবতা-পিতৃ-ভূতানি তথা নাভ্যর্চ যোঽতিথিং।

ভুঙ্ক্তে স পাতকং ভুঙ্ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য নশ্যতি।।’[৮]

অর্থাৎ যে গৃহকর্তা দেবতা, মৃত পূর্বপুরুষ, আত্মা এবং অতিথিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না ক’রে তার খাদ্যগ্রহণ করে সে পাপের অংশীদার হয়। মহর্ষি ঔর্ব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে নৃযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞের মাধ্যমে মানবিক ধর্ম পালনের কথা বলেছেন। অতিথি আপ্যায়নে গৃহস্থের গৌরব ও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচরণকারী অতিথি ও ব্রহ্মচারীরা গৃহকর্তার আশ্রয় নেন। যাঁদের স্থায়ী বাসস্থান নেই এবং যারা নিয়মিত খাওয়ার পান না তাঁদের একমাত্র আশ্রয় হলেন গৃহকর্তা। যে গৃহকর্তার কাছ থেকে একজন অতিথি তাঁর ইচ্ছাপূরণ না করে ফিরে আসেন সে গৃহকর্তাকে নিজের ধর্মীয় ত্রুটি স্থানান্তর করেন ও গৃহস্থের ধর্মীয় যোগ্যতা কেড়ে নেন। অতিথিকে অবজ্ঞা করা, তাঁর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করা, অপমান করা বা নিষ্ঠুরতাপূর্বক দুঃখ দেওয়া গৃহস্থের ধর্মের অনুকূল নয়। অতিথিকে স্বাগত জানানো, মিষ্টভাষার প্রয়োগ আবশ্যক। যে গৃহকর্তা এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি উচ্চমার্গ লাভ করেন।[৯] গৃহকর্তাকে তার উঠোনে অতিথি আগমনের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে দুধ বা

গবাদি পশু নিয়ে। যদি অতিথি এসে পৌঁছান তাঁকে আতিথেয়তামূলক স্বাগত জানাতে হবে এবং উদারতার সাথে আহার্য প্রদান করতে হবে। উপবেশনের আসন এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জল ও বিনয়পূর্বক সম্ভাষিত করতে হবে। গৃহকর্তার উচিত এমন অতিথির প্রতি মনোযোগ দেওয়া যিনি একই গ্রামের বাসিন্দা নন, ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন এবং যাঁর নাম-গোত্রাদি অজানা। অতিথি বিদায়কালে প্রীতিপূর্ণ-সদয়শীল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে হয়।[১০]

গরুড়পুরাণ

গরুড়পুরাণ সাত্ত্বিকপুরাণের অন্তর্গত। পুরাণটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত- পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। এই দুটি খণ্ডে যথাক্রমে ২২৯ এবং ৩৫ টি অধ্যায় রয়েছে। পুরাণটির শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০। এই পুরাণ-কথা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে শুনিয়েছিলেন। গরুড় সেই বর্ণনা কাশ্যপের কাছে করেন। পুরাণটিতে মুখ্যতঃ বিষ্ণুপূজা, বৈষ্ণবব্রত, উৎসব এবং তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা হলেও অতিথিসেবার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। পূর্বখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে- বনবাসী, তপস্বী বা দুর্দশাগ্রস্থদের অতিথি হিসেবে উল্লেখ করার পরিবর্তে অতিথি হিসেবে এমন একজনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যিনি দীর্ঘ ভ্রমণের কারণে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 'অধ্বনীয়োঽতিথিঃ প্রোক্তঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগো।' একজন গৃহকর্তা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে আরোহণের জন্য শ্রোত্রিয় ও অতিথিদের যথাযথ আতিথেয়তা জ্ঞাপন করবেন। গৃহস্থ উৎকৃষ্ট আহার্য দানের পর শ্রোত্রিয় বা অতিথিকে গ্রামোপান্তে অনুগমনপূর্বক বিদায় সম্ভাষণা জানাতে বাধ্য থাকতেন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- 'শ্রোত্রিয়ম্ বা অতিথিং তৃপ্তং আসীমান্তাদনুব্রজেৎ'।[১১] পিতা মাতা ও অতিথির সাথে রাগান্বিতভাবে বিতর্ক করা উচিত নয়, যোগ্য কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ অশাস্ত্রীয় ও পাপের কারণ।[১২] চতুর্বর্ণের কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্মা দিব্য ঋষি নারদকে বলেছেন যে, উপহার প্রদান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যদের সাধারণ কর্তব্য। অগ্নিসংরক্ষণ, অতিথির আপ্যায়ন, বলিউদযাপন, উপহার প্রদান এবং দেবতাদের আরাধনা সকল গৃহস্থের কর্তব্য।[১৩] বৈদিক মন্ত্রপাঠ, অতিথিসেবার অভ্যাস হল মানুষের নিত্যদিনের মহান ধর্মীয় উপাচার 'বলিকর্মস্বধাহোমস্বাধ্যায়াতিথিঃ সৎক্রিয়া।'[১৪] বানপ্রস্থীরা নিয়মিত স্নান ও অতিথিসেবা করে দেবার্চনা করবেন। তিনবার অভিসিঞ্চন, দেবতা, অতিথি, বিদেহী পূর্বপুরুষদের প্রতি সৎকার বানপ্রস্থীদের দায়িত্ব।[১৫] বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে বীরবাহনের উপাখ্যানে অতিথিসেবার প্রাসঙ্গিকতা বিধৃত হয়েছে। পুরাণ গ্রন্থগুলিতে বারংবার গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে যে, গৃহীর মত বানপ্রস্থীদেরও আবশ্যিক কর্তব্য হল অতিথিসেবা। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, একজন বানপ্রস্থী পবিত্র অগ্নির রক্ষক হবেন, ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন ও অতিথিদের প্রতি সদর্থক মনোভাব পোষণ করে অতিথিসেবা করবেন।[১৬]

বরাহপুরাণ

বরাহপুরাণে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণানুসারে এর শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। কিন্তু বর্তমান সংস্করণগুলিতে প্রায় এগারো হাজার শ্লোক পাওয়া যায়। পুরাণটি ২১৭ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বরাহ অবতারে বিষ্ণু বরাহ রূপ ধরে পৃথিবীকে পাতাল থেকে উদ্ধার করেন। এতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণের সাথে অতিথিসেবার দিকটি সুচারুরূপে আলোচিত হয়েছে। বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

'প্রাপ্তেকালে বৈশ্বদেবে দৃষ্টমথিতিমাগতম্।

অদত্ত্বা তস্য যো ভুঙ্ক্তে ততো দুঃখান্তরম্ নু কিম্।।

দেবতাঽতিথিমর্ত্যাণাং দত্ত্বা চান্নং বসুন্ধরে।

পশ্চাৎ স বৈ সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যন্তরম্ নু কিম্।।

প্রবিষ্টস্তবতিথির্যস্য যস্য নিরাশো যং ন গচ্ছতি।

যেন কেন চিদ্ দত্তেন ততঃ সৌখ্যন্তরম্ নু কিম্।।’[১৭]

অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির জন্য একজন মানুষের অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ হওয়া উচিত। একজন অতিথি হলেন সমস্ত দেবতার মূর্ত প্রতীক, খাদ্যগ্রহণের সময় গৃহস্থের বাড়িতে একজন অতিথি উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্থ্ যদি অতিথিকে খাদ্য দান না করেন তাহলে তা ভগবানেরও অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্তির বিষয় হয়। অপরপক্ষে কোন মানুষ যদি প্রথমে দেবতা, অতিথি ও অন্যান্য জীবের উদ্দেশ্যে খাওয়ার দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রীত্যোৎপাদন করতে সমর্থ হন। অতিথি হতাশ না হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় ভক্তের অনন্যসাধারণ গুণ হল অতিথিপরায়নতা। আতিথেয়তার মহৎগুণের অনুশীলন করার কারণে ভক্ত বা গৃহস্থ কেবল বিষ্ণুর প্রিয়ভাজন হন তা নন তিনি সংসারার্ণব অতি সহজেই অতিক্রান্ত হন। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, লোভ-অহংকারাদি থেকে মুক্তি, দেবতা-অতিথি ও মৃত পূর্বপুরুষদের সৎকারের দ্বারা পুনর্জন্মের নিরোধ হয়।[১৮]

মানুষের আচরিতব্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর দেবী পৃথিবী বিষ্ণুকে ব্যক্তির আত্যন্তিক মুক্তিলাভের জন্য পালনীয় ধর্মীয় আচার সম্পর্কে বিশদে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করেন। বিষ্ণু বলেন, যদি দূর থেকে কোন অতিথি-অভ্যাগত গৃহে উপস্থিত হন তাহলে কোন না কোনভাবে খাদ্যবস্তু তাঁর সাথে ভাগ করে নিতে হবে-

‘অতিথিং চাগতং দৃষ্ট্বা দূরাধ্বনগতং তথা।

সম্বিভাগস্তু কর্তব্যো যেন কেন চ পুত্রকঃ।।’[১৯]

খাদ্যগ্রহণের আগে 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' সম্পাদন অপরিহার্য ছিল, ব্যাধকন্যা অর্জুনকীর উপাখ্যানে তা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দেবতা-অতিথি প্রভৃতিকে নিবেদন না করে যে ব্যক্তি অন্নগ্রহণ করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করেন-

'মন্তব্যা দাতৃভোক্তৃণাং মহামাংসং তু তৎ স্মৃতম্।'[২০]

পঞ্চমহাযজ্ঞের যথার্থতা সম্পর্কে আর্য গৃহস্থদের প্রভাবিত করার জন্য নানা উপমা পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গৃহস্থ ও বৃক্ষকুলের সাথে সাদৃশ্য প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যাখ্যাত হয় যে, একটি স্থাপনের ধর্মীয় যোগ্যতা নির্দেশ করার সময় বরাহ গাছেদের কথা বলেন যারা নিরন্তর পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনরত। অগ্নিহোত্র যাগের জন্য সমিধ বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত হয় এবং বৃক্ষকুল তাদের ছায়ায় পরিভ্রমণকারীদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আশ্রয় দেয়, পাখীরা গৃহ নির্মাণ করে বৃক্ষে। বৃক্ষের বাকল-পাতা ইত্যাদি থেকে নির্মিত ওষুধ পীড়িতজনের সেবায় ব্যবহৃত হয় এভাবে বৃক্ষও মনুষ্যকুলের মত অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদনের সাথে সাথে অতিথিযজ্ঞে সামিল হয়-

'ইন্ধনার্থং যদানীন্তম্ অগ্নিহোত্রং তদুচ্যতে।

ছায়া-বিশ্রাম-পথিকৈঃ পক্ষিণাং নিলয়েন চ।।

পত্রমূলত্যাগাদিংশ্চ ওষধার্থং তু দেহিনাম্।

উপকুর্বন্তি বৃক্ষস্য পঞ্চযজ্ঞস্তদুচ্যতে।।'[২১]

বরাহপুরাণে শুকোদর ও গোকর্ণের উপাখ্যানে আতিথেয়পরায়ণতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে- বিপথগামীতার কারণে বামদেবের শিষ্য তোতাপাখিতে পরিণত হন। এক শিকারীর দ্বারা ধরা পড়ে তোতাপাখিটি খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় মথুরা পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে সেখানে গোকর্ণ উপস্থিত হন। বণিকরূপী গোকর্ণকে আতিথেয়তা প্রদান করার জন্য পাখিটি ঐ

শিকারী ও তার স্ত্রীকে অনুরোধ করেন। তোতাপাখিটি এই মর্মে আতিথেয়তা সম্পর্কিত অনেক মহৎ তত্ত্ব উপস্থাপন করে। অতিথিকে আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃত গৃহস্থের পিতামাতার নরকপ্রাপ্তি হয় আর যেখানে গৃহস্বামী অতিথির প্রতি সম্মানজনক আচরণপূর্বক আতিথ্য দেন সেই গৃহকর্তার পিতা-মাতা তথা পূর্বপুরুষেরা সর্বকালের জন্য সসম্মান স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী হন।[২২] যে গৃহকর্তা অতিথির প্রার্থিত উপহার প্রদান করেন না, তিনি অতিথির পাপার্জন করে নরকে পতিত হন।[২৩] তাই অতিথিকে গৃহস্থ সর্বোচ্চ সম্মান দ্বারা অতিথিসেবা করবেন; এমনকি তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হোন বা না হোন, কারণ অতিথি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর মত সম্মানীয়।[২৪]

মৎস্যপুরাণ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারে মৎস্যপুরাণ মহত্ত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রাপ্ত সংস্করণে ২৯১ টি অধ্যায়ে প্রায় ১৪০০০ শ্লোক পাওয়া যায়। একজন আদর্শ গৃহস্থের আবশ্যিক গুণাবলীর বিশ্লেষণে অতিথিসেবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অষ্টক প্রভৃতি ঋষিদের সাথে সংসর্গ করার সময় যযাতিকে প্রশ্ন করা হয় স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে স্থান পাওয়ার জন্য একজন গৃহকর্তার কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? এর উত্তরে যযাতি আদর্শ গৃহস্থের লক্ষণ হিসেবে উপস্থাপিত করেন-

‘ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত দদ্যাৎ সদৈবাতিথিন্ ভোজয়েচ্চ।

অনাদানশ্চ পরৈরদত্তম্ সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণানি।।’[২৫]

মহর্ষি পুরু রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হলে যযাতি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করেন। বানপ্রস্থী যযাতি বনে থাকাকালীন বনজ ফল ও ভেষজ দ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি নিয়মিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি সম্পাদন করতেন, দেবতা ও মৃত পূর্বপুরুষদের অভ্যর্চনা করতেন।

যযাতি তাঁর অতিথিদের বনজ ফল দিয়ে আপ্যায়ন করতেন এবং নিজে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কালাতিপাতের নিদর্শন রেখেছিলেন।[২৬]

অতিথিসৎকারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের রীতি ছিল সর্বব্যাপক। যখন যযাতি নিজের কঠোর তপস্যার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন তখন তিনি স্বর্গচ্যূত হন। ঋষি অষ্টক তাঁর এই পতন লক্ষ্য করেন ও তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, অতিথি হিসেবে পৃথিবীতে আগত হওয়ার কারণে যযাতি সর্বোত্তম আতিথ্য পাবেন। কারণ অগ্নি হলেন তাপ প্রদানের প্রভু, পৃথিবী হল সমস্ত ঊর্বর বস্তুর প্রভু, সূর্য জাজ্বল্যমানতার কারণে প্রভু এবং সমস্ত সদ্ব্যক্তির প্রভু হলেন অতিথি-

'প্রভুরগ্নিঃ প্রতপনে ভূমিরাবপনে প্রভুঃ।

প্রভুঃ সূর্যঃ প্রকাশাচ্চ সতং চাভ্যাগতো প্রভুঃ।।'[২৭]

বেশিরভাগ পুরাণগ্রন্থের অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে রাজা, ঋষি এবং তপস্বীরা তাঁদের সমকক্ষদের দ্বারা আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কখন কখনও রাজারা ঋষিদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছেন। মৎস্যপুরাণে নারদ রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করার জন্য যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন রাক্ষসরাজ বাণ নারদের উপযুক্ত অতিথিসৎকার করেন।[২৮]

ইন্দ্রের অনুরোধে নারদ হিমালয়ের কাছে যান শিবের সাথে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। হিমালয় ঋষি নারদকে সম্ভাষণপূর্বক দ্বারে অভিবাদন জানান। এরপর নারদকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণ সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন। নারদ আসন গ্রহণ করলে হিমালয় অর্ঘ্যপ্রদান করে নারদের অভ্যর্চনা করেন ও পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল প্রদান করেন। ঋষি নারদ হিমালয়ের সৌজন্যপূর্ণ আতিথেয়তা সাদরে গ্রহণ করেন।[২৯]

কূর্মপুরাণ

কূর্মপুরাণে বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই অবতারে ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রমন্থনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে এই পুরাণে চারটি সংহিতা ছিল- ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী এবং বৈষ্ণবী। কিন্তু বর্তমানে কেবল ব্রাহ্মীসংহিতা উপলব্ধ হয়। পুরাণটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ৫১ টি ও দ্বিতীয় ভাগে ৪৪ টি অধ্যায় আছে। এই পুরাণের মোট শ্লোকসংখ্যা ৬ হাজার। দ্বিতীয় ভাগে তিন উচ্চবর্ণের কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে কূর্ম বর্ণনা করেছেন, একজন গৃহস্থের সর্বদা অতিথিপরায়ণ হওয়া উচিত। বচন, কর্ম ও চিন্তনের দ্বারা একজন প্রার্থিত অতিথির অপেক্ষা করা উচিত সন্তুষ্টচিত্তে। ব্রাহ্মণ অতিথিকে 'হন্তকার' (অতিথিকে উপস্থাপিত নৈবেদ্য) দ্বারা অভ্যর্থনা করতে হয় এবং সামর্থ্যানুযায়ী ভিক্ষা প্রদান করতে হয়; অতিথিকে দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত- 'নিত্যং বুধ্যেত পরমেশ্বরম্'।[৩০] গৃহকর্তা গোদোহন কাল পর্যন্ত অতিথির জন্য অপেক্ষা করবেন। গৃহস্থের সামর্থ্যানুযায়ী উপস্থিত অনামন্ত্রিত ব্যক্তিদের অতিথিজ্ঞানে সেবা করবেন। গৃহস্থের উচিত নিয়মানুযায়ী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দান করা, লোভমুক্ত নিঃস্বার্থ হয়ে তাঁর যোগ্যতানুসারে ভিক্ষুকদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা। যদি কেউ না আসে অতিথি ও ভিক্ষুকদের জন্য রাখা খাদ্য গরুকে প্রদান করতে হয় এবং নিজের জন্য রাখা আহার্য বস্তু পরিবারের সদস্যদের সাথে গ্রহণ করতে হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে নিজের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন তিনি মূর্খ ও পশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

অতিথির আপ্যায়ন গৃহীর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, বানপ্রস্থীদেরও অতিথিসৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে-

'পূজয়িত্বাঽতিথিং নিত্যং স্নাত্বা চাভ্যর্চয়েৎ সুরান্।

গৃহাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদ্ অস্তৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ।।'[৩১]

ঋষি ব্যাস কূর্মপুরাণের দ্বিতীয়খণ্ডে ব্রাহ্মণদের জীবন ও আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার সময় উত্থাপন করেন অগ্নি ব্রাহ্মণদের গুরু, ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের গুরু, স্বামী হলেন তাঁর স্ত্রীর একমাত্র গুরু আর একজন অতিথি হলেন সকলের গুরু-

'গুরুরগ্নির্দ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রিণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।।'[৩২]

বৈশ্বদেবকালের পরে এবং সকলের খাদ্যগ্রহণের পরেও যদি কোন অতিথি আসেন তাহলে সেই অতিথির সেবার জন্য গৃহস্থকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে আহার্য সংগ্রহ করে অতিথিসৎকার করতে হয়। সকলের গুরুস্থানীয় অতিথি গৃহে উপস্থিত হলে গৃহস্বামীকে সকলের কাছ থেকে উপঢৌকন নিতে হয় কিন্তু সেগুলি তিনি নিজ উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করতে পারেন না, আতিথেয়তা প্রদানের জন্য প্রয়োগ করতে হয়।[৩৩]

এই পুরাণের প্রথমভাগে শমকুকর্ণের আখ্যানে আতিথেয়তার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তপস্বী শমকুকর্ণ ভূতজন্মের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- বিগত জন্মে তিনি ধনসম্পদশালী, বংশজ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কোন পূণ্যকর্ম করেননি। তিনি কখনও দেবতা, গরু বা অতিথির সেবা করেননি। তাই তিনি ভূত হয়ে জন্মেছেন-

'ন পূজিতা ময়া দেবা গাবোদ্যতিথয়স্তথা।'[৩৪]

বায়ুপুরাণ

বায়ুপুরাণকে শিবপুরাণও বলা হয়। কারণ এই পুরাণে প্রধানতঃ শিবোপাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। মহাভারত এবং হরিবংশে বায়ুপুরাণের উল্লেখ আছে।

যে কেবলমাত্র আত্মনিমিত্ত পাকক্রিয়া করে এবং যে কখনও দেবতা ও অতিথিসৎকার করে না বা এদের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করে না, এই দুই শ্রেণীর মানুষই অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং এদের 'ব্রহ্মরাক্ষস' নামে অভিহিত করা হয়।[৩৫]

লিঙ্গপুরাণ

লিঙ্গপুরাণে শিবোপাসনার বিবিধরূপ ও শিবলিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণটি ১৬৩ টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এগারো হাজার শ্লোক সমন্বিত। পুরাণটির দুটি ভাগ- পূর্ব ও উত্তর।

অতিথির সাথে সম্যক আচরণের নির্দেশিকা ব্যক্ত হয়েছে এই পুরাণে। ঋষি পত্নীদের অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গে বিশদে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রহ্মা অতিথিদের সাথে ব্যবহারের যথাযথ দিকটি তুলে ধরেছেন। গৃহে আগত অতিথিরা যদি বিকৃত, অপরিচ্ছন্ন এবং জ্ঞানরহিত অশিক্ষিতও হন তাহলেও গৃহস্থ তাঁদের প্রতি সেবাপরাণতা প্রদর্শনে কোন অবহেলা করবেন না। কারণ অতিথিদের আরাধনা ও অভ্যর্থনা ব্যতীত এই জগতে গৃহস্থদের আত্মপ্রার্থনা ও আত্মশোধনের অন্য কোন উপায় নেই।[৩৬]

বামনপুরাণ

এই পুরাণে বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বামনপুরাণে রয়েছে ৯৫ টি অধ্যায় ও দশহাজার শ্লোক। বামনাবতারের বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণ রচয়িতা অতিথিসৎকারের বিষয় আলোচনা করেছেন।

অসুর সুকেশিনের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি ব্যাখ্যা করেন গৃহস্বামী যদি দেবতা ও অতিথিদের নিবেদন না করে খাদ্যগ্রহণ করেন তিনি অত্যন্ত নিন্দনীয় হন। এই ধরনের গৃহস্থ যে খাদ্যগ্রহণ করেন তা রক্ত ও পুঁজের ন্যায় নোংরা তরল। তাঁরা সর্বদা সূচীমুখ, বৃহদাকার এবং চিরক্ষুধার্ত হন। অতিথিসেবা না করলে নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী-

‘দেবতাঽতিথিভূতেষু ভৃত্যেষ্বভ্যাগতেষু চ।

অভুক্তবৎসু যেঽশ্নন্তি বালপিত্রাগ্নিমাতৃষু।।

......পতন্তি যন্ত্রপীড়ে তে তাড্যমানাস্তু কিংকরৈঃ।।’[৩৭]

মানবজীবনের অন্যান্য কর্তব্যাদি সমাধার সাথে সাথে যদি অতিথিপরায়ণাতা না থাকে তাহলে তাকে ‘চণ্ডাল’ বলে অভিহিত করা হয়েছে-

‘আশার্তানামদাতা চ দাতুশ্চ প্রতিষেধকঃ।

শরণাগতং যস্ত্যজতি স চণ্ডালোঽধমো নরঃ।।’[৩৮]

বামনপুরাণে এও উক্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথিদের সম্মান করতে অভ্যস্ত নয় সে সমাজে অপাংক্তেয় ও ‘ষণ্ড’ পদবাচ্য।[৩৯]

অগ্নিপুরাণ

বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের জন্য অগ্নিপুরাণ পুরাণ সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৫০০০। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় এই পুরাণে উপলভ্য হয় বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অতিথিসেবার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সদাচার সম্পর্কে এখানে আলোচনা রয়েছে।

মহাভারতে বানপ্রস্থীদের জন্য আতিথেয়তা এক সদ্গুণের অন্তর্ভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুরাণসাহিত্যগুলিতে তথা অগ্নিপুরাণে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পৌত্রের জন্ম দেখে গৃহীকে বাণপ্রস্থাশ্রমে ব্রতী হতে হয়। বাণপ্রস্থীদের জীবনাচারের মৌলিকতা হল দেবপূজন ও অতিথি- অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা– ‘দেবাঽতিথিনাং পূজা’।[৪০]

নারদীয়পুরাণ

নারদীয় পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত। এইটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত- পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্ব খণ্ডে ১২৫ টি ও উত্তরখণ্ডে ৮২ টি অধ্যায় আছে। এর শ্লোকসংখ্যা প্রায় আঠারো হাজার। নারদ মহাপুরাণ ও নারদ উপপুরাণ দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। নারদীয় মহাপুরাণে নারদ বিষ্ণুভক্তিকে মোক্ষলাভের উপায় বলে বর্ণনা করেছেন; এই বিষ্ণুভক্তি প্রদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অতিথিপরায়ণতার প্রসঙ্গটি বিধৃত হয়েছে।

ব্যাসদেবের পুত্র শুক ভাগবত অধ্যয়নে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হননি। পিতার নির্দেশে তিনি মিথিলাধিপতি জনকের কাছে যান। এই প্রসঙ্গে জনক ব্রাহ্মণের জীবনের বিভিন্ন আশ্রমের ব্যাখ্যা করেন। বানপ্রস্থাশ্রমের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পুত্র ও পৌত্রের জন্মের পর ব্যক্তি

বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করে। এই আশ্রমে গার্হপত্যাগ্নির ধারাবাহিক অভ্যর্চনাও যথাযথ আতিথ্যের সাথে অতিথিকে স্নেহবশতঃ আপ্যায়ন করা উচিত।[৪১]

ভরদ্বাজ উপাখ্যানে মহর্ষি ভৃগু গৃহস্থের ঐতিহ্যগত কর্তব্যগুলির ব্যাখ্যানে অতিথিকে হতাশ করার ভয়ঙ্কর পরিণতি নির্দেশ করেছেন যদি কোন অতিথি হতাশ হয়ে কারোর গৃহে প্রত্যাখ্যাত হন তাহলে সেই অতিথি গৃহস্বামীকে তাঁর নিজস্ব পাপ দান করেন ও গৃহস্থের অর্জিত সকল পুণ্য সঞ্চয় করেন।[৪২]

পৃথিবী বক্ষে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে আনয়নের জন্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিখ্যাত রাজা ভগীরথ। তপস্যা অনুশীলনের জন্য তিনি হিমালয়ে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে ঋষি ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করেন ও ঋষিদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেন। মহর্ষি ভৃগু তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে আতিথেয়তামূলক অভ্যর্থনা প্রদান করেন।[৪৩]

নারদের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় সনক ঋষি মার্কণ্ডেয়ের জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মার্কেণ্ডেয়কে ভগবান বিষ্ণুর সর্বোত্তম ভক্ত বা 'ভাগবতোত্তমঃ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সর্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণুভক্তের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট আশ্রমের জন্য নির্ধারিত আদেশানুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং শ্রদ্ধার সাথে অতিথিসৎকার কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং বেদার্থ অববোধে কালাতিপাত করেন তিনি আদর্শ বিষ্ণুভক্ত। ভক্তের আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে আতিথ্যগুণ প্রাধান্য পেয়েছে।[৪৪] ভগবান বিষ্ণু অতিথিকে বলেন, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রকৃত ভক্ত যিনি পিতামাতার সেবা করেন, যিনি গুরুসেবায় রত থাকেন। যিনি অতিথিদের সমাদরে গ্রহণ ও সেবা করতে পছন্দ করেন।[৪৫] যাঁরা আর্থিক উৎকোচগ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন, অন্যের বাড়িতে পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না, যাঁরা আর্ত ও অতিথিকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা সেবা করেন তারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

ভক্ত।[৪৬] যে ব্যক্তি নিবেদিতপ্রাণে একজন অনাহূত এবং অপ্রত্যাশিত অতিথির পদসেবা করেন সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় যোগ্যতা অনেক বেশি হয় তার থেকে যে ব্যক্তি গঙ্গা সহ অন্যান্য পুণ্যসলিলা নদীতে অবগাহন করেন।[৪৭]

মার্কণ্ডেয়পুরাণ

মার্কণ্ডেয়পুরাণ কর্মমীমাংসার মত গার্হস্থ্যধর্মকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই পুরাণানুসারে গার্হস্থ্যধর্মের ভিত্তি হলো পঞ্চমহাযজ্ঞ। মদালসা-অলর্কের উপাখ্যানে মদালসা পুত্র অলর্ককে গার্হস্থ্যধর্ম সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেন- গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করে জগতের সমস্ত জীবন পরিপুষ্ট হয়। বিশ্বচরাচরের সকলে গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করেই জীবন নির্বাহ করে। গৃহস্থের অন্নের দিকে চেয়ে সকলে জীবন কাটায়, তাই গৃহস্থের প্রতি সকলের প্রত্যাশা রয়েছে। গৃহস্থই বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধার– ‘পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব’।[৪৮] পঞ্চমহাযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ প্রসঙ্গে অতিথিসেবা প্রাধান্য পেয়েছে ।

ভাগবতপুরাণ

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ভাগবতপুরাণ সর্বাধিক জনপ্রিয়। এ পুরাণের কাব্যগুণ অসাধারণ, ভাবের ও রসের মহত্ত্বে এটি অতুলনীয়। ভাগবত দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত; এতে ৩৩৫ টি অধ্যায় আছে ও এর শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। প্রত্যেকটি খণ্ড ‘স্কন্ধ’ নামে অভিহিত। ভাগবতকে মহাগ্রন্থও বলা যায়। এই মহাগ্রন্থ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে অশেষ শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ইতিহাসে এই গ্রন্থের স্থান উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্মসূত্র, বিশালকায় মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণসমূহ রচনা করার পরে ভাগবতপুরাণ রচনা করেন। সুতরাং ব্যাসদেবের সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা, তপস্যা ও উপলব্ধির সার নির্যাস

ভাগবত-রূপ অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়েছে এক অপূর্ব পরিকল্পনায়। পুরাণ গ্রন্থটিতে ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের চমৎকারক মেলবন্ধন ঘটেছে। ভাগবতপুরাণের মূল উদ্দেশ্য হল ভগবানে তথা আপামর জীবের প্রতি সেবা ও ভক্তির দ্বারা মুক্তি লাভ। সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসায় খুব স্বাভাবিকভাবেই অতিথিসেবার বিষয়টি পুরাণগ্রন্থটিতে বহুল চর্চিত ও আপতিত প্রসঙ্গ।

ভাগবতপুরাণে বর্ণিত হয়েছে অতিথি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক জ্ঞান ও অতিথিসেবার সদিচ্ছায় যার প্রতিফলন মাঘের 'শিশুপালবধম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে উপলভ্য। পুরাণের বহু অংশে অতিথিসেবার মহনীয় দিকটি আলোচিত হয়েছে। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে রোমহর্ষণের পুত্র সূতকে বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকারী ঋষি শৌনকদের আপ্যায়নরীতি প্রশংসনীয়।

কংসের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ ও বলরাম মাতাপিতাকে মুক্ত করতে না পেরে তাঁদের দুঃখের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ একজন গৃহকর্তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো পুরুষ তার বৃদ্ধ পিতামাতা, গুণী স্ত্রী, শিশু পুত্র, গুরু ও অতিথিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়; তবে তাকে মৃত বলে বিবেচনা করা হয়।[৪৯]

দেবতা ও অতিথি ইত্যাদিকে নিবেদন না করে খাবার গ্রহণের নেতিবাচক ফল সম্পর্কে ভাগবতপুরাণে কিংবদন্তি রয়েছে। বৃহস্পতি ছিলেন দেবগুরু। দেবতাদের প্রধান ইন্দ্র ছিলেন তিন জগতের অধিপতি। এই অসীম ক্ষমতার কারণে তিনি অহংকারী হয়ে ওঠেন। একদা দেবসভায় সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ইন্দ্র যখন সিংহাসনে আসীন সেইসময় সমস্ত সিদ্ধপুরুষ, চারণ, গন্ধর্ব এবং ঋষিরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময়

গুরু বৃহস্পতি দেবসভায় উপস্থিত হলে ইন্দ্র তাঁর প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে নূন্যতম আতিথেয়তা করলেন না। অতিথি বৃহস্পতি অপমানিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপরে অসুরদের কাছে পরাজিত হলে ইন্দ্র বুঝতে পারেন যে তাঁর এই পরাজয়ের কারণ হল অতিথিরূপী বৃহস্পতিকে অভ্যর্থনা না করা।[৫০]

ঋষি ব্যাসদেবের পুত্র শুক রাজা পরীক্ষিতকে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'কৃমিভোজন' নামক নরকের উল্লেখ করেন, এই নরকটি ছিল এক লক্ষ যোজন বিস্তারে পরিব্যাপ্ত ও কৃমিতে পূর্ণ এক জলাশয়। এই নরকে তাঁরাই মৃত্যুর পরে স্থান পেতেন যাঁরা, নিজের আহার্য অপরের সাথে ভাগ করে খেতেন না ও গৃহস্থের উপযোগী পঞ্চমহাযজ্ঞের পরিপালন করতেন না। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাধা না করে যিনি খাদ্য গ্রহণ করেন তাঁর জীবন কাকের তুল্য; মৃত্যুর পর তিনি কীট হয়ে এই নরকে স্থান পান এবং জলাশয়টি যত যোজন বিস্তৃত তত বছর ধরে তিনি এই নরক ভোগ করেন।[৫১]

রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়া থেকে ফেরার পথে কণ্ব ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করেন ও কণ্ব তখন কন্যার দুর্দৈব প্রশমনের জন্য সোমতীর্থে গেছিলেন তাই কণ্বের অনুপস্থিতে তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিয়ে দুষ্যন্তের আতিথ্য করেন। তিনি রাজাকে বসার আসন, বনজ নীবার ধান্য গ্রহণ করতে বলেন এবং দুষ্যন্ত যতদিন চান ততদিন আশ্রমে থাকতে অনুরোধ করেন।[৫২]

একদা মহান পরোপকারী রাজা পৃথুর বাসভবনে দিব্যজ্ঞানী সনক ও তাঁর তিন ভ্রাতা গমন করেন। তাঁদের দেখে পৃথু তাঁর সভাসদদের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ঋষিদের অভিবাদন জানান। ঋষিরা আপন আপন আসন গ্রহণ করলে রাজা পৃথু বিনয়পূর্বক অধোবদনে যথাযথ

অনুষ্ঠানিকতার সাথে তাঁদের পূজা করেন ও তারপর রাজা ঋষিদের পা ধোওয়ার জলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে মস্তকে ছেটান।[৫৩]

পূজ্যপাদ ঋষি অঙ্গিরস শূরসেন দেশের রাজা চিত্রকেতুর প্রাসাদে আসেন। ঋষির আগমনে চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ নিজের আসন থেকে উঠে ঋষিকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রদান করে যথার্থ সম্মান জ্ঞাপন করেন। এরপর ঋষি আপন আসনে উপবিষ্ট হলে চিত্রকেতুও তাঁর আসন গ্রহণ করেন।[৫৪]

মহামতি অক্রুর ব্রজে উপস্থিত হলে অক্রুরের প্রতি অভিনব আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। তাঁদেরকে দেখে অতি সত্বর রথ থেকে নেমে অক্রুর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। কৃষ্ণের বাসভবনে পৌঁছালে বলরাম অক্রুরের পা ধুইয়ে তাঁকে মধুপর্ক নামক নৈবেদ্য প্রদান করেন। কৃষ্ণ একটি গরু অতিথিকে প্রদান করেন ও ক্লান্ত-শ্রান্ত অক্রুরের পদসেবা করেন।[৫৫] মথুরায় অক্রুর সমাগত হলে সেখানেও তিনি এক চমৎকার আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৫৬]

দ্বারকায় যখন নারদ প্রবেশ করেন সেসময় কৃষ্ণ রুক্মিণীর সাথে বসেছিলেন। ঋষিকে দেখে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ান ও ঋষিকে ভক্তিভরে প্রণতি জানান। নারদের ব্যবহৃত পাদ্য কৃষ্ণ মাথায় ধারণ করেন। অতি কোমল স্বরে নারদকে আর কিভাবে সেবাপ্রদান করবেন জানতে চান।[৫৭]

বাল্যবন্ধু সুদামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য সর্বজনবিদিত। সুদামা যখন কৃষ্ণের প্রাসাদে প্রবেশ করেন তখন পত্নী রুক্মিণীর সাথে শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুদামাকে দেখে চরম আনন্দে অভিভূত হয়ে সুদামাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন ও নিজের সিংহাসনে বসান।

সখা সুদামার প্রতি আতিথেয়তার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে পাদ্য-অর্ঘ্যাদির আয়োজন করেন, পরম যত্নে সুদামার পা ধুয়ে দিয়ে সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করেন। অতিথির শরীরে চন্দনের প্রলেপ দেন ও সুগন্ধি, আলোকমালা দিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে সুদামাকে পান ও গাভী প্রদান করেন। অতিথি সুদামার প্রতি উৎকৃষ্ট আতিথেয়তা জ্ঞাপন করে দুই সখা নিজেদের মধ্যে বাল্যকালের মধুর স্মৃতিচারণায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণের সহধর্মিনী রুক্মিণী অতিথির সেবার জন্য ব্যজন দোলায়িত করতে থাকেন।[৫৮]

মাতার আদেশে কৃষ্ণ ও বলরাম দৈত্যরাজ বলির রাজ্যে যান। কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে বলি তাঁর সিংহাসন পরিত্যাগ করে উঠে আসেন এবং সানন্দে, সপরিবারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। আনন্দিত বলি অতিথিদের আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। উভয়ে আসনোপবিষ্ট হলে বলি তাঁদের পা ধৌত করেন ও সেই জল শ্রদ্ধাভারে মাথায় নেন। তারপর বলি মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনের বিলেপন, পান ইত্যাদি সহযোগে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। শুধু তাই নয় বলি তাঁর পরিবার, সকল সম্পদ এমনকি নিজের আত্মাও অতিথিদের সমর্পণ করেন।[৫৯]

অতিথিসেবার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ভাগবতপুরাণে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই পুরাণের চতুর্থ[৬০], ষষ্ঠ[৬১], সপ্তম[৬২], অষ্টম[৬৩], নবম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে নানা কাহিনীর মাধ্যমে অতিথিপরায়ণতার বর্ণনা করা হয়েছে। অতিথিসৎকারের সবচেয়ে বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় এই পুরাণের দশম স্কন্ধে।

পুরাণের লোকশ্রুতিতে আমরা অতিথি সৎকারের নিদর্শন পাই নানা আখ্যানের মাধ্যমে। এরকম একটি আখ্যান হল মহর্ষি মুদ্গলের কথা। তিনি শিলোঞ্ছবৃত্তির পরিপালন করতেন। শস্যক্ষেত্র থেকে শস্য আহরণের পর বা খাদ্যদ্রব্যের বিপণি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্নকণা বা খাদ্যকণা সংগ্রহ ক'রে ঐ একত্রিত খাদ্যকণাগুলিকে বেছে পরিষ্কার করে গুঁড়ো করে জমিয়ে রেখে আপন ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রশমন করতেন। ঋষি এবং তাঁর পরিবার কেবলমাত্র পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে ঐ অতিসামান্য খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ভোজন করতেন। এক অমাবস্যা তিথিতে ঋষির কুটিরে উপস্থিত হন মহর্ষি দুর্বাসা। মৃদ্গলমুনি তাঁর চরণ ধৌত করে আসন প্রদান করেন। পূজার্হ দুর্বাসার বন্দনাদি সমাধা করে তাঁকে ভোজন গ্রহণের প্রার্থনা জানান। দুর্বাসা অতিথি সৎকারের জন্য নিবেদিত সকল অন্নগ্রহণ করে প্রস্থান করেন। মৃদ্গল এবং তাঁর পরিবার অভুক্ত থেকে আগামী ভোজনপর্বের প্রতীক্ষায় থাকেন। ঋষির অতিথিসৎকারের জন্য মৃদ্গালের নিবেদিত ঐ সামান্য ছাতুর স্বাদ অত্যন্ত ভালো লাগে দুর্বাসার, তাই তিনি পরপর নিরবচ্ছিন্নভাবে ছটি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মৃদ্গালের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এদিকে মৃদ্গল সহ তাঁর পরিবার টানা তিনমাস অভুক্ত থাকেন। আতিথ্য প্রদানের এই চমৎকারিত্ব এবং কর্তব্যপালনের প্রতি মহানুভবতা দেখে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের স্বর্গে আনয়নের জন্য বিমানসহ দেবদূতকে প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁরা স্বর্গপ্রাপ্তিতে প্রত্যাশী ছিলেন না; তাই স্বর্গকে অতৃপ্তি, অসন্তোষ প্রভৃতি দুর্গুণযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করে স্বর্গ যেতে অস্বীকার করেন। তাঁদের এই নির্লোভতা, মানবিক উৎকর্ষতা প্রতিপাদনের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ মোক্ষ বা আত্যন্তিক মুক্তির মাধ্যমে তাঁরা পরমপদ প্রাপ্ত হন।

পুরাণের গল্পে রাজা শিবির আতিথেয়তার আখ্যান সর্বজনবিদিত। রাজা শিবি আপন শরীরের মাংস দ্বারা অতিথি সৎকারের উদাহরণ প্রতিস্থাপন করেছিলেন। শিবি ছিলেন রাজা যযাতির পৌত্র তথা রাজা উশানীর এবং রানী দৃষদ্বতীর পুত্র। একদা ইন্দ্র বাজ এবং অগ্নিদেব কপোতের রূপ ধরে শিবির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। কপোতরূপী অগ্নি শিবির আশ্রিত হলে রাজপক্ষীরূপী ইন্দ্রের ক্ষুধা প্রশমিত করার জন্য শিবি ধর্মসংকটে পড়েন। তখন তিনি

কপোতের প্রাণরক্ষা ও বাজের বুভুক্ষা নিবৃত্তির জন্য কপোতের ওজনের সম ওজনযুক্ত নিজ শরীরের মাংস প্রদানের জন্য উদ্যত হন। কিন্তু যখন তিনি কপোতের ওজনের সমান ওজনের নিজের মাংস কেটে কেটে দাঁড়িপাল্লায় রাখছিলেন তখন কপোতের দিকে পাল্লাটি ক্রমশঃ ভারী হতে শুরু করে, তখন রাজা শিবি তাঁর সমগ্র শরীরকে সমর্পণ করেন। শিবির এই সমর্পণভাবের প্রতি অতি প্রসন্নতায় ইন্দ্র তাঁকে মোক্ষ প্রাপ্তির বর প্রদান করেন।

আতিথেয়তার গুণাবলী পুরাণ সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে। নানা আঙ্গিকে এই দৃষ্টান্তগুলি মানুষকে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিথি সেবার মত অমূল্য শিষ্টাচার পালনে প্রোৎসাহী করেছে।

তথ্যপঞ্জি

১. অথর্ববেদ ১১/৭/২৪

২. ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৭/১/২

৩. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২/৪/১০

৪. মহাভারত ১/১/৬

৫. ঐ ১/১/১২৯

৬. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/১০

৭. দেবীভাগবতপুরাণ

৮. বিষ্ণুপুরাণ ৩/১৮/৪৬

৯. ঐ ৩/৩/৯-১৭

১০. ঐ ৩/৯/৫৬-৬১

১১. গরুড়পুরাণ ১/৯৬/২১-৫৭

১২. ঐ ১/৯৬/২১-৫৭

১৩. ঐ ১/৪৯/২-৩,৮

১৪. ঐ ১/৯৬/১২

১৫. ঐ ১/২০৫/১৭-১৮

১৬. গরুড়পুরাণ ১/১০২

১৭. বরাহপুরাণ ১১৫/১২,২৯-৩০

১৮. ঐ ১২০/২৫

১৯. ঐ ১২৬/৪০

২০. ঐ ১/৮-৩২

২১. ঐ ১৭০/৩৮-৩৯

২২. ঐ ১৬৭/৪৫

২৩. ঐ ১৬৭/৪৬

২৪. ঐ ১৬৭/৪৭

২৫. মৎস্যপুরাণ ৪০/৩

২৬. ঐ ৩৫/১১-১৭

২৭. ঐ ৩৭/১৩

২৮. ঐ ১৮৭তম অধ্যায়

২৯. ঐ ১৫৪তম অধ্যায়

৩০. কূর্মপুরাণ ২/১৮/১১২-১১৮

৩১. ঐ ২/২৭/৫

৩২. কূর্মপুরাণ ২/১২/৪৮

৩৩. ঐ ২/২৬/৭৫

৩৪. ঐ ১/২১/২২

৩৫. বায়ুপুরাণ ২/১৭/৮০

৩৬. লিঙ্গপুরাণ ১/২৯/৬৩-৬৪

৩৭. বামনপুরাণ ১২/১২-১৩,২৭

৩৮. ঐ ১৫/৩৬

৩৯. ঐ ১৫/২৮

৪০. অগ্নিপুরাণ ১৬০/৩

৪১. নারদীয়পুরাণ ১/৫৯/১৫

৪২. ঐ ১/৪৩/১১৩

৪৩. ঐ ১/১৬/২-১২

৪৪. ঐ ১/৫/৬৭

৪৫. ঐ ১/২/৬০

৪৬. ঐ ১/১১/৬৪

৪৭. ঐ ১/১৩/৭৮

৪৮. মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২৯তম অধ্যায়

৪৯. ভাগবতপুরাণ ১০/৪৪

৫০. ঐ ৬-৭

৫১. ঐ ৩/১৮/৪৬

৫২. ঐ ৯/২০/৮

৫৩. ঐ ৪/২২/১-১৮

৫৪. ঐ ৬/১৪

৫৫. ঐ ১০/৪০

৫৬. ঐ ১০/৩৬/৩০-৩১, ১০/৩৪/২৮-৪০

৫৭. ঐ ১০/৭১/১৯-২২

৫৮. ঐ ১০/৮০/২০-২৩

৫৯. ঐ ১০/৮৫/৩৩-৩৮

৬০. ঐ ৪/১৯/৪১-৪২, ৪/২২/৩-৫

৬১. ঐ ৬/১৪/১৪-১৫

৬২. ঐ ৭/১৪/১১

৬৩. ঐ ৮/৪/৯-১০, ৮/১৬/৬-৭, ৮/১৬/১২, ৮/১৮/২৪-২৭

ইংরেজি 'Epic' শব্দের বাংলা হল মহাকাব্য। Epic শব্দটি আবার গ্রীক 'Epos' শব্দ থেকে সংগঠিত, যার অর্থ শব্দ বা সঙ্গীত। অর্থপ্রসারের ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে বীর্যগাথা বা শৌর্যের কাহিনী। সেই গাথা বা কাহিনীর বাঙ্ময় প্রকাশ হল এপিক বা মহাকাব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এপিককে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- Epic of growth এবং Epic of art; প্রথমটি সাহিত্যিক মহাকাব্য, দ্বিতীয়টি কলাত্মক মহাকাব্য। ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত, গ্রীসের ইলিয়াড-ওডিসি সাহিত্যিক মহাকাব্যের নিদর্শন। ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাসাদির কবিকৃতী দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা। প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য বহু শতাব্দীর বহু ভাবধারায় পুষ্ট, বহু কবির রচনার সুসংহত রূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্য একক কবির প্রয়াসের ফলশ্রুতি।

বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী যুগে ভারতবর্ষের দুই বৃহদায়তন মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে, এদেশের যুগসঞ্চিত প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগকে উপজীব্য করে। কেবল আয়তনে নয়, বিষয়বৈচিত্র্যেও এই মহাকাব্যদ্বয় সুসমৃদ্ধ। সৃষ্টির বিশালতায়, ধর্মের ও দর্শনের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে এই দুই মহাকাব্যে। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি, মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। ঋষি কবিদ্বয় দ্বারা রচিত রামায়ণ ও মহাভারতকে বলা হয় আর্ষ মহাকাব্য। বৈদিক সাহিত্যের ধারা যখন যজ্ঞীয় বিধি-নিষেধের নিয়মতন্ত্রে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত, তখন যজ্ঞীয় দেবভাবনা ও ঔপনিষদিক অধ্যাত্মভাবনার বহিরঙ্গ মানবিক বীরগাথা ও লৌকিক ঘটনাশ্রিত ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান কাহিনী অবলম্বনে নতুন সাহিত্যধারা উন্মোচিত যে সম্ভাবনা, তারই পরিণদ্ধ পরিণতির সার্থক সৃষ্টি আর্ষ এই মহাকাব্যদ্বয়। অতীত যুগের ঠিক কোন্ সময়ে এই দুই মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে তার তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ। বিশেষতঃ এই দুই মহাকাব্যের স্রষ্টা তাঁদের কালজয়ী রচনার মাধ্যমে একটি সমগ্র দেশকে, একটি সমগ্র জাতিকে, একটি সমগ্র যুগকে নিজেদের

অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত করে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তুলেছেন। রামায়ণ-মহাভারত তাই একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য।

যেসব কিংবদন্তি এবং ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছিল, বাল্মীকি এবং ব্যাস তাঁদের অলোকসামান্য প্রতিভা বা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রভাবে সেই সব কিংবদন্তি এবং ঐতিহ্যকে শিল্পসম্মতরূপে গ্রথিত করে মহাকাব্যে রূপায়িত করেছেন; এতেই স্পষ্ট তাঁদের অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রতিভার পরিচয়। ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের কোন অভাব নেই, অভাব নেই ভাবস্রোতেরও; এখানে ঘটেছে অনেক রাজ্যের উত্থান এবং রাজ্যের পতন। ইতিহাস কখনও থেমে থাকে না, ভারতবর্ষেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের আশ্চর্য মোহিনী শক্তি প্রায় আড়াই হাজারের বছরেরও অধিক সময় ধরে সমস্ত ভারতবাসীকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কালের কষ্টিপাথরের যাচঞ্ঞা করা অম্লান এই দুই মহাকাব্য আজও অসংখ্য ভারতীয়দের প্রতিদিনের নিত্যপাঠ ও শ্রবণের বিষয়।

রামায়ণ

রামায়ণের উৎস মহামুনি বাল্মীকির শোকাবিষ্ট হৃদয় বা সকরুণ অন্তঃকরণ। ঋষি কবির তীব্র দুঃখাবেগ রামায়ণে করুণরস রূপে প্রবাহিত হয়েছে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিয়োগে শোকাচ্ছন্ন ঋষি কবির মনের অপরিমেয় বেদনাই শ্লোকছন্দে কাব্যে শাশ্বতরূপ পরিগ্রহ করেছে। রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে একাধারে মহাকাব্য, বীরকাব্য এবং ঐতিহাসিক কাব্যের সকল গুণ সমন্বিত হয়েছে। রামায়ণ মূলতঃ সাহিত্যিক সৃষ্টি। মহাকাব্যটির চিরন্তনত্ব সম্পর্কে ব্রহ্মার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক-

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয় সরিতশ্চ মহীতলে।

তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।'[১]

বাল্মীকি তাঁর আপন মনের মাধুরীতে অভিনব কাব্যজগৎ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কল্পনাশক্তি ও বর্ণন ক্ষমতা অসাধারণ। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল প্রখর। প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের সাথে কবির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই মহাকাব্যে। রামায়ণ-কাহিনীর পটভূমিকা বিশাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মহাকাব্যোচিত। কাব্যতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি, বহুজ্ঞতা, লোকবৃত্তজ্ঞান অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও দেশাচার বিষয়ক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকল গুণের সমাবেশ রামায়ণে প্রতিফলিত। রামায়ণে ভারতবর্ষের চিরন্তন পারিবারিক ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই রামায়ণ মৃত্যুঞ্জয়ী কাব্য। রামায়ণে প্রতিফলিত নানা প্রকার উচ্চাদর্শ আমাদের জীবনের ও সমাজের ধ্রুবতারা। এই মহাকাব্যে বর্ণিত চরিত্র সমূহের নানা নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলী সমাজকল্যাণে বা পরমার্থ প্রাপ্তিতে আদর্শরূপে আজও জনমানবে প্রতিফলিত। এই সামাজিক গুণরাজির মধ্যে আতিথেয়তা বা অতিথিসৎকারের পরম্পরা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে অতিথিসৎকাররূপ শিষ্টাচার সাধনের চরম উদ্যোগ ছিল। আতিথ্যগুণের সমাহার বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে; সেই প্রসঙ্গগুলি রামায়ণের কাণ্ড নির্বিশেষে আলোচিত হল-

রামায়ণের বালকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে আতিথেয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্মীকি একদিন শিষ্য ভরদ্বাজের সাথে অবগাহনের জন্য তমসা নদীতে এসেছিলেন। নদীর তীরে বনের পাশে এক ক্রৌঞ্চ মিথুন বিহার করছিল। সহসা এক ব্যাধ এসে ক্রৌঞ্চটিকে বধ করে। ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত হতে দেখে করুণ স্বরে বিলাপ করতে শুরু করে। এই সকরুণ দৃশ্য

দেখে মহর্ষি বিচলিত হয়ে পড়েন। এই নিষ্ঠুর কর্ম অত্যন্ত অধর্মজনক বিবেচনা করে তিনি ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে সেই ব্যাধকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।'[২]

অবগাহন শেষে আশ্রমে ফিরে আসার পর ঋষি এই শ্লোকটির তাৎপর্য নিয়ে যখন চিন্তাশীল সেইসময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বাল্মীকির সামনে হাজির হন। বাল্মীকি হলেন এক ঋষি এবং ব্রহ্মা হলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা; তাই স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে বাল্মীকি তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ান, করজোড়ে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক প্রণাম করে তাঁর সামনে উপবিষ্ট হন। ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল দেন এবং ব্রহ্মা আসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর বাল্মীকি আপন আসন গ্রহণ করেন।

'আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।

চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্।

বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্যতঃ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ।।'[৩]

রামায়ণের রাজকীয় পরিবেশে প্রচলিত আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত বহু। রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত অভ্যাগত, অপরাপর রাজা এবং রাজপুত্ররা অভ্যর্থিত হতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে বা অন্য কোন কারণে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন ছিল অভূতপূর্ব। অশ্বমেধ যাগ সম্পাদনের সময় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও রাজা দশরথের আলোচনায় আতিথেয়তার কতগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আলোকিত হয়। প্রত্যেক অতিথির থাকার জন্য একটি প্রশস্ত পরিসর নির্মিত হয়, দরিদ্র ও

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। যে সমস্ত শ্রমিক ও কারিগর যজ্ঞীয় বেদী নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সাথে সদয় আচরণ করা আবশ্যক এবং অতিথি হিসেবে রাজ্যের এবং তার বাইরে সকল প্রদেশের লোকজনকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে।[৪] অশ্বমেধ যজ্ঞ সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ নির্দেশ দেন সকলকে যে, কাউকে অসম্মানজনক বা অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ এবং অসম্মান বা অবজ্ঞা সহকারে আতিথ্য প্রদর্শিত হলে পরিণামে আতিথ্য প্রদানকারী ধ্বংস প্রাপ্ত হন। দশরথ খাদ্য ও পানীয় দ্বারা অতিথিসৎকারের সময় বিনয় গুণের প্রাধান্য প্রদর্শন করেন-

'ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ।

অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা।

অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্দাতারং নাত্র সংশয়ঃ।।'[৫]

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাক্ষস বধের জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিতে আসেন অযোধ্যা নগরীতে। দশরথ পরম সৌহার্দ্যের সাথে বিশ্বামিত্রকে স্বাগত জানান। রাজা অর্ঘ্য দ্বারা মহর্ষির আপ্যায়ন করেন। এই অর্ঘ্য প্রদানের নিয়ম প্রাচীন যুগে দেবতা বা পূজনীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করার রীতি ছিল। অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজ্যপূজা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দিক। রাজা প্রজাদের পূজনীয়, এক্ষেত্রে আবার বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের পূজনীয়; তাই পূজনীয় অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত করেছেন পূজনীয়কে। অর্ঘ্য বলতে সাধারণভাবে পূজোপচার বা পূজাসামগ্রীকে বোঝায়। শব্দকল্পদ্রুমে অর্ঘ্য শব্দের অর্থ-

'দুর্বাক্ষতসর্ষপপুষ্পাদিবিরচিতঃ দেবব্রাহ্মণাদিসম্মানার্থঃ পূজোপচারভেদঃ।'

অর্থাৎ দেবতার পূজা ও ব্রাহ্মণদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুর্বা, আতপচাল, সরিষা, ফুল প্রভৃতি সমন্বিত পূজার উপচারকে অর্ঘ্য বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে অর্ঘ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

‘আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধিসর্পিঃ সতন্ডুলম্।

যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।।’[৬]

এছাড়া পুরাণ সাহিত্যে অর্ঘ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-

‘রক্তবিল্বাক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ দধিদুর্বাকুশৈস্তিলৈঃ।

সামান্য সর্বদেবানামর্ঘোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।।’[৭]

বিশ্বামিত্র এই অর্ঘ্য গ্রহণ করে রাজাকে রাজ্যের কল্যাণ, রাজকোষ, শহর, প্রদেশ এবং রাজপরিবারের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে দশরথ ঋষির কুশল-মঙ্গল জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথি এবং আতিথেয়তা প্রদানকারীর একে অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ জিজ্ঞাসা করা উত্তম আতিথ্য প্রদানের নিদর্শন। এক্ষেত্রে সেই উৎকৃষ্ট আতিথ্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়-

‘প্রত্যুজ্জগাম তং হৃষ্টো ব্রাহ্মণমিব বাসবঃ।

তং দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্।।

প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।

স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।।

কুশলং চাব্যয়ং চৈব পর্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।

পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ।।’[৮]

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সাহায্যে বিশ্বামিত্র রাক্ষসদের বধ করেন ও দুই ভাইয়ের সাথে তিনি রাজর্ষি জনকের সাথে দেখা করেন। জনক বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্য দ্বারা বন্দনা করেন এবং যজ্ঞীয় ভূমিতে বিশ্বামিত্রের উপস্থিতিতে যজ্ঞ পরিমণ্ডল পবিত্র হয়ে উঠেছে জানান।

‘অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।

ধন্যোস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ।।’[৯]

একইভাবে বিশ্বামিত্রও রাজার যজ্ঞের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতি-আতিথ্য প্রকাশ করেন।[১০]

রামায়ণে জনকের পুরোহিত শতানন্দ দ্বারা বর্ণিত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পর্ব পাওয়া যায় বালকাণ্ডের ৫২ তম সর্গে। বিশ্বামিত্র ছিলেন পরম পরাক্রমশালী রাজা এবং বিজয়ী বীর। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিচরণ করতে করতে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের সকাশে তাঁর মঙ্গল জানতে চান। তারপর তাঁদের পারস্পরিক অভিবাদন শেষ হলে বশিষ্ঠ রাজা বিশ্বামিত্রকে সসৈন্য আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। বিশ্বামিত্র আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হলে বশিষ্ঠ যজ্ঞীয় গাভী শবলাকে ডেকে পাঠান ও তাকে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদলের আতিথেয়তার জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। বশিষ্ঠের আদেশে শবলা সকলের জন্য পাত্রে নানারকম তৃপ্তিদায়ক খাদ্য উৎপন্ন করে। বিশ্বামিত্র এই আতিথেয়তায় খুব খুশি হন ও শবলাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[১১] আশ্চর্য গাভী শবলার অতিথিসৎকারে তাঁর প্রতি বিশ্বামিত্র প্রলুব্ধ হন ও বলপূর্বক অধিকার করার চেষ্টা

করেন। যদিও এই আখ্যানটির একটি দুঃখজনক পরিসমাপ্তি রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি একজন রাজার প্রতি এক ঋষির অতিথিসৎকারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-

'নানাস্বাদুরসানাং চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ।

ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ।।

সর্বমস্তি সুসন্তুষ্টং হৃষ্টপুষ্ট জনায়ুতম্।

বিশ্বামিত্রবলং রাম বশিষ্ঠেন সুতর্পিতম্।।'[১২]

অযোধ্যাকাণ্ডে অতিথিসৎকারের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। রামায়ণের এই অংশে প্রকৃত অর্থে অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। আতিথেয়তার সাথে 'অনুব্রজ্যা' রীতিটি সৌজন্যমূলক আচরণ। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে আমরা বিভিন্ন দেশের রাজাদের আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ স্বাগত জানানোর রীতি যেমন দেখতে পাই তেমনি ভগ্ন হৃদয়ে বিদায় সম্ভাষণ প্রয়োগের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সীতা ও লক্ষণের সাথে বনবাসে যাত্রাকালে অযোধ্যাবাসীরা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত রামচন্দ্রের রথকে অনুসরণ করেন। এই ক্ষেত্রে যদিও রামচন্দ্র অতিথি ছিলেন না, তবুও বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুব্রজ্যা আচরিত হয়।[১৩] আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বর্ণিত অনুব্রজ্যা এখানে পালিত হয়েছে।[১৪]

বনে বসবাসকালে রামচন্দ্র যখন শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদ রাজ গুহের রাজত্বে প্রবেশ করেন তখন গুহ কর্তৃক রামচন্দ্রের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন এক অত্যুত্তম কাব্যিক আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। রামচন্দ্রের আগমনে গুহ তাঁর বয়স্ক মন্ত্রী ও পারিষদদের সাথে রামচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য অর্ঘ্য ও সুস্বাদু আহার্য নিয়ে উপস্থিত হন-

‘তমার্তঃ সম্পরিষ্যজ্য গুহো রাঘবব্রবীৎ।

যথাঽযোধ্যা তথেয়ং তে রাম কিং করবাণি তে।।

ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্।

ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্।।

অর্ঘ্যং চোপানয়ৎ ক্ষিপ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ।

স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী।।’[১৫]

নিষাদরাজ গুহ হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রকে বলেন, যেমন অযোধ্যা আপনার তেমন এই দেশও আপনার। এমন প্রিয় অতিথি কে পায়? মহাবাহু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি, এই বিশাল দেশ আপনারই। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ, আপনিই প্রভু, আমাদের রাজ্য আপনিই শাসন করুন। আপনার জন্য এইসব ভক্ষ্য পেয়, লেহ্য, উত্তম শয্যা ও অশ্বের খাদ্য আনয়ন করা হয়েছে-

‘বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্ত্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ।

ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ পেয়ং চ লেহ্যং চেদমুপস্থিতম্।।

শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনং চ তে।

এবং ব্রুবাণং তু গুহং রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।।’[১৬]

গুহের এই প্রকার স্বাগত জানানোর অভিপ্রায় থেকে আতিথেয়তা প্রদর্শনের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তরিক পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। রামচন্দ্র ও গুহের আলাপচারিতায় এটাই স্পষ্ট হয় যে বল্কল পরিহিত, ফলমূলপত্রাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, তপস্বীরূপ অতিথি ও অতিথিসৎকারী

দুজনেই ঐতিহ্যগত রীতিনীতি ও আচার অবলম্বন করে অতিথিসেবার মত উৎকৃষ্ট আচরণ পালন করেছেন। সেক্ষেত্রে আহার্যবস্তুর ধরণ যেমনই হোক না কেন আন্তরিকতাই মূল প্রতিপাদ্য।[১৭]

রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে যখন প্রবেশ করেন তখন আত্মপরিচয় প্রদান করে বিনয়পূর্বক ঋষিকে প্রণতি জানান। আতিথেয়তা জ্ঞাপনের জন্য ভরদ্বাজ রামচন্দ্রকে অর্ঘ্য দিয়ে স্বাগত জানান এবং তাঁকে একটি বৃষ, বিভিন্ন ধরনের বনজ ফলমূল, জল ও বিশ্রামের জায়গা প্রদান করেন।[১৮] অতিথির বিনয় ও আতিথেয়তাকারীর আন্তরিকতার দিকটি এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

মাতুলালয় থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ভরত রামচন্দ্রের নির্বাসনের হৃদয়বিদারক সংবাদটি শোনেন। এরপরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন রামচন্দ্রকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার; ঠিক এই কারণেই তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠ ও ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। ভরদ্বাজ আসন থেকে গাত্রোত্থানপূর্বক শিষ্যদের যথাযথ অতিথিসৎকারের আদেশ দেন। বশিষ্ঠকে তাঁর পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল ও আহার্যরূপে ফল প্রদান করা হয়, অতিথিরূপী বশিষ্ঠ অতিথিসৎকারী ভরদ্বাজের মঙ্গল কামনা করেন ও অগ্নিহোত্রাদি যাগ সম্পর্কে জানতে চান-

'বশিষ্ঠমথ দৃষ্টৈ্বব ভরদ্বাজ মহাতপাঃ।

সঞ্চচাহলাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্।।

সমাগম্য বশিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ।

অবুদ্ধ্যয়ত মহাতেজসাস্তুতং দশরথস্য তম্।।

তাভ্যামর্ঘ্যং চ পাদ্যং চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ।

আনুপূর্ব্যাচ্ছ ধর্মজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে।।

বশিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্।

শরীরেঽগ্নিষু বৃক্ষেষু শিষ্যেষু মৃগপক্ষিষু।।'[১৯]

ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে ভরত অশ্ব, গজাদি সম্বলিত সৈন্যদলকে আশ্রমের উপকণ্ঠে রেখে আসেন। আশ্রমিক পরিবেশের নির্জনতা, শান্ত সমাহিত পরিমণ্ডল বজায় রাখা একজন রাজার অবশ্য কর্তব্য - এ বিষয়ে ভরত অবগত ছিলেন। ভরদ্বাজ তপঃ বলে আতিথ্য জ্ঞাপনের জন্য এক অনির্বচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করলে অতিথিসেবা এক অনন্যতা পায়। ভরদ্বাজ ভরত ও তার সেনাবাহিনীকে সৎকারের জন্য বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করেন। ইন্দ্র, বরুণ ও কুবেরকেও নিজের অভিপ্রায়ের কথা মহর্ষি জানান। তাঁদের সকলের সহায়তায় ভরদ্বাজ এমন এক সাড়ম্বর আতিথেয়তার আয়োজন করেন যে তাতে ভরতের সেনাবাহিনী অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে সেখানেই থেকে যাবার প্রস্তাব দেন-

'নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গামিষ্যাম দণ্ডকান্।'[২০]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে ঋষিরা তাঁদের আতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী ছিলেন এবং অতিথিরাও তাঁদের আচরণে শিষ্ট ও বিনয়ভাব প্রদর্শন করতেন।

ভরতকে বিদায় জানানোর পর রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাস করবেন বলে স্থির করেন ও ঋষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হন। এখানে অত্রি ও অনসূয়া রামচন্দ্রদের অতিথিসেবা করেন। রামচন্দ্র ও সীতা পরম শ্রদ্ধায় অত্রি ও অনসূয়াকে নমস্কার জানান। অনসূয়া অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সীতার কাছ থেকে বনবাসকালীন অভিজ্ঞতা ও ক্লেশের অনুভূতি শ্রবণ করেন। অনসূয়া তপস্যার দ্বারা আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সীতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সীতাকে চারটি

জিনিস প্রদান করেন। এই উপহারগুলি হল- একটি সুন্দর মালা, পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধনী। এই উপহারগুলির বিশেষত্ব ছিল যে এগুলি ধারণ করলে ব্যবহারকারী কখনই কলঙ্কিত হবেন না, নিন্দার্হ হবেন না। সীতা সাদরে সেই উপহার ও আশীর্বাণী গ্রহণ করে প্রণাম জানান এবং অনসূয়া বিনিময়ে সীতাকে স্নেহ চুম্বন এঁকে দেন। রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা অত্রির আশ্রমে এই উষ্ণ আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করেন।[২১]

যিনি দয়াবশতঃ গৃহে পায়ের ধুলো দেবেন তাঁকে গৃহ্যসূত্রের রীতিনীতি মেনেই পাদ্য-অর্ঘ্য-মধুপর্ক-আসন দিয়ে সমাদার করা হত। এই নিয়ম যেমন গৃহস্থের ক্ষেত্রে প্রবল তেমনি বনচারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই অরণ্যকাণ্ডে রাবণ যখন ব্রাহ্মণ বেশে বনবাসী সীতার কাছে এসেছিলেন তখন সীতার অতিথিসৎকারের প্রবৃত্তিই পরিলক্ষিত। সীতা রাবণকে বসার আসন ও পাদপ্রক্ষালনের জল প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে রাবণের বেশভূষা ও হস্তে কমণ্ডলু ধারণ দেখে সীতা তাঁকে ব্রাহ্মণ হিসেবে আতিথ্য দেন, আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, হে ঋষি! এখানে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন, আপনার পদাদি ধৌতির জন্য এই জল গ্রহণ করুন। বনজ পণ্য থেকে তৈরী খাদ্য আপনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে; অবাধে আপনি তা উপভোগ করুন। গৃহকর্তা হিসেবে রামচন্দ্র উপস্থিত হলে তাঁর অতিথি-সৎকার তিনিই করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সীতা রাবণকে তাঁদের কুটিরে বিশ্রাম নিতে এবং ইচ্ছা করলে সেখানে বসবাস করতে অনুরোধ করেন-

‘সর্বৈরতিথিসৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী।’[২২]

পারিবারিক জীবনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্ত্রী অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে অতিথিদের প্রতি সীতার আচরণ পঞ্চতন্ত্রের উদ্ধৃতিকে স্মরণ করায়-

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

গৃহং হি গৃহিণীহীনম্ অরণ্যসদৃশং মতম্।।'[২৩]

কিন্তু আতিথেয়তার পরিশীলিত রীতি রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্ঘন ক'রে সীতাকে অপহরণ করার ফলে এই পবিত্র ও মহৎ শিষ্টাচার কলঙ্কিত হয়েছে এক্ষেত্রে।

দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র প্রবেশ করলে বনবাসী তপস্বীরা রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানান-

'অভ্যগচ্ছং স্তদা প্রীতা বৈদেহীং চ যশস্বিনীম্।'[২৪]

দণ্ডকবনে রামচন্দ্রকে একটি কুটিরে রাখা হয়েছিল, যেখানে তপস্বীরা তাঁকে ফলমূল, ফুল ও উদকাদি দ্বারা আতিথেয়তার যথাযথ আচারের সাথে অভ্যর্থনা জানান।[২৫]

দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে রামচন্দ্রেরা প্রখ্যাত ঋষি শরভঙ্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঋষি কঠোর তপশ্চরণের দ্বারা ব্রহ্মলোকে আপন ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করেছিলেন, সেই মর্মে ইন্দ্র তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে আসেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মত সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রিয় অতিথি তাঁর কাছে আসছেন জেনে ঋষি শরভঙ্গ তাঁর ব্রহ্মলোক যাত্রা স্থগিত রাখেন-

'ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্।'[২৬]

ঋষি শরভঙ্গের তপস্যালব্ধ গুণের ফলে তিনি রামচন্দ্রকে দেবলোক বা ব্রহ্মলোকের মত স্বর্গের যে কোন স্থানে স্থাপন করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন কিন্তু নম্র রামচন্দ্র বিনয়পূর্বক তা অস্বীকার করেন ও নিজের ধর্মাচরণের ফলে অর্জিত এবং প্রার্থিত লোকে নিজেকে স্থাপন করার বিনয়

প্রকাশ করেন।[২৭] এরপর রামচন্দ্র যখন ঋষি শরভঙ্গকে রাত্রিযাপনের স্থান কোথায় জানতে চান তখন ঋষি তাঁকে সুতীক্ষ্ণ ঋষির কাছে যেতে বলেন। সেখানে পৌঁছে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে রামচন্দ্র ঋষির নীরবতা ভঙ্গের অনুরোধ জানান। এ কথা শুনে ঋষি তাঁদের মঙ্গল জানতে চান ও সীতা লক্ষ্মণের সাথে তাঁকে তাঁর আশ্রমে বসবাস করতে বলেন। সন্ধ্যার অবসানে রাত্রি সমাগত হলে ঋষি সুতীক্ষ্ণ রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে সাত্ত্বিক আহার্য প্রদানে অতিথিসেবা করেন-

'ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।

তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য।।'[২৮]

প্রখর রৌদ্রে সারাদিন বিচরণ করার পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি অগস্ত্যের ভ্রাতা ইধ্মবাহের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। প্রভাতে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা অগস্ত্যের আশ্রমে গেলে ঋষি অবিলম্বে যথাযথ সম্মানের সাথে তাঁদের নিয়ে আসার আদেশ দেন শিষ্যকে। শিষ্যের সাথে রামচন্দ্রেরা আশ্রমে প্রবেশ করে অগস্ত্যকে নতজানু হয়ে প্রণাম নিবেদন করেন। অগস্ত্য রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক আপ্যায়ন করে পা ধোওয়ার জল ও আসন দেন এবং তার মঙ্গল কামনা করেন। অগস্ত্য আসন গ্রহণ করার পর রামচন্দ্র করজোড়ে আপন স্থান গ্রহণ করেন-

'গম্যতাং সকৃতো রামঃ সভার্যঃ সলক্ষ্মণঃ।'[২৯]

সীতাকে অপহরণের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে রাবণ মারীচের কাছে আসেন। মারীচ তাঁর আশ্রমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিকভাবে রাবণকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাঁকে পা ধোয়ার জল এবং আসন দেন-

'তু স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন।'[৩০]

শুধু তাই নয় এরপর তিনি রাক্ষসোচিত খাদ্য ও পানীয় দিয়ে অতিথিসেবা করেন ও রাক্ষসরাজ রাবণকে তাঁর প্রজাদের মঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন-

'মারীচেনার্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ।'[৩১]

রামায়ণে মারীচের রাবণের প্রতি আতিথেয়তা দুবার দেখা যায়। প্রথমবার মারীচ রামচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা করে রাবণকে নিরস্ত করলেও আবার শূর্পনখার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাবণ পুণরায় মারীচের কাছে আসেন। দ্বিতীয়বার মারীচের আশ্রমে রাবণ উপস্থিত হলে আসন, জল এবং রাক্ষসোচিত সমস্ত রকমের বস্তু উপস্থাপন করে রাবণকে সম্মানিত করেন-

'স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবত্তেন রক্ষসা।

মারীচেনার্চিতো রাজা সর্বকামৈরমানুষৈঃ।।'[৩২]

রামায়ণের যুগে অতিথিসৎকারের ভাবনা এতটাই প্রবল ছিল যে, নির্জন কুটিরে বসে সীতাকে অনাগত অতিথিদের সৎকারের চিন্তায় পূর্বাহ্নেই সিদ্ধ বনজাত অন্ন তৈরী করে রাখতে হত। তাই ব্রাহ্মণবেশী রাবণ এসে উপস্থিত হলে সীতা ব্রাহ্মণসৎকারের সৌভাগ্যে উচ্ছ্সিতা হয়েছেন-

'ইদং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতামিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।

ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্।।'[৩৩]

অরণ্যকাণ্ডে শবরীর উপাখ্যানেও এক অনুপম অতিথিসেবা পরিদৃষ্ট হয়। কিষ্কিন্ধ্যার পথে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র নারী-তপস্বী শবরীর আশ্রমে আসেন। রামচন্দ্রকে স্বাগত জানাতে শবরী উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে প্রণাম জানান। শ্রদ্ধালুচিত্তে হস্তপদাদি ধৌতিকরণের

জন্য জল প্রদান করেন ও মিষ্টবচন প্রয়োগপূর্বক অতিথিদের সেবার জন্য ফল-ফুল নিবেদন করেন। রামচন্দ্র যথার্থ অতিথির সৌজন্য প্রকাশের জন্য তাঁর তপস্যার খোঁজখবর করেন ও শবরীর আন্তরিক আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন। শবরী রামের আশীর্বাদে ও তপস্যার পরিপূর্ণতায় স্বর্গলাভ করেন।[৩৪] রামায়ণ-বিশ্লেষকেরা শবরীর এই আতিথ্য প্রদানকে শুধুমাত্র সংস্কৃতির পরিপালন বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য অর্থাৎ শবরী মুক্তির জন্য রামকে এই আতিথেয়তা দেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তৎকালীন সমাজে আতিথেয়তার চিত্র পরিস্ফূট হয়েছে বিভিন্ন পরিসরে। সীতাকে অন্বেষণ করতে করতে বানরদের প্রধান হনুমান সহ সকল বানরসেনা বিন্ধ্যারণ্যে এসে পৌঁছান। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা একটি গুহায় প্রবেশ করেন ও সেখানে কৃষ্ণাজিন পরিহিত একটি তপস্বী নারী স্বয়ংপ্রভার সাথে দেখা হয়। পাহাড়ী পথে দীর্ঘ ও কঠিন অন্বেষণ যাত্রার ফলে বানরসেনারা শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন। হনুমান তপস্বিনী স্বয়ংপ্রভাকে তাঁদের ক্ষুধা ও ক্লান্তির কথা জানালে স্বয়ংপ্রভা তাঁদের সুস্বাদু ফলমূল ও পানীয় প্রদান করেন। ক্ষুধার্ত-ক্লান্ত হনুমান সহ বানরসেনারা স্বয়ংপ্রভার দেওয়া আহার্য গ্রহণ করে নিজেদের ক্লান্তি অপনোদন করেন এবং সৌজন্যবশে স্বয়ংপ্রভাকে জিজ্ঞেস করেন যে হনুমানেরা তাঁর কোন সাহায্যে আসতে পারেন কিনা? উত্তরে স্বয়ংপ্রভা এক চমৎকার অতিথিসৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বলেন যে অতিথিকে খাদ্য-পানীয় দ্বারা তাঁর সেবা করা মানবিক কর্তব্য, তাই বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে তাঁর কামনার কিছু নেই।[৩৫] বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। বানরসেনারা অজান্তে মৃত্যুমুখী গুহাতে প্রবেশ করলেও স্বয়ংপ্রভা তাঁর তপস্যার বলে অর্জিত গোপন শক্তির সাহায্যে বানরদের সেখানে নিরাপত্তা প্রদান করেন। নিরীহ বানরদের রক্ষা করা অবশ্যই উৎকৃষ্ট আতিথেয়তামূলক কর্ম হিসেবে বিবেচিত।

সুগ্রীব ছিলেন ধার্মিক, তপস্যায় নিবেদিতপ্রাণ এবং সকলের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। হনুমান যখন রাম-লক্ষ্মণের সাথে সুগ্রীবের পরিচয় করিয়ে দেন তখন সুগ্রীব সানন্দে হস্ত প্রসারিত করেন ও রামচন্দ্র সখ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন।[৩৬] অভ্যাগতকে আন্তরিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার রীতি আজও সারা পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত।

সুন্দরকাণ্ডে সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃতির উপর দিয়ে উড্ডীয়মান হনুমানের প্রতি সমুদ্রের আতিথেয়তা প্রদর্শনের পৌরাণিক কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত আতিথেয়তার চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। মহেন্দ্র পর্বত থেকে যাত্রা শুরু করে হনুমান আকাশে উত্থিত হন। এই সময় সমুদ্রদেব তার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হনুমানকে সাহায্য করার কথা ভাবেন। সমুদ্রের অভ্যন্তরে সুবর্ণ মৈনাক পর্বত অবস্থিত ছিল। এই পর্বত বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিল, মৈনাক ইচ্ছেমত নিজেকে প্রসারিত করতে পারত। সমুদ্রদেব মৈনাক পর্বতকে উত্থিত হতে বলেন তার শীর্ষে হনুমান বিশ্রাম গ্রহণ করবেন বলে। মৈনাকের আকস্মিক আবির্ভাব দেখে হনুমান তাকে লঙ্কাযাত্রার অন্তরায় হিসেবে মনে করেন। তিনি দ্রুতগতিতে মৈনাকের চূড়া অতিক্রম করেন। হনুমানের তীব্র গতিবেগ দেখে মৈনাক মানবরূপ ধারণ করেন ও মনুষ্যকণ্ঠে হনুমানকে মৈনাকের ওপর বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন, এও বলেন যে, রঘুর বংশধরেরা সমুদ্রকে প্রসারিত করছেন এবং বানরপ্রধান হনুমান রঘুর সুযোগ্য উত্তরসূরী রামকে সহায়তা করছেন বলে প্রকারান্তরে রামকে সাহায্য করার জন্যই নিচু ছিলেন। তাই সমুদ্রদেব মৈনাকের শিখরে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে হনুমানকে আতিথেয়তা দিতে চেয়েছিলেন। মৈনাকে উৎপন্ন সুস্বাদু ফলমূল দিয়ে হনুমানকে ক্ষুধা নিবৃত্তির অনুরোধ করেন। কিন্তু হনুমান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি শত যোজনের মধ্যে বিশ্রাম নেবেন না, তাই মৈনাকের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তার শিখর স্পর্শ করে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেন।[৩৭]

যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি ভরদ্বাজ ঋষিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর সকাশে উপস্থিত হন। ঋষি ভরদ্বাজ বন-নির্বাসনের প্রাথমিক পর্বে রামচন্দ্রদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতা থেকে রাম আদর্শ রাজার ন্যায় তাঁর কাছে জানতে চান, ভরতের শাসনে সকল প্রজা খুশি কিনা? ভরদ্বাজ রামচন্দ্রকে জানান যে ভরত একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে অতি যত্নের সাথে প্রজাদের রক্ষা করে চলেছেন। অযোধ্যাযাত্রার প্রাক্কালে ঋষি ভরদ্বাজ রামচন্দ্র ও অনুচরদের বিভিন্ন খাদ্য-পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা করেন।[৩৮]

রাবণ যখন অত্যন্ত নিন্দনীয় ভাষায় বিভীষণকে ত্যাগ করেন, তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও অন্যান্যদের বারণকে অগ্রাহ্য করে রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্রয় দেন। একমাত্র হনুমানই রামের সাথে সহমত ছিলেন। রাম আশ্রিতকে রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন-

'মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।

দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতমেতদ্ অগর্হিতং।।'[৩৯]

'বদ্ধাঞ্জলিপুটং দীনং যাচন্তং শরণাগতম্।

ন হন্যাদানৃশংস্যার্থমপি শত্রুং পরন্তপঃ।।

আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।

অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা।।

স চেৎ ভয়াদ্ বা মোহাদ্ কামাদ্বাপি ন রক্ষতি।

স্বয়াশক্ত্যা যথান্যায়ং তৎ পাপং লোকগর্হিতং।।

বিনষ্টঃ পশ্যতস্তস্য রক্ষিণাঃ শরণংগতঃ।

আদায় সুকৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ।।

এবং দোষো মহানত্র প্রপন্নানামরক্ষণে।

অস্বর্গ্যং চায়শস্যং চ বলবীর্যবিনাশনম্।।'[৪০]

একজন ব্যক্তি যদি শত্রুও হয় তাহলেও তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, যদি সে আশ্রয়প্রার্থী হয়। এই প্রসঙ্গে ঘুঘুর গল্পের অবতারণা হয়। একটি ঘুঘু দম্পতির স্ত্রী ঘুঘুটি এক ব্যাধ দ্বারা নিহত হয়। যে গাছে ঐ ঘুঘু দম্পতি বাস করত সেই গাছের নীচেই সেই ব্যাধ আশ্রয় নেয়। পুরুষ ঘুঘুটি এটি জানা সত্ত্বে যে এই ব্যাধটিই তার সঙ্গিনীকে হত্যা করেছে তা ভুলে গিয়ে ব্যাধকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে এবং নিজের মাংস দিয়ে পরিতৃপ্ত করে-

'শ্রূয়েতে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।

অর্চিতশ্চয়থান্যায়ং স্বৈশ্চমাং স্বৈর্নিমন্ত্রিতঃ।।

সহিতং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতঃ।

কপোতোবানরশ্রেষ্ঠঃ কিং পুনর্মদ্বিধোজনঃ।।'[৪১]

আর্য ঐতিহ্যে এটিই ছিল জীবন ব্যবস্থা। সকলের প্রতি প্রেম এবং স্নেহের নীতি দ্বারা পরিচালিত রামচন্দ্র সাদরে বিভীষণকে গ্রহণ করেন। রামায়ণের অন্যান্য প্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে একজন আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু হিসেবে দেখা গেলেও বিভীষণকে আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে রামের পরম আতিথ্যগুণ প্রকটিত হয়। আতিথেয়তার চরম উৎকৃষ্ট গুণাবলী রামের চরিত্রে নিহিত ছিল।

সীতার প্রতি বাল্মীকির অনন্য আতিথেয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে। রামচন্দ্রের আদেশে সীতাকে বনে পরিত্যাগ করা হয়। দুঃখে অভিভূতা, ক্রন্দনরতা সীতার প্রতি অত্যন্ত মিষ্ট ও প্রশান্ত বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করে ঋষি বাল্মীকি তাঁকে কুটিরে আমন্ত্রণ জানান। বাল্মীকি সীতাকে তপস্বিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, এঁরা যত্ন ও স্নেহপূর্বক সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কালের নিয়মেই অন্তঃসত্ত্বা সীতা লব-কুশের জন্ম দেন এবং নবজাতকদের সাথে মাতা সীতার দেখভাল ও লালনপালনের দায়িত্ব বিনা প্রত্যাশাতেই বাল্মীকি ব্যবস্থা করেন। সীতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও তাদের সাচ্ছন্দ্য প্রদানের প্রয়াস বাল্মীকির চমৎকার আতিথ্যগুণের পরিচায়ক।[৪২]

বেদবিধি অনুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে যে পঞ্চমহাযজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত তার প্রভূত উদাহরণ রামায়ণের সমাজজীবনে পাওয়া যায়। নিত্য অতিথিসেবা স্বরূপ নৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভ্যাস সমসাময়িক সমাজে দেখা যায়। রামায়ণের কাহিনী সমূহের বিচার-বিশ্লেষণে রাজা, প্রজা, ঋষি, তপস্বী, গৃহিনী, সজীব-নির্জীব সত্তা নির্বিশেষে সমাজের সকলের মধ্যে আতিথেয়তার গুণ উপলব্ধ হয়। বৃক্ষ, পক্ষী এবং সমুদ্রের মত চরিত্রগুলিও রামায়ণে উল্লিখিত অতিথিদের পরম আনন্দ, সৌহার্দ্য, ভক্তি, আনুগত্য, বিনয় ও সর্বোপরি আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়নধর্মে ব্রতী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এবং এর দ্বারা এটিও অনুমান করা যেতে পারে যে রামচন্দ্র তথা অরণ্যচারীরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সকল গার্হস্থ্য নিয়ম নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন, বিশেষতঃ অতিথিসেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। সেই তুলনায় প্রকৃত অর্থে যাঁরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত গৃহস্থ তারা না জানি কত যত্নপূর্বক এই সকল সদাচার পালন করতেন।

তথ্যপঞ্জি

১. রামায়ণ ১/২/৩৬-৩৭

২. ঐ ১/২/১৫

৩. ঐ ১/২/২৩-২৪

৪. ঐ ১/১৩/১০-১৭

৫. ঐ ১/১৩/৩০

৬. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১/১০৯

৭. দেবীপুরাণ

৮. রামায়ণ ১/১৮/৪২-৪৪

৯. ঐ ১/৫০/১৪

১০. ঐ ১/৫০/৬-১৫

১১. ঐ ১/৫২

১২. ঐ ১/৫৩/৪-৫

১৩. ঐ ২/৪৫

১৪. আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৪/৯/২-৪

১৫. রামায়ণ ২/৫০/৩৬-৩৮

১৬. রামায়ণ ২/৫০/৩৯-৪০

১৭. ঐ ২/৫০/৪১-৫১

১৮. ঐ ২/৫৪/১০-২৩

১৯. ঐ ২/৯০/৪-৮

২০. ঐ ২/৯১/৫৯

২১. ঐ ২/১১৭

২২. ঐ ৩/৪৬/৩৩

২৩. পঞ্চতন্ত্রম্ ৩/১৪৫

২৪. রামায়ণ ৩/১/১১

২৫. ঐ ৩/১/১০-২৩

২৬. ঐ ৩/৫/২৯

২৭. ঐ ৩/৫/৩১-৩৩

২৮. ঐ ৩/৭/২৪

২৯. ঐ ৩/১২/১১

৩০. ঐ ৩/৩১/৩৭

৩১. ঐ ৩/৩১/৩৬

৩২. রামায়ণ ৩/৩৫/৩৯

৩৩. ঐ ৩/৪৬/৩৬

৩৪. ঐ ৩/৭৪

৩৫. ঐ ৪/৫০-৫২

৩৬. ঐ ৪/৬-১২

৩৭. ঐ ৫/১

৩৮. ঐ ৬/১২৪

৩৯. ঐ ৬/১৮/৩

৪০. ঐ ৬/১৮/২৭-৩১

৪১. ঐ ৬/১৮/২৪-২৫

৪২. ঐ ৭/৪৭,৪৯,৬৬

মহাভারত

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গ্রন্থরূপে মহাভারতের খ্যাতি প্রসিদ্ধ। কেবলমাত্র আকৃতির দিক দিয়ে গ্রন্থটি বিশাল নয়, বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও এটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কথিত আছে, এমন কোন বিষয় নেই, যা মহাভারতে নেই বা পাওয়া যায় না-

‘ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।

যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।।’[১]

মহাভারত সম্পর্কে একটি লোকোক্তি প্রচলিত আছে- ‘যন্নভারতে তন্নভারতে’ অর্থাৎ যা মহাভারতে নেই তা ভূ-ভারতেও নেই। মহাভারতে ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক, বাস্তব-অবাস্তব এবং লৌকিক ও অলৌকিক বহু ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার ফলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিবুধমহলে প্রবল মতবিরোধ ও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, কলা প্রভৃতি সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে মহাভারতে। পরস্পরবিরোধী ভাব এবং বিষয়বস্তুও মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর একদিকে রয়েছে ধর্ম, আরেক দিকে রাজনীতি, একদিকে কাম, অন্যদিকে মোক্ষ, একদিকে প্রবল ভোগলালসা অপরদিকে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। বিবিধ সমস্যা যেমন আছে, আবার সমস্যা সমাধানের সূত্রও আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, অতিপ্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন মহাভারতের কাব্যিক পরিবেশে আমরা যে চরিত্রগুলির সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ, সুখদুঃখ সাধারণ মানুষের মতই। মহাভারতের যা মুখ্য অংশ- কুরুপাণ্ডবীয় উপ্যাখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত বিষয়- ব্যাপারের চাপে বিকৃত হয়নি। স্বাভাবিক মানব চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও

নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব ও নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুরই দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়।

বর্তমান মহাভারত যে আকারে পাওয়া যায় তার বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। এই পর্বগুলির নাম যথাক্রমে- ১. আদিপর্ব, ২. সভাপর্ব, ৩. বনপর্ব, ৪. বিরাটপর্ব, ৫. উদ্যোগপর্ব, ৬. ভীষ্মপর্ব, ৭. দ্রোণপর্ব, ৮. কর্ণপর্ব, ৯. শল্যপর্ব, ১০. সৌপ্তিকপর্ব, ১১. স্ত্রীপর্ব, ১২. শান্তিপর্ব, ১৩. অনুশাসনপর্ব, ১৪. আশ্বমেধিকপর্ব, ১৫. আশ্রমবাসিকপর্ব, ১৬. মৌসলপর্ব, ১৭. মহাপ্রস্থানিকপর্ব এবং ১৮. স্বর্গারোহণপর্ব। প্রত্যেকটি পর্ব আবার বিভিন্ন উপপর্ব এবং অধ্যায়ে বিভক্ত। মহাভারত অধ্যয়নে প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। মহাভারতরূপ মহাসাগরে মানবিক উৎকর্ষ সাধক বহু গুণাবলীর সন্নিবেশ ঘটেছে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে। মহাভারতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অতিথিসেবার তথা অতিথিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত অন্বেষণই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই বহু ঘটনার মধ্য থেকে আতিথ্য বা অতিথিসৎকারের প্রসঙ্গগুলি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের অবতারণা।

‘পঞ্চমহাযজ্ঞ’ সম্পাদন ছিল তিন উচ্চবর্ণের দৈনিক কর্তব্য-

‘অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।’[২]

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ বা অতিথিযজ্ঞ (অতিথিদের আপ্যায়ন) ও ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মাদির নিজ নিজ গুরুত্ব ছিল। ধৈর্য্যশীল ও প্রজ্ঞাবান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদানের সময় নৃযজ্ঞ বা অতিথি যজ্ঞের বিবরণ দেন। মহাভারতে এই নৃযজ্ঞ ‘পঞ্চদক্ষিণাযজ্ঞ’ নামে অভিব্যঞ্জিত হয়।[৩] একে পঞ্চদক্ষিণাযজ্ঞ বলার কারণ হল নৃযজ্ঞে গৃহে আগত অতিথিকে পাঁচটি

ভিন্ন বস্তু প্রদান করতে হয়। যেমন-হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জল, বিশ্রামের জন্য একটি আসন, অধিষ্ঠানের স্থানটি আলোকিত করার জন্য দীপ, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য এবং বসবাসের আশ্রয়।[৪]

গৃহে অতিথি তথা একজন অপরিচিত ব্যক্তি সমাগত হলে গৃহকর্তার উচিত তাকে স্বাগত জানানো; অতিথিকে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য জল, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আসন প্রদান ইত্যাদি কর্ম গৃহকর্তার সদাচারের মধ্যে নিহিত থাকে। অপরিচিত অতিথি হলেও গৃহকর্তাকে অতিথির প্রতি নম্র ও বিনয়ী হতে হয়। নিজের দেশের হোক বা ভিন্ দেশের অতিথি হোক তাঁকে কখনও আহার্য ব্যতিরিক্ত অতিথিসৎকার করতে নেই।[৫]

আতিথেয়তার কর্তব্য মহাভারতে স্বীকৃত উৎকৃষ্ট কর্ম। মহাভারতের যুগে পরিভ্রমণকারী অতিথি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত থাকতেন যে তিনি যেখানেই যান না কেন তাঁর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণ হবে। অতিথিদের সুখ ও আরাম প্রদানের জন্য 'আবসথ' নির্মাণ করা হত। অথর্ববেদের যুগে পথচারীদের জন্য নির্মিত আবসথ মহাভারতের যুগে 'সভা' নামে খ্যাত ছিল। অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত, রাজ্য থেকে বঞ্চিত নল তাঁর স্ত্রী দময়ন্তীকে নিয়ে যখন পরিভ্রমণ করছেন তখন কপর্দকশূন্য দম্পতি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে 'সভা' তে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত সভাকক্ষতে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ক'রে সেযুগের রাজারা সাধারণভাবে অতিথিসৎকারের এক সরলীকৃত ব্যবস্থা করতেন-

'ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ সভাং কাং চিদ্ উপেয়তুঃ।'[৬]

চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি তাঁর পুত্র পুরু রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হলে বানপ্রস্থে গমন করেন। বনবাসকালে যযাতি তাঁর কুটিরে আগত অতিথি অভ্যাগতদের বনজ ফলমূল ও তাজা মাখন দিয়ে অতিথিসৎকার করতেন। অতিথিসেবার পরেই তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভুট্টা বা যবের দানা সংগ্রহ করে নিজের খুন্নিবৃত্তি করতেন।[৭]

জতুগৃহ থেকে আত্মরক্ষা করার পর পাণ্ডবরা গঙ্গার তীরে যেখানে তপস্বী ধৌম্য পবিত্র উৎকোচক তীর্থে তপস্যায় রত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হন। অর্জুন সেখানে চিত্ররথ নামক গন্ধর্বকে পরাজিত করেন এবং তাঁদের মধ্যে সখ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্ররথ পাণ্ডবদের উপদেশ দেন যে তপস্বী ধৌম্যকে তাঁদের পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। চিত্ররথের উপদেশানুসারে পাণ্ডবেরা উৎকোচকের উদ্দেশ্যে ধৌম্যের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেন। ধৌম্যের আশ্রমে পাণ্ডবেরা উপস্থিত হলে তপস্বী ধৌম্য বন্য ফলমূল ও ভোজ্য সামগ্রী দিয়ে পাণ্ডবদের অতিথিসেবা করেন। সেইদিন থেকে ধৌম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। ধৌম্য বেদের প্রকৃত অর্থ এবং নৈতিকতার সমস্ত নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। পাণ্ডবদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে ধৌম্য যজমান পাণ্ডবদের যথাযথ অতিথিসৎকারের মাধ্যমে তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় দেন।[৮]

জতুগৃহের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করার পর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দেন ও দ্রৌপদীকে তাঁদের পত্নী হিসেবে পেয়ে কৃতকার্য হন। রাজা দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছ থেকে পাণ্ডবদের পরিচয় জানতে পারেন। তিনি পুত্রের কাছে যখন শুনলেন পাণ্ডবেরা কুন্তীর পুত্র তখন অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পাণ্ডবদের কাছে তাঁর পুরোহিতকে এই বার্তা দিয়ে পাঠান যে পাণ্ডুর পুত্রদের সাথে তাঁর কন্যার বিবাহ সম্ভব। রাজা দ্রুপদের বার্তাবাহক পুরোহিত পাণ্ডবদের কাছে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁর চরণসেবার জন্য জল

আনয়ন করতে ও অর্ঘ্য নিবেদনের আদেশ দেন। রাজা দ্রুপদের পুরোহিত হওয়ার কারণে ঐ পুরোহিত অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতাদের উচিত সাধারণ শ্রদ্ধার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধাশীলতায় পুরোহিতরূপী অতিথির সৎকার করা। যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুযায়ী ভীম পুরোহিত ব্রাহ্মণের মনোরঞ্জনের সকল ব্যবস্থা করেন-

‘সমীপস্থিতং ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাস্মৈ।

মান্যঃ পুরোধা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তস্মৈ প্রযোজ্যাভ্যধিকৈব পূজা।

ভীমস্তথা তৎকৃত্বং নরেন্দ্র তাং চৈব পুজাং প্রেতিসংগৃহীত্ব।।’[৯]

জনমেজয় সৌর রাজবংশের এক বিখ্যাত রাজা ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র ছিলেন। জনমেজয় সাপেদের বিরুদ্ধে কিভাবে সর্বোত্তম প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে ত্রিকালদর্শী ঋষিদের পরামর্শ চান; ঋষিরা তাঁকে সর্পসত্র বা সর্বনিধনযজ্ঞের বিধান দেন। জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন জেনে বেদবিভাজনকর্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর সমস্ত শিষ্য, তপস্বী ও আত্মীয়দের নিয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। জনমেজয় তাঁর পুরোহিতদের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ঋষি বেদব্যাসকে একটি সুবর্ণময় আসন উপহার দেন, তিনি উপবিষ্ট হওয়ার পর জনমেজয় শাস্ত্রানুসারে তাকে পূজা করেন। তারপর রাজা পাদ্য, অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁর আতিথেয়তা করেন। রাজা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার পর আসন গ্রহণ করেন ও ঋষি ব্যাসদেব হৃষ্টচিত্তে রাজার কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আতিথ্য পর্ব সমাধা করে জনমেজয় কৌরব ও পাণ্ডবদের বিষয় নিয়ে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করেন।[১০]

পাঞ্চালদের কাছে ভরতের বংশধরেরা পরাজিত হলে ভরত রাজপুত্র সম্বরণ ভয়ে পালিয়ে যান এবং ভরতবংশীয়রা একটি দুর্গের মধ্যে পর্বতের পাদদেশে সহস্র বছর বেঁচে ছিলেন। ভরতের এই নির্বাসিত বংশধরদের কাছে ঋষি বশিষ্ঠ এসেছিলেন, ঋষির আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে তাঁরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাঁকে প্রণতিপূর্বক অর্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ঋষির আতিথেয়তা সম্পন্ন করার পর বশিষ্ঠ তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সহায়ক হতে সম্মত হন।[১১]

পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু কিমিন্দম মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হন। এই শাপের ফলে পাণ্ডুর সন্তান উৎপাদন অসম্ভব হয়। পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীর সাথে নাগশত, চৈত্ররথ, কালকূট, হিমালয়ের উত্তরস্থ গন্ধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং হংসকূট অতিক্রম করে শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে তপস্যা করতে লাগলেন। কুন্তীর দৈব মন্ত্রের গুণে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। পান্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী সহমরণ বরণ করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কুন্তী ও তাঁর পাঁচ পুত্রকে শতশৃঙ্গের তপস্বীরা ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করার জন্য হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। রাজপুরুষেরা তাঁদের আগমনের বার্তা রাজসভায় জানান। তপস্বীদের আগমনের বার্তা শুনে বহু সংখ্যক প্রজা সমাগত হয়। কৌরবরা তাঁদের পুরোহিতদের সাথে নতমস্তকে অভ্যর্থনা জানান তপস্বীদের ও তাঁদের সামনে আসন গ্রহণ করেন। সমস্ত রাজ্যবাসী শুভেচ্ছা বার্তাসহ সাদরে অভিনন্দন জানায়। ভীষ্ম এগিয়ে এসে তপস্বীদের জন্য পাদ্য ও প্রথাগত অর্ঘ্য দ্বারা আতিথ্যবাৎসল্য প্রদর্শন করেন।[১২]

জতুগৃহের মারণ ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করার পর পাণ্ডবেরা একটি গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে গঙ্গার তীরে একচক্র গ্রামে আসেন এবং শ্রদ্ধেয় ঋষি ব্যাসদেবের নির্দেশে তাঁরা সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে অবস্থান করেন। পূর্বে ঋষির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যাসদেব পাণ্ডবদের

সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করতে ও সুস্থতার খোঁজ নিতে একচক্রে এসেছিলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে আসতে দেখে মাতা কুন্তীকে নিয়ে গাত্রোত্থানপূর্বক ঋষিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন। পাণ্ডবরা করজোড়ে বিনয়পূর্বক নীরবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শ্রদ্ধার সাথে ঋষিকে অভিবাদন জানান ও পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে আতিথেয়তা পালন করেন।[১৩]

আতিথেয়তা কেবলমাত্র ধনীদের পালনীয় কর্তব্য ছিল না। এটি আপামর জনসাধারণের আচরণীয় সদাচার হিসেবে পরিচিত ছিল। আতিথেয়তা এমন একটি আচরণ যা বধির ব্যক্তিও অনুভব করতে পারে, মূকও উপলব্ধিপূর্বক অতিথিসেবায় ব্রতী হতে পারে। যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডব অতিথিদের আন্তরিকভাবে স্বভাবসিদ্ধতায় স্বাগত জানাতে অভ্যস্ত ছিলেন। জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতিতেও তাঁরা কখনও অতিথিসৎকার থেকে বিরত হননি।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবরা অর্ধেক সাম্রাজ্যের দাবিদার হিসেবে খান্ডবপ্রস্থ শাসন করতেন। চার ভাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির ন্যায়পরায়ণতার সাথে সুশাসক হিসেবে বর্তমান ছিলেন। একদা স্বর্গীয় ঋষি নারদ তাঁর বিচরণকালে উপবিষ্ট পঞ্চপাণ্ডবের সম্মুখে আসেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের আসন গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ঋষি উপবেশন করলে যুধিষ্ঠির নিজ হাতে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। দেবর্ষি যুধিষ্ঠিরের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করেন। নারদের পরামর্শে দ্রৌপদী ভক্তিভরে নারদের সামনে উপস্থিত হন, তিনি স্বর্গীয় ঋষির প্রতি পাদ্য অর্পণ করে তাঁর সামনে বিনতিপূর্বক অবস্থান করেন। ঋষির আশীর্বাদ লাভ করে দ্রৌপদী প্রস্থান করলে নারদ পাণ্ডবদের একতাবদ্ধ থাকতে এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। ভবিষ্যতে যাতে দ্রৌপদীকে নিয়ে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি না হয় সেজন্য নারদ ব্যবস্থা করেন যে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবদের প্রত্যেক ভাইয়ের সাথে একবছর করে পর্যায়ক্রমে থাকবেন।[১৪]

ব্রহ্মার পুত্র প্রখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠ রাজা বিশ্বামিত্রের রাজত্বে আশ্রম স্থাপন করেন ও প্রজাদের কল্যাণার্থে তপস্যা করেছিলেন। গাধির পুত্র রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর সেনাবাহিনীসহ শিকারের অভিযানে বের হন। তিনি শিকারে অতিশয় তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। ঋষি বশিষ্ঠ তখন সসৈন্য রাজা বিশ্বামিত্রকে যথাযথ সম্মানের সাথে স্বাগত জানান। ঋষি তাঁকে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য জল প্রদান করেন। তারপর তিনি অর্ঘ্য, বন্য ফল ও ঘি নিবেদন করেন। বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে এক আশ্চর্য গাভী ছিল। রাজার সৎকারের নিমিত্ত বশিষ্ঠ কামধেনু নন্দিনীকে বলেন, আমার যা প্রয়োজন দাও। নন্দিনী ধূমায়মান অন্নরাশি, সূপ, দধি, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভৃতি ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও বসন উৎপন্ন করলে, বশিষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সৎকার করেন। নন্দিনীর মনোহর আকৃতি দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্র কামধেনু নন্দিনীকে প্রার্থনা করলেন। বশিষ্ঠ সম্মত না হলে তখন বিশ্বামিত্র সবলে নন্দিনীকে হরণ ক'রে কষাঘাত করে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তখন সেই পয়স্বিনী কামধেনু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ ক'রে সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলে, বশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তিযুক্ত যষ্টিতে তিনি সমস্ত ভস্মীভূত করেন। বিশ্বামিত্রের আত্মগ্লানি হয় ও তিনি রাজ্যসুখ ত্যাগ করে তপস্যায় রত হন।[১৫]

শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করেন যে কিভাবে একজন ব্যক্তি যজ্ঞীয় অবশিষ্টাংশের দ্বারা বেঁচে থাকতে পারে এবং কিভাবে একজন ব্যক্তি অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে পারে-'বিঘসাশী কথং চ স্যাৎ সদা চৈব অতিথিপ্রিয়ঃ'। এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেন, যে ব্যক্তি তার অনুজীবী তথা ভৃত্যদের ও অতিথিদের আহার্য প্রদানের পর খাদ্য গ্রহণ করেন তিনি সর্বদা অমৃত গ্রহণ করেন। যে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও

অতিথিদের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত কখনও আহার করেন না তাঁর স্বর্গলাভ নিশ্চিত। এই ধরণের লোকেরা জন্মান্তরেও প্রভূত সুখ লাভ করেন।[১৬]

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পুত্র শুককে জীবনচর্যা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলে ব্যাসদেব পুত্র শুককে যে সকল উপদেশ দেন তা উদ্ধৃত করেন। পিতা উপদেশ দেন, তুমি সত্য ও আন্তরিকতা অবলম্বন, ক্রোধ ও বিদ্বেষ থেকে মুক্তি এবং আত্মসংযম, তপস্যা ও কর্তব্য পালন কর। উদারতা, সহানুভূতির আশ্রয়ে ছলনা পরিত্যাগ করে দেবতা অতিথির সেবা কর। দেবতা ও অতিথি সেবার পর উদ্বৃত্ত খাদ্য দিয়ে জীবনধারণ কর-

'দেবতাঽতিথিশেষেণ যাত্রাং প্রণশ্য সংসৃজ্য।'[১৭]

মহাভারতের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে হতাশ হয়ে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সাথে সর্বোত্তম কঠোর তপস্যা অনুশীলন করে মৃত্যুর সাক্ষাৎ লাভে উদ্যোগী হন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে তপস্যা থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য জাগতিক জ্ঞানের সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ঋষির বক্তব্যে দাতব্য, আতিথেয়তা ও উদারতার আচরণ গুরুত্ব পায়। এই সদাচারগুলি গৃহস্থের অনুশীলন করা উচিত। প্রথমে দেবতা, ঋষি, অতিথি, পিতৃলোক এবং গৃহদেবতাদের সন্তুষ্ট করার পর একজন ব্রাহ্মণ যে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেছে তার অন্নগ্রহণ করা উচিত। এই ধরণের আচরণের ফলে সস্ত্রীক ব্যক্তির মহান ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জিত হয়।[১৮]

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডব আসেন। রাজার কর্তব্য ও নৈতিকতার বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি যুধিষ্ঠিরের গুণাবলী উল্লেখ করেন। প্রকৃত রাজার উচিত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অতিথিসৎকারের সদিচ্ছা ও ধার্মিকদের প্রতি দানশীলতা অবলম্বন করা। যুধিষ্ঠিরের এই গুণাবলীগুলি ছিল-

'অতিথিন্ ভৃত্যান্ সম্মানয়তি, অতিথিপ্রিয়ঃ দদাতি সতাং নিত্যম্।'[১৯]

উৎকৃষ্ট মনুষ্যধর্মের বিচারে আতিথেয়তা বা অতিথিকে দেবজ্ঞানে পূজা করার কথা নির্দেশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় ভীষ্ম জীবনের চারটি স্তরের কথা বলেন-ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গার্হস্থ্যাশ্রমের আচরণীয় কর্তব্যগুলির আলোচনায় সত্যবাদিতা, সরলতা ও অতিথিসেবা প্রাধান্য পায়। নৈতিকতা অর্জন ও পরলোকেও অসীম সুখপ্রাপ্তিতে এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২০]

কৈকেয় রাজার উপাখ্যানে তাঁর অতিথিবাৎসল্যের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। কৈকেয় রাজ তপস্বীদের রক্ষা, সম্মান প্রদান ও আহার্য দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। শুধু তাই নয় তিনি অতিথিসৎকার না করে অন্নগ্রহণ করতেন না-

'না সংবিভাজ্য ভোক্তস্মি।'[২১]

একজন আদর্শ রাজার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন যে একজন রাজার প্রধান কর্তব্য হল সমস্ত প্রজাকে কায়মনোবাক্যে রক্ষা করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা না করা। রাজার দায়িত্ব দুঃস্থ, অসহায় ও বৃদ্ধদের দুঃখকষ্ট অপনোদন করা। সত্যের বাধ্যবাধকতাগুলি প্রফুল্লচিত্তে পালন করা, সদয় হয়ে উপহার দেওয়া, অতিথিদের আপ্যায়ন করা এবং আশ্রিতদের সহায়তা করা।[২২]

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শিষ্ট ব্যক্তি কে? সে সম্পর্কে ভীষ্ম বলেন, যাঁরা পিতৃপুরুষ, দেবতা ও অতিথিদের পূজা করেন, যাঁরা সর্বদা অপরের মঙ্গলের জন্য নিবেদিত প্রাণ, সর্বত্যাগী ও পরোপকার সাধনের জন্য যাঁরা আত্মোৎসর্গতেও পিছপা হননা তাঁরাই শিষ্ট বা উত্তম বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে বিবেচিত হন।[২৩] এই প্রসঙ্গে ভীষ্ম ক্ষত্রিয় রাজা অম্বরীষের দৃষ্টান্ত

দেন। রাজা অম্বরীষের চরিত্রে অন্যান্য সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর মধ্যে অতিথিসৎকারের মহান গুণটি তাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করেছিল।[২৪]

ভৃগু ও ভরদ্বাজের কথোপকথনে ভরদ্বাজ মনুষ্যজীবনের চারটি পর্যায়ের আচরিতব্য কর্তব্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে ভৃগু ব্যাখ্যা করেন যে গার্হস্থ্যাশ্রম হল জীবনের অন্যান্য সকল পর্যায়ের মূল। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যের জীবনচর্যা পালন করে গৃহীর ধর্ম পালন করেন। এই সময় যদি কোন গৃহস্থ অতিথি আপ্যায়ন না করেন তাহলে সেই অনাপ্যায়িত অতিথি গৃহীর সকল গুণাবলী হরণ করে নিজের পাপাদি কর্মকে গৃহীর উপর ন্যস্ত করেন।[২৫]

অতিথিসৎকারকে একজন গৃহীর পালনীয় অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিজের দেশে হোক বা ভিনদেশে অতিথিকে কখনই অভুক্ত রাখতে নেই।[২৬]

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয়-পরিজন বিয়োগে শোকাকুল হয়ে সংসার ত্যাগ করতে চাইলে গৃহীর জীবনের সার্থকতা ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে অতিথিবাৎসল্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। দেবতা, পূর্বপুরুষ, অতিথি, ভৃত্য, পতঙ্গ ও অন্যান্য সকল প্রাণী গার্হস্থ্য ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই নিজ নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তাই অতিথিসেবা আবশ্যক কর্ম।[২৭]

যে সমস্ত ব্যক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদিত হওয়ার পর আপন খাদ্য গ্রহণ করেন তাঁরা অমিত পুণ্যবান বলে কল্পিত। তাঁদের দ্বারা এমন ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জিত হয় যা অন্য কোন পুরুষের দ্বারা অসম্ভব।[২৮] যুধিষ্ঠিরের শোকসন্তপ্ত মনকে পরিবর্তনের আশায় অর্জুন বিদেহের রাজা ও রানীর উপাখ্যানের সূত্রপাত করেন। ক্ষত্রিয় রাজা জনক যখন বানপ্রস্থী বা ভিক্ষুর আচরণ পালনে তৎপর হন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বিরত করার জন্য বলেন যে,

বানপ্রস্থীর জীবনকালে অতি অল্প সামগ্রী দ্বারা অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূতবর্গকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। তাই দেবতা, অতিথি, পিতৃপুরুষ, প্রভৃতিদের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একজন পুরুষের জীবন যাপন করা দুঃখজনক।[২৯] যাদের গৃহে অন্ন আছে তারা গৃহস্থ, বানপ্রস্থাশ্রম গৃহীর দ্বারা সমর্থিত। খাদ্য থেকে জীবন উৎপন্ন হয়। তাই অন্নদাতাই জীবনদাতা।[৩০]

শান্তিপর্বের প্রথমার্ধে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বিশেষত একজন গৃহকর্তার মর্যাদা ও কর্তব্য বিশদে আলোচিত হয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনের অঙ্গ হিসেবে অতিথিসেবাকে প্রাধান্য দানপূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। গৃহস্থ জীবনে আনন্দ ও কর্তব্যবোধকে একটি সুশৃঙ্খল ছন্দে একত্রিত করে পরিবেশন করা হয়েছে।[৩১]

ব্রাহ্মণকে আতিথেয়তা শিক্ষণের জন্য একটি উদাহরণ অত্যন্ত উপাদেয়। গায়ত্রী উচ্চারণকারী এক ব্রাহ্মণের সকাশে কাল, মৃত্যু ও যম- এই ত্রয়ী উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁদের অর্ঘ্যদানে আতিথ্য সমাধা করেন; এই সময় রাজা ইক্ষ্বাকু এসে সেখানে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ তাঁকেও আতিথেয়তা দিতে বাধ্য থাকেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত ক্ষত্রিয়কে অতিথিরূপে সম্মান জানানো যে ব্রাহ্মণেরও কর্তব্য তা প্রমাণিত হয়।[৩২]

অতিথিসেবা একজন গার্হস্থ্যাশ্রমীর প্রধান কর্তব্য। অতিথি সম্পর্কে গৃহীর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অনুশাসন পর্বে অতিথি সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা রয়েছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বর্ণিত অতিথির বিশেষত্ব হল যিনি দীর্ঘকাল ধরে গৃহে অবস্থান করেন না বা এসেও অল্প সময়ের মধ্যে বিদায় নেন তিনিই অতিথি।[৩৩]

অনুশাসন পর্বে সুদর্শন-ওঘবতীর অতিথি সৎকারের কাহিনী খুবই মর্মস্পর্শী। মাহিষ্মতীর রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভে অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শন নামে এক পুত্র জন্মায়।

সুদর্শনের সাথে নৃগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর বিবাহ হয়। পতি সুদর্শন তাঁর পত্নী সুদর্শনার সাথে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে শুরু করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি ওঘবতীকে বলেন, তুমি অতিথিকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমনকি প্রয়োজন হলে নির্বিচারে নিজেকেও দান করবে। আমি গৃহে থাকি বা না থাকি তুমি কখনও অতিথিসেবায় অবহেলা করবে না। অতিথি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।[৩৪] একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহ্মণের বেশে অতিথিরূপে ওঘবতীর কাছে উপস্থিত হন। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিয়ে সৎকারের পর অতিথির অভিপ্রায় জানতে চাইলে অতিথিরূপী ধর্ম ওঘবতীকেই প্রার্থনা করেন। গৃহিণী অন্যান্য অভীষ্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেও তাতে অতিথি সম্মত না হওয়ার কারণে পতির আজ্ঞা স্মরণ করে অতিথির অভিপ্রায় পূরণ করেন। গৃহকর্তা সুদর্শন গৃহে ফিরে এসে পত্নীর সন্ধান ক'রে জানতে পারেন অতিথির সৎকারে তাঁর স্ত্রী নিজেকে নিবেদন করেছেন। অতিথিরূপী ধর্ম সুদর্শনকে সব খুলে বললে তিনি ঈর্ষা ও ক্রোধ ত্যাগ করে জানান যে সুদর্শন তাঁর সমস্ত এমনকি স্ত্রীকেও অতিথিকে দান করতে পারেন। সুদর্শন অতিথিসৎকারের ব্রত পালন না করলে ধর্ম তাঁকে বধ করবেন ভেবে রেখেছিলেন, কিন্তু গার্হস্থ্য ধর্ম দ্বারা কাম-ক্রোধকে জয় করে সুদর্শন মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। অতিথিসেবার ফলস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শুক্লবর্ণ সহস্র অশ্বযোজিত রথে সুদর্শন ও ওঘবতীকে নিয়ে অমৃতলোকে পাড়ি দেন-

'অতিথেঃ প্রতিকূলং তে ন কর্তব্যম্ কথঞ্চন।

যেন যেন চ তুষ্যেত নিত্যমেব ত্বয়াঽতিথিঃ।

অপ্যাত্মনঃ প্রদানেন ন তে কার্যা বিচারণা।।

অতিথিঃ পূজিতো যস্য গৃহস্থস্য তু গচ্ছতি।

নান্যস্তস্মাৎ পরো ধর্ম ইতি প্রাহূর্মনীষিণাঃ।।

প্রাণা হি মম দারাশ্চ যচ্চন্যৎ বিদ্যতে বসু।

অতিথিভ্যো ময়া দেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।।'[৩৫]

দাতব্য বা আতিথেয়তা সম্পর্কিত বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় ভীষ্ম ঐশ্বরিক গুরু বৃহস্পতি ও স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের আখ্যান পরিবেশন করেন।[৩৬] স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ইন্দ্র জানতে চাইলে বৃহস্পতি উত্তর দেন যেসমস্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের সম্মান ও উপাসনা করে, যারা প্রতিদিন অগ্ন্যাধান কর্মে ব্যাপৃত থাকে, যজ্ঞসম্পাদনকারী, স্বল্প সামর্থ্য যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অতিথিসেবায় নিরত, আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা যাদের কাছে নিরাশ হয় না তারা স্বর্গলাভে সক্ষম।[৩৭]

যক্ষ যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর পর্বে যুধিষ্ঠিরের উত্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে বিদুর এই পর্বে বলেন, এই পাঁচটি সেবার মাধ্যমে পুরুষেরা অপার খ্যাতি অর্জন করে। তাই দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভিক্ষুক, আর্ত ও অতিথি এই পাঁচটি বিষয়ের সেবাদানে শ্রদ্ধাশীল হতে হয়।[৩৮]

উমা ও মহেশ্বরের মধ্যে কথোপকথনে, উমা মহেশ্বরকে জীবনের স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্তব্যগুলি সম্পর্কে বলতে বলেন। একজন আদর্শ গৃহস্থের জীবন চিত্রিত করতে গিয়ে মহেশ্বর ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি ৫টি ত্যাগের দ্বারা তাঁর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, যিনি সত্যবাদী, বিদ্বেষমুক্ত, দানে রত, সম্মানপূর্বক অতিথিসেবা করেন, মিষ্ট-আশ্বস্ত বচন প্রয়োগকারী, পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা অতিথিসেবা করেন, গৃহে আগত অতিথি ও ভৃত্যবর্গের অন্নসেবা না হওয়া পর্যন্ত যিনি অন্নগ্রহণ করেন না তিনি মোক্ষপ্রাপ্তিতে সফল হন।[৩৯]

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি কারা এ বিষয়ে জানতে চাইলে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যানটির অবতারণা করেন। একদিন কৃষ্ণ দেখেন নারদ অনেক ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পূজো করছেন। কৌতূহলবশতঃ কৃষ্ণ সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সম্মানীয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্মণদের নিরূপণ করতে বলেন। নারদ তখন ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অতিথিপরায়ণতার কথা বলেন। যেসব ব্রাহ্মণ তপশ্চরণ, অতিথিসেবা, বেদচর্চা করেন, দেবতা-অতিথিদের উৎসর্গ না করে আহার্য গ্রহণ করেন না তাঁরাই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।[৪০]

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির তপস্যা ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেন। ধার্মিক আচরণ ও ধার্মিক জীবনযাপনের পদ্ধতি উল্লেখ করতে গিয়ে ভীষ্ম অতিথিপরায়ণতার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের খাদ্যগ্রহণের পূর্বে অতিথিকে সন্তুষ্ট করেন তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, নীতিপরায়নতা তাঁর চরিত্রে প্রকট।[৪১]

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, যে গৃহস্থ গার্হপত্য, আহ্বনীয় ও দক্ষিণাগ্নিতে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে যে পরিমাণ ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জন করেন, ঠিক সেই যোগ্যতা যে ব্যক্তি অতিথিসেবার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রের সঠিক অধ্যাদেশ মেনে চলেন ও পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা অতিথির সেবা করেন তিনি অর্জন করেন।[৪২]

শাস্ত্রোক্ত ধর্মাচরণের আদেশ মান্য করে চললে গৃহস্থ অধার্মিক হন না। এই আদেশের মধ্যে অতিথি সৎকার প্রাধান্য পেয়েছে-

‘ঋণমুন্মুচ্য দেবানাং ঋষীণাং চ তথৈব চ।

পিতৃণামথ বিপ্রাণামতিথিনাং চ পঞ্চমং।।

পর্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুনির্ণিক্তেন কর্মণা।

এবং গৃহস্থঃ কর্মানি কুর্ব্বন্ ধর্মান্ন হীয়তে।।’[৪৩]

ধর্মচ্যুত না হওয়ার পন্থা আলোচিত হয়েছে এখানে; ধর্মাচরণে আতিথেয়তা আবশ্যক প্রমাণিত হয়েছে।

‘বিঘস’ গ্রহণ মনুসংহিতাতে উৎকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়েছে- কুটুম্ব, অতিথি প্রভৃতি ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে শাস্ত্রকারেরা তাকে বলেন বিঘস, আর যজ্ঞ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা হল অমৃত। প্রতিদিন এই ভুক্তাবশিষ্ট ও যজ্ঞাবশিষ্ট দিয়ে গৃহস্থের জীবন রক্ষা করতে হয়। গৃহস্থকে তাই তাঁর আবাসস্থলে আসা সকলের প্রতি অতিথিপরায়ণ হওয়া উচিত-

‘বিঘসাসী সদা চ স্যাৎ সদা চৈবাতিথিপ্রিয়ঃ।’[৪৪]

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করেন কোন ব্যক্তি কিভাবে বিঘস ভক্ষক হতে পারে? কি করলে একজনকে অতিথিপ্রিয় বলা যাবে? উত্তরে ভীষ্ম বলেন যে যিনি সর্বদা অতিথি ও ভৃত্যদের প্রয়োজন মিটলে যা অবশিষ্ট থাকে তা গ্রহণ করেন তিনি সর্বদা অমৃত পান করেন-

‘ভৃত্যাতিথিষু যৌ ভুঙ্ক্তে ভুক্তাবৎসু নরঃ সদা।

অমৃতং কেবলং ভুঙ্ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠিরঃ।।’[৪৫]

প্রাচীন ভারতে বর্ণবিন্যাস প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেরা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য পালন করলে উচ্চবর্ণে পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল। শূদ্রের কর্তব্যের তালিকায় তিনটি উচ্চবর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনের রীতি আছে। একইভাবে বৈশ্য যদি আতিথেয়তারূপ কর্তব্য পালন করেন তাহলে ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম নিতে পারেন। একজন

ক্ষত্রিয়ও পরবর্তী জন্মে একজন ব্রাহ্মণের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন যদি তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সাথে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও অতিথির সেবা করেন।[৪৬]

নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতার সময় ভীষ্ম অতিথিদের আপ্যায়ন ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের রক্ষণাবেক্ষণে নারীর ভূমিকাকে আলোকিত করেছেন। তিনি বলেন, নারীর কর্তব্য বিবাহ নামক আচারের দ্বারা শুরু হয়। একজন নারী তার স্বামীর সমস্ত সৎকর্ম সম্পাদনে যোগ্য সহযোগী হয়। ধর্মাচরণ হল বিপরীত লিঙ্গের দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তিতে মিলিত করা, যাতে সমস্ত কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। যে মহিলা ভোরবেলা শয্যাত্যাগে আনন্দ পায়, যে সমস্ত গৃহকর্তব্য পালনে নিবেদিতা, সর্বদা যে গৃহকে পরিচ্ছন্ন রাখে, যে তার স্বামীর সাথে দেবতা ও অতিথি এবং পরিবারের ভৃত্য ও আশ্রিতদের সন্তোষ বিধান করে, যে সর্বদা দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যদের চাহিদা পূরণের পর অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে সে পরমার্থ প্রাপ্ত হয়।

‘কল্যোত্থানরতা নিত্যং গুরুশুশ্রূষণে রতা।

সুসমৃষ্টক্ষ্য চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা।।

অগ্নিকার্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিরূপ্য পতিনা সহ।।

শেষান্নামুপভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।

তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্মেণ যুজ্যতে।।’[৪৭]

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের বার্তালাপে ব্রহ্মা বলেন, এমন অনেক লোক আছে যা ইন্দ্রেরও অদৃশ্য। তাদের মধ্যে একটি হল গোলোক। গোলোকের বাসিন্দারা তাদের প্রতিটি ইচ্ছার ফলভোগ করে। কিন্তু এই গোলোকের অধিকারী কে? এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা উত্তর দেন অতিথিদের আতিথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিরা গোলোকের চিরন্তন ও আনন্দলোকে প্রবেশ করতে সক্ষম। অতিথিবাৎসল্যের পুরস্কার স্বরূপ গোলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু আতিথেয়তায় যদি আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার অভাব থাকে তাহলে গোলোকের পথ অবরুদ্ধ হয়-

'মৃদুর্দান্তো দেবপরায়ণশ্চ সর্বাতিথিশ্চাপি তথা দয়াবান্।

ইদৃগ্গুণো মানবাঃ সম্প্রযাতি লোকং গবাং শাশ্বতং চাব্যয়ং চ।।'[৪৮]

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে অতিথিবাৎসল্যের প্রসঙ্গ বহুবার আলোচিত হয়েছে। নহুষের উপাখ্যানে ইন্দ্রের অগস্ত্যের প্রতি আতিথেয়তার বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সাথে অগস্ত্য দেখা করতে গেলে ইন্দ্র অতিথি অগস্ত্যের যাত্রাপথ সুখকর হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতিথিসেবার জন্য পাদ্য, অর্ঘ্য ও গাভী প্রদান করেন।[৪৯] এক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্র অতিথিসৎকারী ও মহান ঋষি অগস্ত্য অতিথিরূপে বিরাজিত।

আতিথেয়তাকে মহিমান্বিত করার জন্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আখ্যানটি অভূতপর্ব। নারদ কর্তৃক এই আখ্যান অংশটি পরিবেশিত হয়েছে। একদা তপস্যায় নিয়োজিত বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করার জন্য বশিষ্ঠ ক্ষুধার্ত অন্নপ্রার্থীর ছদ্মবেশে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র তখন চরু প্রস্তুতকরণে ব্যস্ত ছিলেন। বশিষ্ঠকে সেই মুহূর্তে তাঁর অতিথি আগমনের পরিচর্যা করতে বিলম্ব হওয়ায় বশিষ্ঠ অপরাপর তপস্বীদের দ্বারা আতিথ্য গ্রহণ করেন ও ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। এরপর বিশ্বামিত্র চরু সহযোগে বশিষ্ঠের আতিথেয়তার জন্য উপস্থিত হলে

তিনি জানান যে তাঁর আহার্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে, বিশ্বামিত্র যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন; এই বলে বশিষ্ঠ প্রস্থান করেন, বিশ্বামিত্র মস্তকে অতিথির জন্য প্রস্তুত আহার্য ধারণ করে আশ্রমে দাঁড়িয়ে থাকেন। একশত বৎসর অতিক্রম করে বশিষ্ঠ যখন পুনরায় বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন তখনও বিশ্বামিত্র ঐ একই অবস্থায় মাথায় খাদ্য নিয়ে বায়ুভোজী ও নিশ্চেষ্ট হয়ে অতিথির অপেক্ষারত ছিলেন। বশিষ্ঠ তখন সেই তাজা ও গরম খাদ্যগ্রহণ করে বিশ্বামিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই গল্পে স্বয়ং ধর্ম বশিষ্ঠের ছদ্মবেশে বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তপস্বী, অতিথিপরায়ন বিশ্বামিত্রের এ হেন আচরণে যারপরনাই সন্তুষ্ট হন ধর্মরাজ। অনুপম এই আতিথ্যগুণের ফলে বিশ্বমিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়। অতিথির জন্য অপেক্ষার কাল সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রমাণিত হয় যে অতিথির সন্তুষ্টির ফলে অতিথিসেবাকারীর সর্বদাই ইষ্টফলপ্রাপ্তি হয়।[৫০]

কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি যখন অন্তিমপর্বে তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যুধিষ্ঠির অবলীলায় তাঁর পুত্রদের ধ্বংস করবেন। এই সময় ধৃতরাষ্ট্র বিচক্ষণ, বিজ্ঞ বিদুরকে তাঁর দুশ্চিন্তা দূরীকরণের অনুরোধ করেন। মানসিক প্রশান্তির জন্য বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নৈতিকতার পাঠদানের ব্যবস্থা করেন; উল্লেখ করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্মিক বলে সমাজে খ্যাত হবেন তাঁর চরিত্রের মধ্যে সহানুভূতিশীলতা, অতিথিপরায়ণতা, স্বার্থলেশশূন্যতা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি অবশ্যই থাকতে হবে। দেবতা, অতিথি বা পরার্থে উৎসর্গ না করে মহৎ ব্যক্তি কখনই একাকী সুস্বাদু আহার গ্রহণ করবেন না-

‘একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত।’[৫১]

গালবের আখ্যান আতিথেয়তায় সমৃদ্ধ। রাজা যজাতি গরুড় এবং গালবকে পরম যত্ন সহকারে আতিথ্য দেন এবং অতিথিদের প্রতি আচরণীয় নীতিগুলির উপদেশ অত্যন্ত

মনোগ্রাহী ছিল। আতিথ্য প্রদানকারী চরম দরিদ্র হলেও কখনও তাঁর অতিথিকে নিরাশ করবেন না- 'ক্ষীণং বিত্তং হি মে সখে'।[৫২] যযাতি তাঁর ক্ষীণবিত্ততার কথা প্রকাশ করলেও অতিথির চাহিদা পূরণের জন্য কন্যা মাধবীকে ত্যাগ করেন। কঠোপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণ এবং স্মৃতিগ্রন্থে অনুরূপ ঘটনার সন্নিবেশ দেখা যায়। এই ধরণের চিন্তাভাবনা অতিথির প্রতি বিস্ময়ের অনুভূতি তৈরি করে ও অতিথির প্রাপ্য সম্মান ও উপাসনার বোধকে অনুপ্রাণিত করে। উদ্যোগপর্বে মহাকুলের বর্ণনায় কুলের গুণাবলীর মধ্যে আতিথ্যগুণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মহাভারতের বনপর্বে অসংখ্য অতিথিসৎকারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে অতিথিসৎকারের চমৎকার রীতি এই পর্বে আলোচিত হয়েছে। যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে বিশারদ শৌনক যুধিষ্ঠিরকে পার্থিব স্পৃহা ত্যাগের উপদেশ দানকালে গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালনের দিকটি আলোচনা করতে গিয়ে অভ্যাগত সৎকারের প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির বলেছেন-

'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।

এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।'

তৃণাসন, ভূমি, জল ও মধুর বাক্য এই চারটি সজ্জনের গৃহে কখনও অভাব হয় না। তাই আর্ত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষিতকে জল এবং ক্ষুধিতকে আহার্য দ্বারা অতিথিপরায়ণতা প্রদর্শন করতে হয়।

বনপর্বে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে প্রবেশ করলে মৈত্রেয় সহ অন্যান্য ঋষিরা তাঁদের স্বাগত জানান। এই মৈত্রেয় ঋষি ব্যাসের পরামর্শে দুরাত্মা দুর্যোধনকে উপদেশ দানের জন্য হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলে মুনিশ্রেষ্ঠকে ধৃতরাষ্ট্র যোগ্য সম্মান দ্বারা অর্ঘ্যাদি দিয়ে অভিবাদন জানান। অতিথি মৈত্রেয়ের জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীকে দুর্যোধন উপেক্ষা পূর্বক ঊরুতে চপেটাঘাত

করেন ও ঈষৎ হাস্য করে অধোবদনে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে থাকেন। দুর্যোধনের এই অবজ্ঞা দেখে মুনিবর অভিশাপ দেন যে গদাযুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করবেন।[৫৩] অতিথিকে অবমাননার পরিণতি স্বরূপ দুর্যোধনের এই অভিশাপ প্রাপ্তি।

যুধিষ্ঠিরের পরামর্শানুযায়ী অর্জুন স্বর্গে যান ইন্দ্রের কাছ থেকে অদম্য দিব্য অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আলোচনায় যখন যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী আলোচনারত ঠিক সেই সময় কাম্যকবনে মহর্ষি বৃহদশ্ব এসে উপস্থিত হন। পুণ্যবান তপস্বীকে দেখে তাঁকে মধুপর্ক, নৈবেদ্য দিয়ে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানান যুধিষ্ঠির-

'আজগাম মহাভাগো বৃহদশ্ব মহানৃষিঃ

তং অভিপ্রেক্ষ্য ধর্মাত্মা সংপ্রাপ্তং ধর্মচারিণং।

শাস্ত্রবন্মধুপর্কেণ পুজয়ামাস ধর্মরাট্।।'[৫৪]

তপস্বী আতিথ্য গ্রহণের পর যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে কৌরবদের দ্বারা তাঁদের দুঃখ দুর্দশা ভোগের কাহিনী শোনেন। যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করার জন্য ঋষি তাঁকে 'অক্ষহৃদয়' বা অক্ষক্রীড়ার বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত করেন।[৫৫]

এখানে অতিথি ও অতিথিবৎসল ব্যক্তির মধ্যে এক স্বাভাবিক সম্পর্ক উপস্থাপিত হয়েছে। অতিথি তাঁর আতিথেয়তাকারীর উদ্বেগ, মনোকষ্ট সম্পর্কে অবগত হয়ে এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়ও নির্ধারণ করেছেন।

অর্জুন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য ইন্দ্রলোকে দীর্ঘদিন গমন করলে যুধিষ্ঠির সহ অন্যান্য ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী চিন্তাগ্রস্থ হন। এই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলে যুধিষ্ঠির দেবর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক আতিথেয়তা প্রদান করেন। ঋষি তাঁকে কিভাবে সাহায্য

করবেন জানতে চাইলে ভ্রাতাসহ যুধিষ্ঠির প্রণতিপূর্বক করজোড়ে জানান যে নারদ বিশ্ববাসীর দ্বারা পূজিত। তাঁর মতো অতিথি যুধিষ্ঠিরের প্রতি সন্তুষ্ট হলে নারদের কৃপায় তাঁর সমস্ত মনোবাসনা পূর্ণ হবে বলে তিনি মনে করেন।[৫৬] অতিথির পরিতৃপ্তির থেকে আর মহৎ কিছু হয় না।

কাম্যকবনে অধিবাসকালে মৃকণ্ডুর পুত্র পরম শৈব ও অত্যন্ত ধার্মিক মার্কণ্ডেয় সেখানে আসেন। ঋষির আতিথেয়তা সম্পন্ন করার পর কৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব ঋষির কাছ থেকে ধর্মাচরণের শাশ্বত নিয়ম জানতে চান।[৫৭] এই সময় ঋষি নারদও পাণ্ডবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হন। নারদকে অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা সম্যকরূপে আতিথেয়তা দিলে নারদ জানতে পারেন যে মার্কণ্ডেয় তাঁদের ধর্মকথা শোনাতে এসেছেন।[৫৮]

বনবাসের একাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে সমাগত হন ও সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ব্যাসের অতিথিসৎকারের পর তিনি আসন গ্রহণ করলে পাণ্ডবেরা আসন গ্রহণ করেন। পাণ্ডবদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য নানা পরামর্শ ব্যাসদেব দেন। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে সৎকৃত হবার পর যথাশক্তি হৃষ্টচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক উপহার দিতে হয়-

'যথাশক্তি প্রচয়েচ্চ সম্পূজ্যাভীপ্রণম্য চ।

কালে পাত্রে চ হৃষ্টাত্মা রাজন বিগতমৎসরঃ।।'[৫৯]

একদা ঋষি দুর্বাসা যদুবংশীয় রাজা কুন্তী ভোজের অতিথি হন। রাজা ঋষি দুর্বাসাকে একটি যজ্ঞোপযোগী বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষ প্রদান করেন, সুন্দর উপবেশনের স্থানসহ চমৎকার খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দেন। অতিথির পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পিত হয়

ভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর ওপর। কুন্তী সকলপ্রকার অলসতা ও অহংকার পরিত্যাগপূর্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিষ্ঠার সাথে অতিথির সেবা করেন। ঋষি কুন্তীর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে এক আশ্চর্য বর প্রদান করেন। কুন্তীকে এমন এক মন্ত্রের শিক্ষা দেন যা উচ্চারণ করলে স্বর্গীয় যে কেউ তাঁর সামনে উপস্থিত হবেন ও কুন্তীর ক্ষমতার অধীনে থাকবেন।[৬০] কুন্তীকে দুর্বাসার আতিথেয়তার কাজে নিযুক্ত করেও রাজা ভোজ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি; তিনি প্রায়শই দুর্বাসার আতিথেয়তা যথাযথ হচ্ছে কিনা তা খোঁজ নিতেন। এইভাবে কুন্তী একবছরকাল সময় ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। দুর্বাসার মত অতিথি ও ভোজের ব্যবস্থাপনায় কুন্তীর মত অতিথিসৎকারী জগতে দুর্লভ।

হিমালয়ে যাত্রার পর পাণ্ডবেরা ঋষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে এসে উপস্থিত হলে সেখানে ঋষি ও অন্যান্য তপস্বীরা তাঁদের স্বাদু, মিষ্ট ফল, হরিণের মাংস, বিভিন্ন ধরণের মধু প্রভৃতি দিয়ে আতিথেয়তা করেন।[৬১]

সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের অতিথিসৎকারের উৎকর্ষতা বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। ময়দানব নির্মিত প্রাসাদে নারদ উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে অতিথি নারদকে নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্য সহযোগে আতিথ্য প্রদান করেন। নারদ সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম, সম্পদ, আনন্দ ও মোক্ষের বিষয়ে নানা পরামর্শ দেন।[৬২]

লোকশ্রুতিতে আমরা অতিথি সৎকারের নিদর্শন পাই মহাভারতে ব্যক্ত নানা আখ্যানের মাধ্যমে। আশ্বমেধিকপর্বের এরকম একটি আখ্যান হল- কুরুক্ষেত্রবাসী এক শিলোঞ্ছজীবী বদান্য ব্রাহ্মণ কপোতের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন। একদা দারুণ দুর্ভিক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শূন্য হয়ে গেলে তিনি অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শক্তু প্রস্তুত করেন। নিত্যকর্ম সমাধার পর ব্রাহ্মণ সপরিবারে ভোজনের উপক্রম

করছেন এমন সময় এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহ্মণ এসে আহার প্রার্থনা করেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে সাদরে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে নিজের শক্তুর ভাগ নিবেদন করেন। অতিথি তা খাওয়ার পরেও তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি হল না। এরপর বারণ সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত, শীর্ণ, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী নিজের শক্তু অতিথিকে দেন। তাতেও অতিথির তৃপ্তি না হওয়ায় শীর্ণ ও বিবর্ণ পুত্রের অংশও অতিথিকে ব্রাহ্মণ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের এই নিঃস্বার্থ শ্রেষ্ঠ দান দেখে অতিথি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী স্বয়ং ধর্ম আপন রূপ ধরে প্রতিভাত হন ও পরম অতিথি সৎকারের ফলে প্রীত হয়ে ব্রাহ্মণকে স্বর্গলাভের আশীর্বাদ করেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয় কিন্তু অতিথি সৎকারী ব্রাহ্মণের অতিথিপরায়ণতারূপ কর্তব্য পালনের ফল শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলকেও অতিক্রম করে। ফলস্বরূপ গৃহী ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গলাভ করেন।[৬৩]

বনবাসে পরিভ্রমণ করার সময় মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে অতিথিসৎকাররূপ ধর্মের সন্তুষ্টি বোঝাতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন- অগ্নিদেবের প্রসাদলাভের জন্য পুষ্প-চন্দনাদি অর্ঘ্য নিবেদন করলেও সেই সন্তুষ্টি হয় না যেরকম অতিথিকে ভোজন করালে সন্তোষ লাভ হয়। এইসাথে আরও ব্যাখ্যা করেছেন অতিথির মর্যাদাপূর্বক সৎকার এবং সেবা করলে গৃহস্থ স্বর্গের অর্থাৎ স্বর্গলাভের অধিকারী হন। যদি কিছুই না করতে পারেন গৃহস্বামী তবে বিনয়পূর্বক অতিথিকে স্বাগত করলেও অতিথি সৎকাররূপ ধর্ম পালিত হয়। কারণ আন্তরিক স্বাগত জানালে সাধারণ ভোজন অমৃত হয় আর দেবতুল্য ভোজনের সমপর্যায়বাচী হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের বনপর্বে (২/৫৬) এবং অনুশাসনপর্বে (৭/৬) অতিথি সৎকারের সরল এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন- গৃহে অতিথি উপস্থিত হলে প্রসন্নতা ও প্রেমভাব প্রদর্শন করতে হয়। আন্তরিকভাবে তাঁর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ বা ভাবপ্রদর্শন আবশ্যিক। মিষ্ট বাক্য ও সদ্বাণী প্রয়োগপূর্বক অতিথিকে স্বাগত জানাতে হয় এবং

উপবেশন করে থাকলে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁকে সম্মান জানাতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথি অবস্থান করেন ততক্ষণই অতিথির সেবায় রত থাকতে হয় এবং অতিথির যাওয়ার সময় তাঁর সাথে সাথে কিছুদূর যেতে হয় এবং প্রসন্নতাপূর্বক তাঁকে বিদায় জানাতে হয়। ধর্মশাস্ত্রে অতিথির বিদায়কালে সাথে গমনের রীতিকে 'অনুব্রজ্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি আত্মোন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তিনি এই প্রকারে অতিথিযজ্ঞ সম্পাদন করবেন। মহর্ষি বেদব্যাস অতিথির আপ্যায়ন ও প্রীতিপূর্বক সৎকারকে গৃহস্থের ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন যা নিঃসন্দেহে তর্কসঙ্গত এবং উপযুক্ত সদাচার।

মহাভারত মানব সভ্যতার সর্বাধিক আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর। এই মহাগ্রন্থে মানব চরিত্রের যে জটিল রহস্য ও বৈচিত্র্য বিবৃত হয়েছে, ভারতীয় অন্য কোন সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া যায় না। মহাভারতের অন্তর্গত নয় এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব ভারতীয় চিন্তার মধ্যেও অলভ্য। এই মহাকাব্যের বহুধা বৈচিত্র্যমণ্ডিত অসংখ্য চরিত্রের বিশাল, বর্ণময় মিছিলে যাঁরা সামিল, তাঁরা তাঁদের জীবনচর্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অতিথিসৎকাররূপ শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে উজ্জ্বল মহানুভবতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমগ্র মহাভারত জুড়েই ভারতীয় জনজীবনের আদর্শসমূহ পালনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সামাজিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপিত হয়েছে। বিশাল পারাবার স্বরূপ মহাভারত মন্থনে রাশি রাশি অতিথিসেবার নিদর্শন পাওয়া গেলেও নির্বাচিত কিছু আতিথেয়তার প্রসঙ্গ এই পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. মহাভারত ১/৫৬/৩৩

২. মনুসংহিতা ৩/৭০

৩. মহাভারত ১৩/৭/৬

৪. ঐ ১৩/৭/১২

৫. ঐ ১৩/১৪৮/১৩

৬. ঐ ৩/১৫৯/৪

৭. ঐ ১/৮১/১২-১৩

৮. ঐ ১/১৭৪/৭

৯. ঐ ১/১৮৫/২০

১০. ঐ ১/৫৪/১০-১৬

১১. ঐ ১/৮৯/৩৭-৩৮

১২. ঐ ১/১১৭/১৬-১৭

১৩. ঐ ১/১৫৩-১৫৭

১৪. ঐ ১/২০০/৯-১৭

১৫. ঐ ১/১৬৫/৩-১২

১৬. মহাভারত ১২/২১৪/১২-১৪

১৭. ঐ ১২/৩০৯/৫

১৮. ঐ ১২/৩৮/২৭-২৮

১৯. ঐ ১২/৫৫/৮-৯

২০. ঐ ১২/৬১/১৪

২১. ঐ ১২/৭৮/২১

২২. ঐ ১২/৯২/৩৬

২৩. ঐ ১২/১৫২/২৩-২৪

২৪. ঐ ১২/৯৯/৮

২৫. ঐ ১২/১৮৪/১০-১২

২৬. ঐ ১২/১৮৬/১৪

২৭. ঐ ১২/২৩/২-৫

২৮. ঐ ১২/১১/৪-৫

২৯. ঐ ১২/১৮/৯-১০

৩০. ঐ ১২/১৮/২৭

৩১. ঐ ১২/১২/১১

৩২. মহাভারত ১২/২২২/৩২-৩৩

৩৩. আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২/৩/৬/৬

৩৪. মহাভারত ১৩/২/৪২

৩৫. ঐ ১৩/২/৬৯-৭০

৩৬. ঐ ১৩/৬১/৪৮-৯৩

৩৭. ঐ ১৩/৬১/৭৩

৩৮. ঐ ১৩/৩৩/৬৩

৩৯. ঐ ১৩/১২৯/১১-১৪

৪০. ঐ ১৩/৩২/১৯

৪১. ঐ ১৩/১০৭/৮৯

৪২. ঐ ১৩/৫৯/১৫

৪৩. ঐ ১৩/৩৭/১৮-১৯

৪৪. ঐ ১৩/১৮/৮

৪৫. ঐ ১৩/৯৩/১৩

৪৬. ঐ ১৩/১৩১/২৬-৪৪

৪৭. ঐ ১৩/১৩৪/৪৪-৪৬

৪৮. মহাভারত ১৩/৭২/১২

৪৯. ঐ ৫/১৭/১-৫

৫০. ঐ ৫/১০৪

৫১. ঐ ৫/৩৩/৪৫

৫২. ঐ ৫/১১৩/৬

৫৩. ঐ ১/১১/১১-৩২

৫৪. ঐ ৩/৪৯/২৯-৩০

৫৫. ঐ ৩/৭৮/১৬-১৭

৫৬. ঐ ৩/৮০/২-১০

৫৭. ঐ ৩/৮০/৩৯-৪১

৫৮. ঐ ৩/৮০/৪৪-৪৫

৫৯. ঐ ৩/২৪৫/২০

৬০. ঐ ৩/২৩৯/১৬-১৭

৬১. ঐ ৩/১৫৬/১-৫,৩০-৩১

৬২. ঐ ২/৫/৭-৯৯

৬৩. ঐ ১৪/৯০-৯২

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার লালনপালন, তার শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। তাই সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত মানুষের জীবন ও সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে একদল মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক বন্ধন তার অন্যতম উপাদান হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতির নানা সংজ্ঞা আছে। Tylor প্রদত্ত একটি সংজ্ঞা (1870) যা Avruch (1998) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রাচীন সংজ্ঞাতে সংস্কৃতির একটি আধুনিক ধারণা পাওয়া যায়। সংস্কৃতি হল সেই জটিল অথচ সার্বিক ধারণা যার অন্তর্গত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিক উপদেশ, নিয়ম, প্রথা এবং যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাস মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে আত্মস্থ করে (Culture is that complex Whole Which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs and any other capabilities and habits acquired by man)। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অপর একটি সংজ্ঞায় Matsumofo নামক এক সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন যে, সংস্কৃতি হল প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চালিত একগুচ্ছ প্রতিন্যাস, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচরণ যা একদল মানুষ পোষণ করেন, কিন্তু যা প্রত্যেক একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন (Culture is the set of attitudes, values, beliefs and behaviours Shared by a group of people but different for each individual communicated form of one generation to the next)। এই দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সংস্কৃতির মূলধারণা ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অন্যান্য সংজ্ঞাতেও এই ধরণের মত পোষণ করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে সংস্কৃতির উপাদানসমূহ কোথাও দীর্ঘ, কোথাও সংক্ষিপ্ত তালিকার সাহায্যে বলা হয়েছে।

সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা বা ঐতিহ্য, নিয়মকানুন এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবর্তিত হয় না। এগুলি মানুষের সংস্কৃতির স্থায়ী উপাদান। কোন সমাজ, জাতি, গোষ্ঠীর কৃষ্টি বা সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে স্থায়ী, কারণ তা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তি চায় তার সাংস্কৃতিক পরিচয় (Cultural Identity) ধরে রাখতে। কারণ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে যুক্ত আছে ব্যক্তির জাতি, গোষ্ঠী বা সামাজিক পরিচয়। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ একই সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অনেকটা একধরণের আচরণ করে এবং সেই আচরণের ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় না। আমরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হাঁটু ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এই দুটি প্রথাই দুটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম হলে তা নিন্দনীয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আচরণগত বহিঃপ্রকাশটি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সেই কারণে প্রথম সংজ্ঞাতে আচরণ কথাটির উল্লেখ আছে। এর পরের প্রসঙ্গ আসে মূল্যবোধের। মূল্যবোধ কথাটির সহজ অর্থ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বা ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নিজস্ব স্থায়ী প্রত্যয়। মূল্যবোধ বলতে আমরা সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্য ধরণের আদর্শ মানকে বুঝি যা একজন ব্যক্তি সমাজে অন্যদের সাথে নিজেও অনুসরণ করবে। একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় মূল্যবোধ কিছু চাহিদা, আবেগ এবং আগ্রহের গভীরতা ও মাত্রার দ্বারা চিহ্নিত হয়। মূল্যবোধ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অপরদিকে সমষ্টিগত বা সামাজিক। সামাজিকভাবে মূল্যবোধ যেকোন সমাজের সংস্কৃতির উপাদান, কারণ মূল্যবোধ আমাদের কাছে এমন একটি পরিস্রাবক হিসেবে কাজ করে যার মধ্য দিয়ে চারপাশের ঘটনাবলী, মানুষজন, তাদের আচরণ ইত্যাদির বিচার করি এবং তদনুযায়ী আমরা আচরণ করি। বাঞ্ছিত আচরণের ব্যতিক্রম ব্যাপকভাবে কোন সমাজে ঘটলে প্রায়ই তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে অভিহিত

করা হয়। সমাজতাত্ত্বিক জন ডিউই এর মতে, কোন কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করার অর্থ হচ্ছে সেটিকে পুরস্কৃত করা, সম্মান দেওয়া, প্রশংসা করা বা বিচার করা। এর অর্থ কোন কিছুকে আশা বা অনুভূতি জাগানোর বিষয় হিসেবে হৃদয়ে স্থাপক করা, অন্তর দিয়ে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য কিছুর তুলনায় সেটিকে মূল্যবান অর্থে বিচার করা।

ইংরেজি শব্দ 'Morality' এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'নৈতিকতা'। এই নৈতিকতাকে দুটি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলি হল বর্ণনামূলক এবং আদর্শমূলক। বর্ণনামূলক অর্থে নৈতিকতা বলতে আচরণের নিয়ম নীতিকে বোঝায় যা সমাজ, ধর্মীয় সংস্থার মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব নিয়ম নীতি সম্পর্কিত ব্যক্তির আচরণকে বোঝায়। কিন্তু আদর্শমূলক দিক থেকে নৈতিকতা হল একটি সার্বজনীন নিয়ম ও নীতি যা সামাজিক মানুষ অনুসরণ করে। নৃতত্ত্ববিদেরা সামাজিক প্রেক্ষাপটে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়েছেন। আবার নৈতিকতা হল যে কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতি যা ব্যক্তিরা আত্মিক উন্নতির প্রয়োজনে অনুসরণ করে বা আচরণ করে। নৈতিকতা হল নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত ব্যক্তির আচরণ। বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে নৈতিকতা হল মানব জীবনের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন দিক থেকে অন্যান্য জীবেদের থেকে মানুষকে উৎকর্ষতা ও ভিন্নতা প্রদান করে। নৈতিকতা-নির্দিষ্ট আচরণীয় নিয়মাবলীর প্রতি আত্মোন্নতি কামনাকারী ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। নৈতিকতার সরল, সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কোন গোষ্ঠী দ্বারা এমনকি কোন একক ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত, গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আচরণের নির্দেশকে বোঝায়। সদাচার বা শিষ্টাচারকে কখনও কখনও নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যখন মানব সমাজে শিষ্টাচারকে নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন নৈতিকতা প্রায় সবসময়ই বর্ণনামূলক

অর্থে বোঝানো হয়। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে শিষ্টাচার বা সদাচারের নিয়ম সমাজ বা গোষ্ঠী অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে সমগ্র মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছড়া কোনো উপযুক্ত শর্ত ছাড়াই শিষ্টাচারের অন্তর্গত পালনীয় সেই সকল 'সঠিক' নিয়মগুলিকে সযত্নে আচরণ বা চয়ন করতে হয় যেগুলি যুক্তিসংগত ও মানবিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে মানবকুল দ্বারা গৃহীত হয়। আবার এই প্রসঙ্গে আলোচ্য যে, একটি বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের নৈতিকতা তার আচরিত ধর্ম থেকে উদ্ভূত হতে পারে। নৈতিকতা ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে একই রকম নয়। নৈতিকতা পরিচালনা করার জন্য বা সমাজে নীতিবোধ প্রণয়নের জন্য শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম অতীতের অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলিকে বা গল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবহার নিষিদ্ধ বা প্রয়োজনীয় আচরণ ব্যাখ্যা করতে বা নায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনকি নৈতিকতাকে যখন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না তখন সেটিকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। এই সমস্ত আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং সমর্থন প্রয়োজন হয়। যাই হোক না কেন কিছু ধর্মীয় অভ্যাস, আচরণীয় এবং অবশ্য পালনীয় প্রজ্ঞাগুলিকে নৈতিক ভিত্তিতে সমালোচনা করা হয়। নৈতিক বাস্তববাদীরা দাবি করেন না যে, কোন সমাজের আচরণ সম্পর্কিত প্রকৃত নির্দেশক হিসেবে নৈতিকতা আছে বা কখনো নিয়মাবলীর আকারে বা দৃষ্টান্ত সহযোগে তৈরি করা হয়েছে। নৈতিকতার সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাকৃতিক আইন তত্ত্বগুলি দাবি করে যে, কোন সমাজের যেকোনো যুক্তিপূর্ণ, সদাচারী ব্যক্তি এমনকি কোন ব্যক্তির যদি ত্রুটিপূর্ণ কোন নৈতিকতা থাকে তাহলে সে নৈতিকতা নিষিদ্ধ। প্রাকৃতিক কারণেই নৈতিকতার নিষিদ্ধতা, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ যা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিদের প্রকৃত জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট। অতএব নৈতিকতা সম্পর্কিত সংজ্ঞা সেটি বর্ণনামূলক বা আদর্শগত যাই হোক না কেন, এটি একটি আচরণ বিধি। নৈতিকতার প্রায়শই কোন বিশেষ সামগ্রী নেই যা আইন বা ধর্মের মত নৈতিক আচরণ থেকে আলাদা করে। নৈতিকতা ভালো বা

খারাপ, সঠিক বা ভুল, নৈতিক এবং অনৈতিকতা হিসেবে ধারণা কাছাকাছি ঘূর্ণায়মান। কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ করতে হয় সে সম্পর্কে নৈতিকতা আমাদের একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে থাকে। নৈতিকতা শব্দটিকে নীতিশাস্ত্র বা আইনের মতো অর্থ করে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। নীতিশাস্ত্র নৈতিকতার সমার্থক হতে পারে কিন্তু নীতিশাস্ত্র কিছু নিয়মকে অনুসরণ করে গঠিত হয়; আর এই নিয়মগুলি সম্পূর্ণ অলিখিত। যেহেতু নৈতিকতা মূলত অস্পষ্ট আইন, তাই আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং নৈতিকতা দ্বারা নির্ধারিত প্রকৃত আইনগুলির সঙ্গে জড়িত বিভ্রান্তিগুলি এড়ানো অবশ্য কর্তব্য। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন নৈতিক মান অনুসরণ করেন প্রকৃত অর্থে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য। এটি প্রয়োজনীয় নয় যে সমাজের সকল সদস্যকে অবশ্যই নৈতিক মূল্যের একই দিক অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটি অপরিহার্য যে সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলির বিষয়ে অবগত হতে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই ঐক্যবদ্ধতা শুধুমাত্র মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথেও একাত্মতার সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। একটি সমাজের শিকড় সুদৃঢ় করার জন্য, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বোপরি মানবিক উত্তরণের জন্য মানুষকে নৈতিক আচরণের মৌলিক বিধিগুলি মানতে হয়। যাকে সমাজতত্ত্বের ভাষায় নৈতিকতার প্রাকৃতিক আইন বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই স্বাভাবিক পালনীয় আইনগুলি সর্বকালে সর্বযুগে সময়ের সঙ্গে একই রকম গরিমায় অবস্থান করে, এগুলি মানুষের মৌলিক প্রকৃতিকে অর্থাৎ মানবীয় উৎকর্ষ সাধক গুণাবলীকে বিকশিত করতে সহায়তা করে।

মানবিক ক্রমোত্তরণের আরেকটি সোপান হল মানুষের মূল্যবোধ। Oxford Dictionary-র মতে, ‘Value’ শব্দের অর্থ হল ‘Worth’ বা মূল্য। সমাজবিজ্ঞান কোশে

মূল্যবোধ শব্দটিকে আগ্রহ, আনন্দ, পছন্দ, কর্তব্য, নৈতিক দায়িত্ব, ইচ্ছা, চাহিদা প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। মূল্যবোধ হল সমাজ-অনুমোদিত ইচ্ছা ও লক্ষ্যসমূহ যেগুলি অনুবর্তন প্রক্রিয়া, লিখন, আচরণ ও সামাজিকীকরণের দ্বারা অন্তর্মুখীন হয় এবং যেগুলি মানুষের নিজস্ব অগ্রাধিকার, মানদণ্ড ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য একটি সামাজিক ধারণামূলক বৈশিষ্ট্য হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ও আচরণের নিরিখে তা পরীক্ষিত হয়। Value এর সমার্থক শব্দ হল 'ইষ্ট' (The Object of desire)। যেহেতু মানুষ তার ইষ্টকে অতি সচেতন ভাবে অন্বেষণ করে চলেছে তাই ভারতীয় দার্শনিকেরা মূল্য বলতে সর্বোচ্চ মানবমূল্য বা পুরুষার্থকে ইঙ্গিত করেছেন- যার অর্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সংক্রান্ত ন্যায়কে নির্দেশ করে। ভারতীয় দর্শনের তথা সনাতন সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল মানবিক মূল্যবোধকে সংগতিপূর্ণভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূল্যবোধ হল একটি নীতি, আদর্শমান ও গুণ যা যোগ্য ও বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়িত আচরণ হল সচেতনভাবে বাছাই করা বাঞ্ছিত আচরণের ধারণা যা আগ্রহদীপ্ত মানবিক কল্যাণকর চাহিদার পূরণ ঘটায় এবং যার স্থায়িত্ব ও সামাজিক অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যক্তিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই আচরণকে আদর্শায়িত বলে ধরে নিয়ে অন্য আচরণকে এর নিরিখে বিচার করা যায়। যে কোন মানবিক কাজ, চিন্তা অথবা ধারণা, অনুভূতি অথবা আবেগ যা মানুষের সর্বাধিক সার্বিক আত্মবিকাশের অগ্রগতি ঘটায় তারই মূল্য আছে। মূল্যবোধের অপর একটি পরিপূরক কাজ হল এটি বৃহত্তর সমাজ, যেমন পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি যার অন্যতম সদস্য হল ব্যক্তি- সেই ব্যক্তি সকলের কল্যাণের ক্ষেত্রেই নিজের অবদান রাখে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধারণানুযায়ী মূল্যবোধের ধারণায় কিছু পার্থক্য আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'ধর্ম' এর পরিবর্তে পাশ্চাত্যে যুক্তির বিচারে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মূল্যবোধ হল জৈব মানসিক প্রবণতা ও সকল কল্যাণকর আচরণের উৎস। ভিন্ন ভিন্ন

পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন প্রকার আচরণ করলেও তার আচরণাবলীর মধ্যে সুসংহত সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কারণ মানুষের অন্তরস্থ মূল্যবোধ এই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব শুধু নয় ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষতা নির্ভর করে মূল্যবোধের ওপর। ব্যক্তিগত মান, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উপাদানের দ্বারা মূল্যবোধ প্রভাবিত হলেও প্রাচ্যের মূল্যবোধের ধারণা পাশ্চাত্যের থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মচর্য, পাতিব্রত্য, সতীত্ব, সদাচরণ, পিতা-মাতা-দেবতা-অতিথির সেবাযত্ন, বাৎসল্য প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যে মূল্যবোধের অসীম গুরুত্ব। ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতির আদর্শ মাত্রার মত হল মূল্যবোধ। UNESCO প্রকাশিত Document অনুযায়ী সংস্কৃতি হল কোন সমাজ বা গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক, বস্তুগত, বৌদ্ধিক এবং আবেগমূলক বৈশিষ্ট্যের সমাহার। এটি কলা ও সাহিত্যের সাথে সাথে সমাজের জীবনরীতি, একত্রে বাস করা, মূল্যবোধ রীতি এবং প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। মনের মনোবৈজ্ঞানিক কর্ষণ হল সংস্কৃতি যা মূল্যবোধের জন্ম দেয়, যে মূল্যবোধ মানুষের আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। সেজন্য সংস্কৃতি হল মানবমনকে সংস্কৃত করা বা মানব মনের সংকর্ষণ। সংস্কৃতি হল মানসিক সংগঠনের সেই মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার ফলে পার্থিব বিষয়, সামাজিক কর্তব্য, আচরণীয় বা পালনীয় বিধি সম্পর্কে এবং ব্যক্তি সম্পর্কে মনের মৌল, সহজাত ধারণা তৈরি হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি হল মূল্যবোধের অন্যতম উৎস। প্রাচীন ভারতে 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'কর্তব্যপরায়ণতা' অত্যন্ত অবশ্য পালনীয় দুটি মূল্যবোধ বলে বিবেচিত হত। আমাদের দেশ মহান মূল্যবোধের দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত। এই দেশে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ঐতিহ্যমণ্ডিত। উপযোগিতা (Usefulness), উৎসর্গ (Sacrifice), ও আত্মত্যাগ (Renunciation) হল ভারতীয় সংস্কৃতির তথা মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান সমূহ। একটি জাতির শিক্ষা তার সভ্যতার আদর্শের ওপর নির্ভর করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমাদের সভ্যতার আদর্শ ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। সুতরাং প্রাচীন

ভারতের সভ্যতা বর্তমান যুগে প্রচলিত ‘দোকানদারি নীতি’ বা রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ ও অপর জাতিগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তাররূপ স্বার্থপর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে আধ্যাত্মিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবলমাত্র বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন উচ্চতম আদর্শ রূপে গণ্য হয়। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্বন্ধজ্ঞানরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হল মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন মনীষীদের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষার যে মূলনীতিগুলি উপলব্ধ হয়েছি তাদের অবলম্বন করেই জগতের নানা পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত আতিথ্যগুণ বা আতিথেয়তার বিশ্লেষণে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সদাচার বা শিষ্টাচার প্রভৃতির আলোচনা তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ। উন্নত মননযুক্ত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীন অতিথিসেবা নামক রীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে খুব স্বভাবতই প্রসঙ্গক্রমে ভারতের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি আপতিত হয়। প্রযুক্তিগত, কৌশলগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতাই সার্বিক উন্নতির মাপকাঠি নয়। যান্ত্রিক এই জড় জগতে আত্মিক, চারিত্রিক, মানসিক, আচরণগত উন্নতি সাধিত না হলে আমরা কোনভাবেই সামগ্রিক আধুনিকতার সাথে সাথে উন্নত হতে পারি না। তাই প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয়দের মানবিক কর্তব্য পরিপালনের সাথে অতিথি-অভ্যাগত সৎকারাদি শিষ্টাচার কিভাবে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রাচীন এই ধারার প্রাসঙ্গিকতা অতিযান্ত্রিক যুগে আদৌ অস্তিত্বশীল কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই বিশদ অবতারণা।

ভারতীয়দের প্রাচীন আদর্শ যেকোনো জাতির আদর্শ অপেক্ষা বিশালতর ও শ্রেষ্ঠ। যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ-স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করতে চাই। এটি মোক্ষের নামান্তর। মোক্ষ শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে

মুক্তিলাভ। এই বন্ধন মুক্তি জগতের আর সমস্ত স্বাধীনতার ভিত্তি। এই আধ্যাত্মিক মুক্তি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং এই মুক্তি লাভ করাই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে আমাদের পূর্বসূরীদের আচরণ থেকে, নির্দেশিত কর্তব্য পালনের আদেশ থেকে আদর্শ গ্রহণ করে প্রাণপণে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কারণ এই অজ্ঞান মুক্তিই সর্ব্বোচ্চ ও চরমমুক্তি। আধ্যাত্মিক মুক্তি অনন্তকাল স্থায়ী। জাতির শিক্ষার আদর্শ জাতীয় আদর্শের অনুরূপ হওয়া উচিত। ভারতীয়দের মনোরাজ্য স্বতঃই আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে ধাবিত, এর কারণ আমরা ধর্ম থেকে আধুনিক সমাজের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলি শিক্ষা করি। মূলত সকল ধর্মের প্রধান শিক্ষা ও আদর্শ একই প্রকারের। ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম ও পবিত্রতা এগুলিই ধর্মের আদর্শ। যিনি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করেন, যিনি সর্বভূতে দয়ালু, প্রেমবান, সহানুভূতিসম্পন্ন, যিনি ভালোবাসার দ্বারা ঘৃণা ও বদান্যতার দ্বারা লোভ জয় করেন, তিনি হিন্দুর আদর্শে তথা ভারতীয় আদর্শে প্রকৃত বিশ্বাসী। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের দ্রব্য চুরি করে সে ভারতের দৃষ্টিতে সভ্য পদবাচ্য নয়। একথা সত্য যে পৃথিবীর আর অন্য কোন আদর্শের দিক দিয়েও সে সভ্য নয়। বিশ্বের সকল ধর্মের আদর্শ একই হয়। মানবের বহিঃপ্রকৃতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে তার বিচার করা উচিত। কারণ বাইরের স্বভাব, পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যবহারিক জীবন, ভদ্রতা প্রভৃতি বলতে গেলে কিছুই নয়; অন্তরের পবিত্রতাটুকুই সারবস্তু। আর এই আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা আসে নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে অনুপ্রাণিত শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে। অতিথি-অভ্যাগত সেবাকে যেহেতু শিষ্ট আচরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই এই আচরণ পালনে আসে পবিত্রতা ও শুচিতা। যে আচরণের পরিণাম মানবজাতির মধ্যে বিরোধ ও পার্থক্যের ভাব সৃষ্টি ক'রে, ভ্রাতৃত্ববোধের একতাবন্ধন শিথিল করে তাকে কিছুতেই উন্নতি বিধানকারী লোকহিতকর আদর্শ বলা যায় না। তা কখনো একটি জাতির আদর্শ হতে পারেনা। শাস্ত্র নির্দিষ্ট আচরণের

ফলে এই আদর্শগত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সদাচারের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার সংগ্রামে ও জীবিকার্জনের সহায়ক ব্যবসায়রূপ আদর্শ সংযুক্ত মানসিক বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন নয়, যা নিতান্ত সাধারণ স্বার্থসর্বস্বতার পঙ্কিল অবস্থা থেকে মানবকে উদ্ধার করে। এরূপ মহান ভাবের সার্বজনীন নিঃস্বার্থ আদর্শের ওপর মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যা কিছু এই মহান ও বিরাট আদর্শের সমক্ষে শ্রদ্ধাবনতঃ চিত্তে মাথা নত করতে প্রণোদিত করে তাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভারতীয় জীবনচর্যা পালনরূপ শিক্ষার উন্নত আদর্শ।

'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।'[১]

অর্থাৎ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হতে গরু, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যেও যিনি সার্বজনীন অদ্বিতীয় আত্মার অধিষ্ঠান দেখেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, সমদর্শী ও বিদ্বান এবং জ্ঞানী- একসময়ে এটি ছিল আমাদের ভারতের আদর্শ। ভূতযজ্ঞে সেই মনুষ্যেতর জীবেদের সেবার মাধ্যমে এই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে জনসাধারণ তা বিস্মৃত হয়েছে এবং নিঃস্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃভাবের স্থান আজ স্বার্থপরতা অধিকার করে বসেছে। প্রাথমিক সংস্কৃত পুস্তকে আমরা পাই-

'অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্।।'[২]

ভারতের সংসদ ভবনের প্রবেশ দ্বারেও দেবনাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে মহোপনিষদের মহাবাক্য- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল-

'অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।'[৩]

উপনিষদের এই উদার আধ্যাত্মিক দর্শন পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে ও বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিকদের রচনায় স্থান করে নিয়েছে। প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে তামিল সঙ্গম সাহিত্যে তামিল কবি কানিয়ান পূনগুণন্দ্রনার কবিতায় বর্ণিত হয়েছে- 'যথুম্ ঊরে যবরুম্ ঊরে যবরুম্ কেলির' (Every place is my home town, Everyone is my kith and kin) [৪]।

বসুধা+এব=বসুধৈব। বসুধা- বসু+ধা+ক। বসু শব্দের অর্থ রত্ন। বসূনি রত্নানি দধাতি ধারয়তি ইতি বসুধা। অমরকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'সুবর্ণদীনামকরত্বাৎ তথাত্বম্। পৃথিবী ইতি'। সাহিত্যদর্পণে বসুধা শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

'রাজ্যে সারং বসুধা বসুধায়াং পুরং পুরে সৌধম্।

সৌধে তল্পং তল্পে বরাঙ্গনা সর্বস্বম্।।'[৫]

বাজসনেয়ি সংহিতায় উক্ত হয়েছে – 'বসুশ্চেতিষ্ঠৌ বসুধা তমশ্চ' [৬]। 'বসুধাতমঃ বসূনাং ধনানাং দাতৃতমঃ' (মহীধরভাষ্য)। সনাতন ভারতীয় গবেষণা অনুসারে বসুধা পৃথিবী রত্নময়ী, রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসূ। এই রত্নপ্রসূ পৃথিবীর সন্তান মানুষও মহান। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়- 'তোমার ভিতরে অসীম শকতি তুমি আনন্দময়'। মহান, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মানুষ রত্নপ্রসূ বসুধার সন্তান। তারা যে যেখানেই থাকুন না কেন মাতৃসম্বন্ধে সকলেই অন্বিত, পরস্পর পরস্পরের নিকটতম আত্মীয়–'কুটুম্বকম্'। কুটুম্ব শব্দের অর্থে শব্দরত্নাবলীতে বলা হয়েছে জাতি, বান্ধব, সন্তান প্রভৃতি –'কুটুম্বেন পুত্রদারাদিপোষ্যবর্গেণ ব্যাপৃতঃ সংযুক্তঃ'। কুটুম্ব শব্দের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে- কুটুম্বয়তে পালয়তি। কুটুম্ব+অচ্। অথবা কুটুম্ব্যতে পাল্যতে সম্বধ্যতে বা কুটুম্ব + কর্মণি ঘঞ্। মনুসংহিতায় উপলব্ধ হয়-

‘তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।

শ্রুতিশীলে চ বিজ্ঞায় বৃত্তিং ধর্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।।’[৭]

‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’- এখানে কুটুম্ব শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় প্রয়োগের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে আত্মার সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করে নৈকট্য বোঝাতে ‘ক’ প্রত্যয় প্রয়োগে ‘কুটুম্বক’ শব্দ নিষ্পন্ন। বৈদিক ভারতের একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ এই মহাবাক্যে। বৈদিক এই ভাবনা ও দর্শন ভারতবর্ষকে শিক্ষা দান করেছে সকলকে নিয়ে পথ চলার পদ্ধতি। ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন-

‘মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ সতস্য।

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।।’[৮]

যে সংকীর্ণচিত্ত, তার অর্জিত ভোগ্যবস্তু ব্যর্থ। স্বার্থপরের সঞ্চিত বস্তু সত্যই তার নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনে। যে সম্মানিত এবং সুহৃদবর্গকে পোষণ করে না, কেবল একাকী ভোগ করে, সে শুধুই পাপ অর্জন করে। তাই ভারতবর্ষের চিরন্তনী ঘোষণা- ‘ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্’, ‘ত্যাগেনৈকমমৃতত্ত্বমানশুঃ’, ‘ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ’। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ - এই সনাতনী ভারতীয় উপলব্ধির মূলেও রয়েছে আর্যমনীষার সেবা ও ত্যাগের ভাবনা। সনাতন ভারতবর্ষের এই একাত্ম ভাবনা ভারতবাসীর মনন-চিন্তন ও বৌদ্ধিক জগৎকে সুদূর অতীত থেকেই প্রভাবিত করে আসছে। সেজন্য ভারতীয় শাস্ত্রসাহিত্যে বিশ্বজনীনতার, সেবাপরায়ণতার উদার আদর্শ বাঙ্ময়রূপ পরিগ্রহ করে। ভারততনুর প্রতিটি অণুতে বেদ-উপনিষদের তথা সনাতন সংস্কৃতির পরিচায়ক বিশ্বাত্মৈকত্ব সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত। বিশ্বাত্মৈকত্ব প্রতিনিয়ত

অনুরণিত হচ্ছে সুদূর অতীতকাল থেকেই। এর ফলে ভারতবর্ষের কেবল অধিকার রয়েছে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ এই মহাবাক্য উচ্চারণের। আর্য ভারতের সদাচার, পারস্পরিক সহাবস্থানের উদার মানসিকতা, পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, সর্বোপরি সমগ্র জগদ্বাসীর প্রতি একাত্মবোধ লক্ষ্য করে মহর্ষি মনু সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন-

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।।[৯]

এই দেশে জাত অগ্রজন্মা বেদবিদ্ ব্যক্তিবর্গদের কাছ থেকে পৃথিবীর সমগ্র মানব সম্প্রদায় নিজ নিজ জীবনাচরণ পদ্ধতি শিক্ষা করবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহর্ষি মনুর এই উক্তি কি তাঁর অত্যধিক স্বদেশ প্রীতি না আত্মম্ভরিতার প্রকাশ? পৃথিবীর সকল মানব সম্প্রদায় কেন ভারতবর্ষের অগ্রজন্মা বেদজ্ঞদের থেকে নিজেদের জীবনচর্যার পদ্ধতি শিখবেন? এই প্রশ্নের উত্তর হল- মহর্ষি মনুর এই উক্তি তাঁর অত্যধিক স্বদেশ প্রীতি বা আত্মম্ভরিতা, কোনটাই নয়, এটি বাস্তব সত্য। কারণ বর্তমান মানবসভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে এই ভারতবর্ষে- ভারতবর্ষের ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্ত অঞ্চলে। স্বাধীন ধর্মাচরণ ও জীবনাচরণের অধিকার সকলেরই আছে; আর ভারতবর্ষ এই সত্য বিশ্বাস করতো বলেই সমগ্র পৃথিবীকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করা তার পক্ষে শুধু সম্ভবই হয়নি সেবাশীল হওয়ার উন্মুক্ত মনোভূমিকে গঠন করতে সাহায্য করেছে।

এ আমার বা তোমার এই পার্থক্য শুধু ক্ষুদ্রচেতা মানবেরা করে থাকে। যাদের মন উদার ও প্রশস্ত তারা সমগ্র সংসারকে আত্মীয় ভাবেন। বসুধার সমগ্র মানবজাতিকে কুটুম্বজ্ঞান একমাত্র ভারতীয় মননের উদারতার পরাকাষ্ঠা। আত্মীয়, কুটুম্ব যেমন আমাদের আপ্যায়নযোগ্য

তেমনি জগতের সকলের সাথেই ভারতীয় মননের আত্মার সম্পর্ক। মানুষ আপনাকে যেমন ভালবাসে, অপরকেও ঠিক সেই রকম ভালবাসবে। এটি ভারতীয়দের ধর্ম। সার্বজনীন ধর্মের এই আদর্শ পরিহার করে আধুনিক মানুষ ব্যবসায়বুদ্ধি ও বাণিজ্যবাদের মোহে মত্ত হয়ে যে উদ্দেশ্যে অর্থকরী বিদ্যার চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে; এতে তার সুকোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি শুষ্কতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সার্বজনীন মানবিক ধর্মের আসনে বণিকবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা মনুষ্যত্বের অধোগতির পরিচায়ক। পৃথিবীতে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের মধ্যে অন্তঃসলিলা নদীর মত মানবিক উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত সত্য বিদ্যমান। এটি নাম ও আকারহীন। এই নাম ও আকারের অতীত বিশ্ব মানবধর্মকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রূপে বিশ্বের দরবারে আধুনিক সমাজে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। প্রায় ভুলতে বসা প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির সম্যক আচরণের মাধ্যমে সনাতন ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। যে পবিত্র উত্তরাধিকার, সদাচার পালনের যোগ্যতা চিরমুক্তিকামী ভারতবাসী পেয়েছিল তা আধুনিক সমাজে জীবনের দৃষ্টান্তে ধর্মের সাধন তৎপরতায় সত্য সাধনার পথকে পুনরায় জগতের কাছে উন্মোচিত করার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তা পরিপালনের ঐতিহ্য-গাম্ভীর্য ও সত্য সাধনার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ভাব অত্যন্ত বেশি। ভারতীয় আতিথ্য পরম্পরায় 'কর্তব্য' শব্দটিতে একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে। মানুষ নিজের কাছে কতটা ঋণী, সমাজের কাছে মানুষের কি পরিমাণ ও কত ঋণ, জাতির কাছে, মাতৃভূমির কাছে এবং অবশেষে সমস্ত জগতের কাছে তার ঋণ কিরূপ তা স্থির করলেই 'কর্তব্য' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা সম্ভব। ইংরেজি ভাষার অন্তর্গত Duty শব্দের সাথে তুলনা করলে কর্তব্য শব্দের অর্থের মধ্যেই ব্যাপকতার মাত্রা যে অত্যন্ত প্রবল তা বোঝা যায়। এ জন্য কর্তব্য ও অধিকার (Right) এই শব্দ দুটির প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। মানুষ যখন অধিকারের কথা ভাবে তখন এই চিন্তাই

করে যে নিজের দাবি অন্যের কাছে কতখানি। কিন্তু কর্তব্য সকল সময়ে পরার্থপরতা বা নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশের যাথার্থ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে থাকে। সেজন্য পাশ্চাত্যের সভ্যতায় অধিকারবাদের গুরুত্বই আমাদের ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে নানা বিরোধের ব্যাপার হয়ে যায়। আবার কর্তব্যের মূলসূত্র নির্ণয়ের ব্যাপার হলেই সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছা ও এসে উপস্থিত হয়। অতএব পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্য দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কৌশল কার্যকরী উপায় রূপে গণ্য হয় না। পাশ্চাত্যে লোকেরা বেশিরভাগ সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় আর প্রাচ্য দেশে আমরা কর্তব্য পালনের জন্য হৃদয়বৃত্তিকে প্রাধান্য দিই। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এখানেই মূলতঃ প্রভেদ। সনাতন সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে অতিথি সৎকারকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রূপে প্রাচ্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি জাতির দৃষ্টিতে অন্য দেশীয় যে কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি অপেক্ষা তার নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিভাত হয়। আধুনিক যুগে এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই সভ্যতার পক্ষে পরস্পর পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার এবং সাথে উৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের পরিকল্পনায় প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্পন্ন সভ্যতার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে তখনই যখন প্রাচ্যের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্যগুলির গুরুত্ব প্রতিপাদন করা যাবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন পর্যায়ে মানবিক গুণাবলীর মধ্যে আতিথেয়তা চরম ঐতিহ্যশালী ও পালনীয় কর্তব্যরাজির অন্যতম; তাই আধুনিক সমাজে ভারত সংস্কৃতির এই প্রাচীন ঐতিহ্যের আদর্শ অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতের সাথে বর্তমানযুগে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটি নিবিড় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয়দের আমেরিকার লোকেরা নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিকভাবে বিশেষরূপে উন্নত এবং পৃথিবীর মধ্যে দার্শনিক বিচারে সর্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করেন। বর্তমান যুগে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে চলেছে। এদের মধ্যে একটি শক্তি সর্বদা আমাদের স্বাধীনতাকে, মানবিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার চেষ্টা করছে এবং সুনীতি ও জাতীয়তা-মানবিকতা থেকে আমাদের ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করবার চেষ্টা করছে। আমাদের পরস্পরকে বিছিন্ন করে দিয়ে আমাদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। অপর শক্তিটি আমাদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তা-মানবিকতা বোধ জাগ্রত করছে এবং সমস্ত ধর্মের মূল লক্ষ্য মহামুক্তির পথে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এই বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্যে কোন্ আদর্শকে আমরা গ্রহণ করব? স্বার্থসাধনের বশবর্তী হয়ে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও হীন উদ্দেশ্যসাধনকে প্রাধান্য দেওয়ার দ্বারা কোন যুগে কোনজাতিই মহৎ হতে পারেনি। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানবতার বেদীমূলে বলি দেওয়ার ফলেই মহামানবদের দ্বারা বিচিত্র গৌরবময় যাবতীয় মহাকার্য সম্পন্ন হয়েছে, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য জীবনের প্রাত্যহিক বিষয়ে ও প্রতিটি পদক্ষেপে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য সমাধানের জন্য প্রবৃত্ত হতে হয়। মাত্র একটি জীবনের সাধনার দ্বারাই মানুষ দিব্যজ্ঞান ও মুক্তিলাভ করতে পারে না। আত্যন্তিক মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত কোন মানুষই কখনও চরম শান্তি লাভ করতে পারে না , এই মুক্তি বা শান্তি লাভই সমস্ত লোকেরই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত; পরিণামে সাফল্য ও গৌরব লাভ সুনিশ্চিত। প্রাচীন ভারতসংস্কৃতিতে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম ধর্ম যথাযথ পালনের জন্য মানুষের কর্তব্য-বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। জীবনের এই পর্যায় বা আশ্রমগুলি সত্যই সুন্দর এবং প্রকৃতপক্ষে আদরণীয় বটে। এই চার আশ্রমের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতি হিসাবে আতিথেয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বর্তমানকালে আমাদের জীবনের আদর্শ অনেক ছোট হয়ে গেছে। বর্তমান সমাজে কেবল এক গৃহস্থাশ্রম আছে; আর তিন আশ্রমের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছে। আর সেজন্যই বলতে গেলে শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি

ও ধর্মবোধের প্রভূত অবনতি ঘটেছে। পুনরায় আধুনিক সমাজে এই চার আশ্রমের আদর্শ পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে দেশের, সমাজের মঙ্গল হবে ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাবে। কুশিক্ষা ও অতিযান্ত্রিক আদর্শে আমাদের জীবনকে অনেকাংশে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করছি এবং ধর্মের ও সদাচারের সাধনাও সেকারণে মলিনতা প্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত যে আচরণগুলি পালনের মাধ্যমে আমাদের জীবন পবিত্র ও উদার হবে, চরিত্র নির্মল হবে সেগুলির প্রতি যত্নশীল হওয়া। সংস্কৃত সাহিত্যে আলোচিত বিভিন্ন সদাচার আমাদেরকে আধুনিক সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, উদারতা, মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। এই বর্ণিত সদাচারগুলির পালনে আধুনিক সমাজ অবশ্যই ফিরে পেতে পারে বিলুপ্ত বৈদিক ভারত-সংস্কৃতির গৌরব, পুনরায় নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হোক ভারতীয় সংস্কৃতি।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বহু আদর্শ দান করে চলেছে। অতীত বৈদিক যুগের অতিপ্রাচীন কাল থেকে যুগে যুগে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জনজীবনমূলক সংস্কারাদি আধুনিক যুগেও অতি প্রাসঙ্গিক। জগতের কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত করার অমিত শক্তি ভারত-নির্দিষ্ট শিষ্টাচারেই একমাত্র উপলব্ধ হয়। সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক, মানবিক অধঃপতন রুখতে আতিথেয়তা প্রদর্শন, আতিথ্যগুণ সমন্বিত হওয়া, অতিথিবাৎসল্য প্রভৃতি সদাচার আশ্চর্যভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। যেহেতু অধ্যাত্মমুক্তিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাই এই আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতা ও হিংসাবুদ্ধিশূন্য, সহানুভূতিশীলতার সাথে জীবন যাপন অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক সমাজ অতিথিসৎকাররূপ মহাদর্শে অনুপ্রাণিত হলে সকলেরই জীবন মহৎ ও পবিত্র হয়ে উঠবে। এই সদাচার পালনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ কর্মনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ, স্বার্থবুদ্ধিশূন্য হতে পারে – যা উদার হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক।

বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য-পারাবারে অজস্র উদাহরণের মাধ্যমে অতিথি-আতিথ্য প্রসঙ্গটি বারংবার পল্লবিত হয়েছে। গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বৈদিক সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে আতিথেয়তার বিষয়টি বিশদে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মহাকাব্য, গল্পসাহিত্য প্রভৃতিতে দৃষ্টান্ত সহকারে অতি প্রাঞ্জল পদ্ধতিতে আতিথেয়তা বিশ্লেষিত হয়েছে। খুব সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা প্রস্ফুটিত করা হল –

মহাকবি মাঘবিরচিত ‘শিশুপালবধম্’ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ইন্দ্রের অনুরোধে অত্যাচারী শিশুপালকে বধের প্রসঙ্গে নারদ যখন বার্তাবাহক হয়ে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সকাশে উপস্থিত হলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বসেছিলেন এক উচ্চাসনে। ব্রহ্মজ্ঞানী নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য এবং তাঁর অতিথি । তাই সম্যক অতিথি সৎকারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই বিনয় প্রদর্শন –

‘পতৎপতঙ্গপ্রতিমস্তপোনিধিঃ পুরোঽস্য যাবন্ন ভুবিব্যলীয়ত।

গিরেস্তড়িত্বানিব তাবদুচ্চকৈর্জবেন পীঠাদুদতিষ্ঠদচ্যুতঃ’।।[১০]

এরপর সংসারমহীরুহের বীজস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্যাদি দানে নারদকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্যক অতিথিসৎকার করলেন –

‘তমর্ঘ্যমর্ঘ্যাদিকয়াঽদিপুরুষঃ সপর্য্যয়া সাধু স পর্য্যপূপুজৎ’ ।[১১]

অমর কবি কালিদাস বিরচিত সাহিত্যপ্রতিভাতেও বারংবার অতিথি সৎকার ও আতিথেয়তা প্রদর্শন সুচারুরূপে শৈল্পিক ও কাব্যিক আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। ‘রঘুবংশম্’ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে মহারাজ দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করলে রাজাকে মহিষীর

সাথে আশ্রমে সমাগত দেখে আশ্রমবাসী ঋষিগণ তাঁদের পরম সমাদরে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করলেন –

“তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্তে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ।

অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে”।[১২]

এরপূর্বে আশ্রমে প্রবেশের প্রাক্কালে পথিমধ্যে গ্রামের যাজ্ঞিকেরা, বৃদ্ধ ঘোষগণ অর্ঘ্য, উপঢৌকনের মাধ্যমে, আশ্রমের হোমাগ্নি অদৃশ্যভাবে দিলীপকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছে।[১৩] এই মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে কৃতবিদ্য তাপস ব্রাহ্মণ কৌৎসকে অসাধারণ-চরিত, প্রথিতযশা পরম আতিথেয় রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করার পর সামান্য মৃন্ময়পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্বক অতিথিকে অভ্যর্থিত করেছিলেন।[১৪] বিদর্ভরাজের ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় যোগদানের জন্য অজ বিদর্ভে গেলে আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে মহারাজ ভোজ আপন রাজ্যে অজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।[১৫] ‘নলোদয়ঃ’ কাব্যের ৩য় সর্গে নলের অন্বেষণে দময়ন্তী দুর্নীতিনিবারক মহারাজ সুবাহুর সমৃদ্ধ রাজধানীতে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে উপস্থিত হলে রাজমাতা পরম সমাদরে দময়ন্তীকে এমন যত্ন পূর্বক আপ্যায়ন করেন যে অতিথি দময়ন্তীর মনের সকল ত্রাস দূরীভূত হয়।[১৬] ‘কুমারসম্ভবম্’ মহাকাব্যের পঞ্চমসর্গে তপশ্চরণে ব্যাপৃতা তপস্বিনী পার্বতীও ব্রহ্মচারীকে যথাযোগ্য আতিথ্য প্রদর্শন করেছেন।[১৭] ‘কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্’– প্রবাদের সূত্র ধরেই বলা যায় যে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম অঙ্কে অতিথিসেবার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আগত রাজা দুষ্যন্তকে বৈখানস জানাচ্ছেন যে – কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈব প্রশমনের জন্য পিতা কণ্ব সোমতীর্থে গমন করেছেন এবং মহর্ষির অনুপস্থিতিতে কন্যা শকুন্তলার উপর কণ্ব অতিথিসেবার ভার ন্যস্ত করে গেছেন –‘ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ

প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ'। বৈখানস রাজা দুষ্যন্তকে অনুরোধ জানান আশ্রমবাসীর আতিথ্য গ্রহণের জন্য। এখান থেকে খুব স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে আতিথেয়তা শুধু গৃহীর ধর্ম ছিল না, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কতিতে আশ্রমিক পরিবেশে থাকা মানুষেরাও অতিথি সৎকারনামক কর্তব্যটি সুচারুরূপে পালন করতেন। এরপরে ৪র্থ অঙ্কে অতিথিরূপে আগত কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি পতিচিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলা টের না পেয়ে অতিথিবাৎসল্য প্রদর্শনে অসমর্থ হওয়ায় দুর্বাসার অমোঘ অভিশাপে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ জীবন হয় বিড়ম্বিত –

'আঃ অতিথিপরিভাবিনি,

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা

তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্

কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।' [১৮]

এরপরে স্বভাব কুটিল দুর্বাসাকে আতিথ্য প্রদানের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। তাঁরা পাদ্য ও অর্ঘ্যের দ্বারা দুর্বাসার অভ্যর্চনা করে আশ্রমিক সামাজিকতাকে রক্ষার পাশাপাশি শকুন্তলার অপরাধ অপনোদনের চেষ্টা করেন। ৫ম অঙ্কে দুষ্যন্তের রাজসভায় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলাকে নিয়ে উপস্থিত হলে সেখানেও তাঁরা রাজসভায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিপরায়ণতা ছিল সার্বজনীন। আশ্রমের তপস্বী থেকে শুরু করে রাজসভার রাজন্যবর্গসহ সভাসদাদি সকলেই অতিথিবৎসল ছিলেন।

অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিতম্' এ অতিথিকে ভেদভাবরহিত আতিথেয়তা প্রদর্শনের কথা বলেছেন- 'আতিথ্যমার্যধর্মো হি স্যাদতিথির্যথা'।[১৯] অর্থাৎ অতিথি যেরকমই হন না কেন তাঁর আতিথ্য পালন করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে অতি সরল বর্ণনায় অতিথিবাৎসল্য গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। রাজা ধবলচন্দ্রের মূঢ়মতি পুত্রদের ব্যবহারিক জগতের বৈষয়িক জ্ঞান প্রদানের জন্য পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা 'হিতোপদেশ' রচনা করেন। এই গ্রন্থের মিত্রলাভ অংশে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতিথির গুরুত্ব ও অতিথিসৎকারের মার্গ নির্দেশিত হয়েছে। বেদোক্ত পদ্ধতিতে অতিথি সৎকারের সামান্য জ্ঞান না থাকলেও সাধারণ মানুষ গৃহে আগত অতিথিকে কিভাবে অনাড়ম্বর ও আন্তরিকভাবে আতিথ্য প্রদান করতে পারেন তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গৃহস্থের ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অতিথি সৎকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে –

'অরাবপ্যুচিতং কার্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।

ছেত্তু পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমাঃ।'[২০]

অর্থাৎ শত্রুও যদি বাড়িতে আসে তাকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা উচিত। গাছ-তাকে যে লোক কাটছে তার থেকে ছায়া সরিয়ে নেয় না । 'যদি বা ধনং নাস্তি প্রীতিবচস্যাতিথিঃ পূজ্য এব'– যে ঘরে টাকা-পয়সা নেই, তখন কেবল মিষ্টি কথাতেই অতিথির সেবা করা উচিত। দেবজ্ঞানে অতিথি সৎকার ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য– যা সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। দেবতা যেরূপ আপন মহিমায় মানবকুলের পূজনীয়ত্ব লাভ করেন সেইরূপে সকল দেবতার সমন্বিত রূপ হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যে অতিথির রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত সহকারে ও গল্পের ছলে অতিথি সৎকারের সহজপাঠ অতি চমৎকাররূপে সংক্ষেপে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত

সাহিত্যে আলোচিত অতিথিসৎকারের দৃষ্টান্তমূলক আলোচনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথি ও তার সৎকাররূপ কর্তব্য কোন এক বিশেষ আশ্রমের, এক বিশেষ বর্ণের আচরণীয় কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। ব্রহ্মচারী, তপস্বী, গৃহী, মনুষ্যেতর জীবজন্তু এমনকি প্রকৃতিও নির্বিশেষে আতিথ্যগুণের স্বাক্ষর রেখেছে সংস্কৃতসাহিত্যে। সার্বজনীন এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলে আপন আপন ধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তাই সকলেই অতিথি সৎকার কর্মে কখনও কোন অবহেলা প্রদর্শন করতেন না, আর অবহেলা করলে তার ফল হত মারাত্মক তা উদাহরণ সহযোগে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশদে আলোচিত হয়েছে।

অতিথি সূর্যাস্ত তথা সায়ংকালে উপস্থিত হলে তাঁকে 'সূর্যোঢ়' বলা হয়। এই প্রকার অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। যদি গৃহে অনেক অতিথি সমাগম হয় তাহলে তাঁদের পদ-সম্মানাদির উপর ভিত্তি করে উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং সামান্যত ব্যবহার অর্থাৎ সৎকারের প্রচেষ্টা করতে হয়। অতিথি যেহেতু আরাধ্য সেকারণে তাঁর বর্ণ, জাতি, আশ্রম, অবস্থা এবং যোগ্যতা বিচার্য নয় এমনকি তাঁর ধর্ম পর্যবেক্ষণও অনুচিত। কারণ ভেদভাব রহিত আতিথ্যকে সর্বকালে সর্বদা শ্রেষ্ঠতম শিষ্টাচারের সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। গৃহে একজন অতিথির অধিষ্ঠান কালে যদি অন্য অতিথি এসে উপস্থিত হন তাহলে পূর্বে উপস্থিত অতিথির সৎকার করা হয়েছে বলে পরবর্তী অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই। সাধ্যমত তাঁর সেবা বা আপ্যায়নও আবশ্যক। কতদিন পর্যন্ত অতিথিরূপে আগত ব্যক্তির সেবা করা উচিত এ ব্যাপারে ভিন্ন-ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে। ব্রহ্মদেশে অধুনা মায়ানমারে লোকশ্রুতি অনুসারে কেবলমাত্র সাতদিন অতিথিসৎকারের বিধান আছে। ভারতবর্ষের রাজস্থান রাজ্যে অতিথিকে দুদিন পর্যন্ত আতিথ্য প্রদানের রীতি প্রচলিত আছে। ডেনমার্ক দেশে আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য সর্বোচ্চ

তিনদিনের সময়সীমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; এর থেকে বেশিদিন পর্যন্ত অতিথির স্থায়িত্ব হলে আতিথেয়তার লাঘব ঘটে। গৃহস্থকে সদা স্মরণে রাখতে হয় যে অতিথি কখনই সেই আতিথেয়তাকে বিস্মৃত হন না যে আতিথ্য সদ্ব্যবহারের দ্বারা সাধিত হয়।[২১] কারণ আতিথ্য ও অতিথির মধ্যে মানসিক ভাবের আদান প্রদান হয় তার থেকে সদ্ ভাবনার বিনিময় আর অন্য কোন সদাচারে দৃষ্ট হয় না।[২২]

প্রাচীন যুগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে সকলেই অতিথিকে অত্যন্ত সমাদরের সাথে গ্রহণ করতেন। অতিথিসেবা ঠিকমত না হলে অমঙ্গল সাধিত হবে এই ধারণা থেকে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মানুষ অতিথি সৎকারে হন ব্রতী। পরিবর্তনের স্রোতে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আধুনিক সমাজে লক্ষণীয়। প্রাচীন যুগে মানুষের বিশেষণরূপে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে 'দেব-দ্বিজ-অতিথিপরায়ণ' অর্থাৎ সজ্জন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অতিথিপরায়ণতা ছিল প্রকট। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ এখন অতিথিসেবায় আত্মনিবেদনের রীতি থেকে অনেকাংশে দূরে সরে এসেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অতি মূল্যবান পরম্পরা এখন বিলুপ্তপ্রায়। যান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ অন্তঃকরণ প্রবৃত্তির সূক্ষ্মতম অনুভূতির সহায়তায় বর্তমানে অতিথিপরায়ণতা থেকে হয়েছে ভ্রষ্ট। এখন আর কেউ কারো বাড়িতে অতিথিরূপে উপস্থিত হন না । বহুব্যস্ত মানুষ আগে থেকে না জানিয়ে কারো বাড়ি উপস্থিত হতে পারে না, আবার যার বাড়ি উপস্থিত হবে তাকে না জানিয়ে যাওয়াও যায় না। অতএব অতিথি-আতিথ্যপ্রদানকারীর যে প্রাচীন সম্পর্ক আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পেয়েছি তা অনেকাংশেই বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে অতিথি বাড়িতে এলে বহু মূল্যবান কাংসপাত্রে অতিথি সেবার রীতি ছিল, এই কাংসপাত্রগুলি শুধু সুদৃশ্য ছিল না দীর্ঘস্থায়ীও ছিল অবশ্য, আর এখন অতিথি বাড়িতে এলে ক্ষণভঙ্গুর কাঁচ বা চীনে মাটির বাসনে অতিথি আপ্যায়ন হয়।

ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় যে প্রাচীনযুগের কাংসপাত্রের ন্যায় দৃঢ়তা ও সৌজন্য বর্তমান অতিথি সৎকারে অনুপস্থিত। সময়ের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বা পালনীয় রীতিনীতিগুলি ক্ষণস্থায়ী, পলকা সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। কেজো সম্পর্কের বাইরে নিছকই কর্তব্য পরায়ণতার খাতিরে এখন আর কেউই খুব একটা অতিথি বা আপ্যায়নকে গুরুত্ব দেয় না।

প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রত্যহই মহাযজ্ঞগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবে, এটিই শাস্ত্রের অনুশাসন। এই জগদ্ব্যবহারে প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি নানারূপ কর্তব্য আছে, এই কর্তব্যকে শাস্ত্রে 'ঋণ' বলে। এই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হয়, শাস্ত্রীয় ভাষায় 'আনৃণ্য' লাভ করতে হয়। জীবন ধারণার্থ প্রতিদিন সকলেরই অন্নগ্রহণ করতে হয়। তখন অন্যের অন্নের চিন্তা কে করে? অন্যের প্রতি কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে এটাই বা কে ভাবে? কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রই সমস্বরে উদ্ঘোষণা করেছেন- তুমি যদি অপরকে অন্নপ্রদান না করে নিজে অন্নগ্রহণ করো, তবে তুমি গ্রাসে গ্রাসে পাপভক্ষণ করবে-

'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'[২৩]

'অঘং স কেবলং ভুঙ্ক্তে যঃ পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'[২৪]

'ভুঞ্জতে তে অঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'[২৫]

কুটুম্ব, অতিথি প্রভৃতি ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে শাস্ত্রকাররা তাঁকে বলেন 'বিঘস', আর যজ্ঞ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা হল অমৃত। প্রতিদিন এই ভুক্তাবিশিষ্ট ও যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু দিয়েই গৃহস্থের জীবনরক্ষা করতে হয়-

'বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিতং বামৃতভোজনম্।

বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।।’[২৬]

পারিবারিক বা গৃহস্থ জীবনে অতিথিসৎকার গুরুত্ব হারালেও মজার ব্যাপার হল সারা পৃথিবী জুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে আপ্যায়নের রীতিকে মহনীয় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কোন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, রেল-বিমান-সড়ক পরিসেবায়, ব্যাঙ্কে, অফিসে, হাসপাতালে মিষ্ট ব্যবহার প্রদানকারী ও সুমিষ্ট বাচনিক ক্ষমতাধারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুবসম্প্রদায় অর্থাৎ যুবক-যুবতী নির্বিশেষে আপ্যায়ক নিয়োগ একটি সর্বজনবিদিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহে উপস্থিত অতিথির সৎকারের জন্য যেমন কিছু না থাকুক গৃহস্বামী বা গৃহিণীর মুখের সুমিষ্ট বচনই যথেষ্ট ঠিক তেমনভাবে আধুনিক সমাজে ব্যবসায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে এই অভ্যর্থনা প্রদানকে যত্ন সহকারে পালন করা হচ্ছে। আধুনিক পাঠক্রমের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে আপ্যায়নের প্রথাগত প্রশিক্ষণ পাঠমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতিথি সমাগত হলে তার আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা রীতি আবহমান কাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিছিন্ন ভাবধারার অন্তর্গত। এই উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজেও পরিলক্ষিত হয়, তাই একবিংশ শতকের অত্যাধুনিক ভারতবর্ষের বাসিন্দারা প্রতিবেশী দেশ বা সারা পৃথিবী থেকে আগত পরিভ্রমণকারীদের অতিথি বলেই অভ্যর্থনা জানান। এছাড়া ভারতের এই আতিথ্যবাৎসল্য প্রকাশ পায় স্বমহিমা বিস্তারে - গৌরবে উদ্ঘোষিত হয় -‘অতিথি দেবো ভবঃ’।[২৭] কারণ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’- আপন আত্মীয়-কুটুম্বকের প্রতি আমরা যেমন বাৎসল্য দেখাই সারা পৃথিবীর মানুষের প্রতি আমাদের এই বাৎসল্য বর্তমান। আধুনিক ভারতে অভ্যাগত সেবায় যে Hospitality আমরা প্রদর্শন করি তা প্রাচীন সংস্কৃতিরই অনুসরণমাত্র । প্রকৃতপক্ষে সমদর্শনের আলোকে সকলকে এবং সকল প্রাণীকে ভালবাসার এই আদর্শ বা আপ্যায়নের

রীতি একমাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। উন্নতির জোয়ারে ভাসমান পরিবহন বা সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোন একটি বিশেষ জায়গায় প্রবেশের প্রাক্কালে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন। এক মহকুমা থেকে অন্য মহকুমা, এক জেলা থেকে অন্য জেলা , এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রবেশের সময় নির্ধারিত সীমান্ত প্রদেশে অভ্যর্থনা বা স্বাগত জানানোর রীতি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতের এই বিরল ও মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিক আচরণের পরিপালন আজও উন্নত ভারতের আধার বা ভিত্তি । প্রাচীন ভারত সংস্কৃতির এই অবিসংবাদিত মূল্যবান রীতিটি আজও আধুনিক সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ। এই অবশ্য আচরণীয় রীতিটিকে বিশ্বের সর্বত্র একতা ও সমত্বসূত্রে গ্রথিত ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ভারত-আদর্শ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করবে তার স্বাতন্ত্র্যে। একবিংশ শতকে আধুনিক সমাজে এমন সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে পারে এই আপ্যায়নের রীতি যার দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তগুলির কোন বিরোধ থাকে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ, সৌহার্দ্যসূচক আদর্শ সুদৃঢ় প্রস্তরতুল্য সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ তার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে, কারণ আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ, পালনীয় শিষ্টাচার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি। বন্দুক, তরবারি দ্বারা অর্জিত রাজনৈতিক মুক্তি কখনই আমাদের আত্যন্তিক মুক্তি দেবে না। তাই প্রাচীন ভারতীয় আচার-আচরণবিধিকে গুরুত্ব দিয়ে অভ্যর্থনার রীতিকে সামনে রেখে ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রকাশ করতে হবে, তাহলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির প্রাচীন সংস্কারের গরিমা অক্ষুণ্ণ থাকবে। স্মরণাতীত বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয়রাই জগতের দুর্লভ অধিকার পেয়েছে এবং আবহকাল তারা সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে যাবে। তাই আধুনিক ভারতীয় হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল প্রাচীন ভাবধারাগুলির আদর্শকে পাথেয় করে জীবন গঠন করা ও সার্বিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া। চিত্তের একাগ্রতাই সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের মূল; তাই আধুনিক সমাজে

সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার সর্বোৎকৃষ্টতা জনজীবনে একাগ্রভাবে প্রতিফলনের মাধ্যমে এই প্রাচীন সংস্কৃতির ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্য কর্তব্য।

আধুনিক যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই সভ্যতার পক্ষে পরস্পর কে জানবার ও বোঝবার সময় ও সুযোগ এসেছে। পাশ্চাত্যের সভ্যতা নিজেদের আদর্শের তুলনায় প্রাচ্যের সভ্যতাকে শ্লথ ও প্রতিকূল বলে মনে করে এতে পাশ্চাত্যকে দোষ না দিয়ে বরং যদি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দুই আপাতবিরোধী সভ্যতার পেছনে কোন যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে পরস্পর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে যেখানেই নিজ নিজ জাতীয় বিশেষত্বগুলি পরস্পর পরস্পরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে সেগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ ও বিনিময় করতে হবে। আতিথ্যগুণের মত একটি ঐতিহ্যশালী পরমগুণ ভারতীয় তথা প্রাচ্য সংস্কৃতির পরম সম্পদ। এই সংস্কৃতির আলোক প্রভায় পাশ্চাত্যকে আলোকিত করে সমগ্র পৃথিবীর কাছে দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ প্রাকার অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতীয় এই সংস্কৃতি আজ বিশ্বজনীনতার উদার ও সুবিশাল ক্ষেত্রে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথিসৎকার আজও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও সকল ব্যক্তিই আতিথ্যগ্রহণের অধিকারী নন। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে কিছু কিছু বিশেষ গুণসম্পন্ন আগন্তুককে আতিথ্য প্রদান করতে বারণ করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেবল সজ্জন ব্যক্তিই আতিথ্যের পাত্র, অর্থাৎ দুর্জনব্যক্তিকে আতিথ্য প্রদান অনুচিত। প্রাচীনকাল থেকেই অতিথি সৎকারকে জীবনের এক ব্রত জ্ঞান করে পালনের রীতি চলে আসছে। নিজে কিছু না খেয়েও সেই আহার্য দিয়ে আতিথেয়তার প্রসঙ্গ বহুল চর্চিত বিষয়। এই অতিথি সৎকারের পরম্পরাতে গৃহস্থ নিজ প্রাণের তোয়াক্কা না করে অতিথি সেবা এবং অতিথির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন রেখেছেন।

মনুস্মৃতিতে গৃহস্থ কর্তৃক অতিথিসৎকারের নিয়মাবলী যেমন বর্ণনা করা হয়েছে অপরপক্ষে তেমনই অতিথি পদবাচ্য ব্যক্তির শিষ্টাচার সম্পর্কে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে- যা পালন করা প্রতিটি অতিথির কর্তব্য। বর্তমানে সামাজিক পরিস্থিতিতে কাউকে না জেনে শুনে বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু কেউ অতিথিরূপে গৃহে সমাগত হলে তার সম্যক পরিচয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত হলে নূন্যতম আতিথেয়তা প্রদর্শনও মানবতার পরিচায়ক।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অতিথি অসৎকারীকে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কারণ ধনী ব্যক্তির যতই ধনসম্পদের প্রাচুর্য থাকুক না কেন আতিথ্য নির্বাহ না করার মূঢ়তা ধনী ব্যক্তির দরিদ্রতাকেই সূচিত করে এবং অতিথিসৎকারে অনাগ্রহী ব্যক্তিকে বুদ্ধিহীন সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অব্যক্ত সাধারণ সমাজে অতিথি ব্যক্ত দেবমূর্তি স্বরূপ এবং এই সামাজিক দেবতার সেবাকার্যে সরল-অনাড়ম্বর পদ্ধতি অবলম্বন অর্থাৎ শুধু মিষ্টবচন দ্বারা সেবা করলেও অতিথির প্রসাদ লাভ করা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের কবিকুল কবিতার ও কল্পনার আলোকযন্ত্রের সাহায্যে কেমন সুন্দরভাবে ও সতর্কহস্তে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাদের হৃদয়ে সনাতন আর্যধর্মের প্রভাব অনুস্যূত করেছেন। ক্রমে দেখা যায় দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, গো-ব্রাহ্মণের সেবা, অতিথি-সৎকার, লোকরঞ্জন এবং কর্তব্যের পালনার্থে দেবতাদেরও অসাধ্য কার্যের অনুষ্ঠান মানুষের দ্বারা করিয়েছেন, শতবৎসরব্যাপিনী শত শত বাগ্মীর বক্তৃতায় যে ফল না ফলে, সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আতিথেয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপনে গ্রন্থকার-ধর্মশাস্ত্রকার-কবি-সাহিত্যিকদের কৌশলময়ী, দৃষ্টান্তমূলক কল্পনাসুন্দরীর কাব্যিক প্রয়োগের আবির্ভাবে তা সম্ভবপর হয় সমাজে। পাঠকের হৃদয়ে কর্তব্যপালনের, ধর্মাচরণের তথা সদাচার প্রয়োগের আন্তরিক সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়। সংহিতাদিতে ধর্মমূলক কর্তব্যের উপদেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তদপেক্ষা সরলীকৃত সংস্কৃত

সাহিত্যে বর্ণিত উপদেশে কবিকৌশলে অধিক ফললাভ হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আলোচিত অতিথি-আতিথেয়তার প্রসঙ্গগুলিতে কবিত্বের মধুর সুস্বাদু আবরণে, শর্করামণ্ডিত তিক্ত ওষুধের মত এই অতিথিসৎকার কর্তব্যরূপ ওষুধ আধুনিক সমাজের সকলেই সেবন করে পরিতৃপ্ত ও নিরাময় হবেন- এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের প্রসঙ্গটি আধুনিক সহৃদয়ের হৃদয়েও অতর্কিতভাবে কিন্তু সুচারুরূপে একটি প্রাচীন মূল্যবান সংস্কারের পটরেখা চিরন্তনভাবে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে।

এই অতি উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও অতিথিসৎকারের মত ভারতীয় সংস্কৃতি যে আজও সতেজ-প্রাণবন্ত আছে তার কারণ প্রাচীন ভারতের এই সংস্কৃতিকে ভারতবাসী আধুনিককালেও সমমর্যাদায় পরিপালন করে চলেছে; বিস্মৃত হয়নি অভ্যাগত আপ্যায়নের মহিমা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তার নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবগত করতে পারলে তবেই হবে প্রকৃত মূল্যবোধের বিকাশ। সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, উদারতার আলোকে ব্যাখ্যাত অতিথি সৎকারের আলোকোজ্জ্বল প্রবাহকে ব্যবহারিক জীবনে আরও প্রয়োগ করতে পারলে ও চিরন্তনী এই সংস্কৃতির আচরণের ফলে এ যুগের নরনারী আধুনিক জগতের শক্তিসমূহের সাথে মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা অর্জন করবে, ঐ শক্তিসমূহকে মানবিক সুখ ও কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে পারবে ভারতে ও ভারতের বাইরে। এভাবেই বর্তমান সমাজে অতি প্রাসঙ্গিক এই অতিথি আপ্যায়নের সঞ্জীবনী, অনন্য ধারা সৃজনশীল জীবনযাত্রার ও জীবনে পরমানন্দ লাভ তথা সফলতার দিগ্‌দর্শন করে চলেছে। তাই তো ভারতের মহান শিক্ষা উদাত্ত আহ্বানে ধ্বনিত হয় বিশ্বকবির লেখনীতে-

‘হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি

ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,

ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে

ধর্ম-যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,

ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।

কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে

সর্বকর্মফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার

প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,

সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে

সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।’[২৮]

তথ্যপঞ্জি

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫/১৮

২. ভট্টনারায়ণ : হিতোপদেশো মিত্রলাভঃ

৩. মহোপনিষৎ ৬/৭২

৪. তামিল সঙ্গম সাহিত্য

৫. সাহিত্যদর্পণঃ - দশম পরিচ্ছেদ, সার অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত

৬. বাজসনেয়ি সংহিতা ২৭/২৫

৭. মনুসংহিতা ১১/১২

৮. ঋগ্বেদ ১০/১১/৭৬

৯. মনুসংহিতা ২/২০

১০. শিশুপালবধম্ ১/১২

১১. শিশুপালবধম্ ১/১৪

১২. রঘুবংশম্ ১/৫৫

১৩. রঘুবংশম্ ১/৪৪,৪৫,৪৯,৫৩,৫৪

১৪. রঘুবংশম্ ৫/২

১৫. রঘুবংশম্ ৫/৬১-৬২

১৬. নলোদয়ঃ ৩/৫৩

১৭. কুমারসম্ভবম্ ৫/৩১

১৮. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ৪/১

১৯. বুদ্ধচরিতম্ ১৫/২২

২০. হিতোপদেশ- মিত্রলাভ

২১. হোমার-ওডিসি ১৫

২২. এস্কিলাস- The Libation Bearers

২৩. ঋগ্বেদ ১০/১০৭

২৪. মনুসংহিতা ৩/১১৮

২৫. গীতা ৩/১৩

২৬. মনুসংহিতা ৩/২৮৫

২৭. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ১/১১/২

২৮. নৈবেদ্য ৯৪

উপসংহার

উপসংহার

প্রকাশভঙ্গী যেমনই হোক, জীবনে ও সংসারে নানা আচার অনুষ্ঠান অবান্তর কোন বিষয় নয়, মানুষের স্বভাবেরই তা প্রকাশ ও বিকাশ- এটাই তার স্ব-ধর্ম বা সংক্ষেপে ধর্ম। স্ব-ধর্ম বা ধর্ম বলেই, মানুষের অন্তরের এই উচ্ছ্বাস (অত্যুচ্ছ্বাস নয়) সংস্কৃত মনের পরিচয় বহন করে বলেই, তা আবার সংস্কৃতিও বটে। এইভাবে মানুষের জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতি জড়িয়ে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। ধর্ম থেকে সংস্কৃতিকে তাই বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বা দেখার প্রবণতা থাকলে তা হয় অসম্পূর্ণ দর্শন ; আবার ধর্মকে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তা হয় নিছক লক্ষ্যহীন এক উন্মাদনা। কোনটিই সদর্থক জীবনে কাম্য হতে পারে না।

দেবতার কাছে মানুষ ইষ্টলাভের জন্য যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তার মধ্যে হয়তো মানুষের কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও হয় যে, উৎকট পৌরুষের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন কিন্তু সেখানে প্রকাশ পায় না। ইষ্টলাভের আশায় প্রার্থনা অথবা অভীষ্টপূরণের কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে অভাবিত ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন কোন লজ্জাকর ও মানবতাবিরোধী কাজ অবশ্যই নয়। আপন অন্তরেরই গভীর অনুভূতির তা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রথমে যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবের ও ভাষার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের কারণে এবং ঋষি হৃদয়ের আপন অনুভূতি ও ঋষির মধুর ব্যক্তিত্বের কারণে সকলের নিকটে বিশেষ আকর্ষণীয়-অনুসরণীয়, পরবর্তীকালে সমাজজীবনে তা ঐ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে বিস্তার লাভ ক’রে নানা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়।

মানুষকে ক্রমোত্তরণের পথে নিয়ে যেতে যা কিছু সাহায্য করে, যা মানুষকে করে অনুশীলিত ও পরিশীলিত, যা উত্তরণের স্পৃহা ব্যক্ত করে তাই ধর্ম। কিন্তু সমাজের সকল

স্তরের মানুষের পরিশীলিত হয়ে ওঠার প্রেরণা ও শক্তি সমান নয়, মনের ভাবকে প্রকাশ করার রীতিও সকলের সমান নয়। এই ভেদ থেকেই সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং একই ধর্মের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপধর্ম ও লোকধর্ম। উন্নত ও পরিশীলিত ধর্মের মধ্যেও তাই দেশাচার, দশাচার, কুলাচারের প্রভাবে অনুন্নত লোকধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। কখনও কখনও আবার লোকধর্মের মধ্যেও উন্নত ধর্মের কিছু আঙ্গিক প্রবেশ করিয়ে তাকে উন্নতরূপ দান করার চেষ্টা করা হয়। তারই ফলে নানা ধর্মগ্রন্থে বহু নানা উন্নত ধারণার ও উদাত্ত ভাবনার পাশাপাশি বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ধারণারও সন্ধান পাওয়া যায় এবং তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে তা বিশেষ বিস্ময়েরও সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজের মত সাহিত্যে এবং ধর্মাচরণে ভালো ও মন্দের, সুন্দর ও অসুন্দরের, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের এই বিমিশ্রণ অনিবার্য।

বর্তমান সময়ে অবশ্য নানা দিক থেকে সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটায় অনুষ্ঠানের প্রাচীন পদ্ধতি বা পুরাতন আচার-আচরণের প্রাচীন অনুসৃত পদ্ধতি ও ঋষি-কবিদের, সাহিত্যিকদের বাক্যের বা মন্ত্রের প্রতি অপার মুগ্ধভাব, সেই আন্তরিক গভীর আকর্ষণ আমরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু প্রবল গতি ও অভাবনীয় নানা যান্ত্রিক প্রগতি সত্ত্বেও মানুষের জীবনের নানাবিধ সংস্কারাদি পালন, অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হলে তাঁদের যথাযথ আপ্যায়ন বা এমন কিছু কিছু পারিবারিক আচারগত অনুষ্ঠান আছে যা আমরা এখনও ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারিনি। এইসব আচার-আচরণ, অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশের ভাষা ও রীতি এখন ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ভিন্নমুখী হলেও সমাজের নানা আধুনিক-সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকা সত্ত্বেও উৎকর্ষের অসুসন্ধানী মানুষ কেবল অতীত বলেই বা প্রাচীনরীতি বলেই অতীতকে ত্যাগ করতে, নিজের দেশের সংস্কৃতির পরম্পরা ও আপন পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকতে পারেনা।

তাই অতিথি-অভ্যাগত সৎকারাদি ক্রিয়া মহৎ অনুসৃত কর্মরূপে কাল থেকে কালান্তরে উৎকৃষ্ট মানবিকতা প্রদর্শনের ধারা হিসেবে সংঘটিত হয়ে চলেছে। জীবনকে উন্নততর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ, উন্নত আদর্শের সন্ধানে যিনি তৎপর হন সেই প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ সর্বদাই ব্যাকুল হন অনাগতের মতো অতীত সম্পর্কে সমৃদ্ধ হতে। অতীত প্রবর্তিত আচরণধারাকে নিজ জীবনে আচরিতব্য কর্তব্যের মধ্যে সামিল ক'রে জীবনকে পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়। অতিথি-অভ্যাগত সৎকার বা আপ্যায়নরীতি তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে মানবিক উত্তরণের উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে।

মানুষের প্রাথমিক চেতনার স্তরটি হচ্ছে মুকুলিত চেতনা। যেমন ফুলের মুকুল ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে পূর্ণ বিকশিত হয়। ফুলের মুকুল যেমন সবসময় গাছে একই অবস্থায় থাকতে পারেনা, ক্রমে ক্রমে তাকে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা লাভ করতে হয়, নচেৎ কীটপতঙ্গ দংশন করলে মুকুলটি ক্রমান্বয়ে একেবারেই শুকিয়ে যায়। সেইরকম মানুষ চিরকাল মুকুলিত চেতনা অবলম্বিত অবস্থায় থাকতে পারে না। মুকুলিত চেতনাপ্রাপ্ত মানবজীবন লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধু-গুরু-শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন করে, পূর্ণ বিকশিত চেতনা প্রাপ্ত হয়ে শাশ্বত, সচ্চিদানন্দকে পাওয়া। যদি এই সুদুর্লভ মানব-জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি না ক'রে শুধুমাত্র কেউ যদি পশুদের মতো আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে নিমগ্ন থাকে, তবে তাকে আবার বৃক্ষ-লতা বা পশুদের মত শরীর লাভ করে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হবে। সেটি একটি অতীব দুঃখদায়ক পরিণতি। এমন দুর্লভ মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার যে না করে, সে একটি পশুর চেয়ে বেশি কিছু উন্নত নয়। মানব-জীবনেই একমাত্র সুযোগ যার সদ্ব্যবহার ক'রে যে কেউ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই মুক্তি থেকেই চিন্ময় ভগবৎ-রাজ্যে সচ্চিদানন্দের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ

কর্মফলের জন্য দায়ী। গীতার বাণী- 'যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে যেরূপ ভাবনা করে, সে তদ্রূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে নয় লক্ষ প্রকারের জলচর প্রাণী, একাদশ লক্ষ ক্রিমিকীট, বিশলক্ষ প্রকার বৃক্ষ ও পাহাড়-পর্বত দেহধারী জীব, দশ লক্ষ পক্ষী, ত্রিশ লক্ষ পশু ও চার লক্ষ প্রকারের মনুষ্য- মোট চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনিভুক্ত জীবের ভিতর মানবজীবন সুদুর্লভ। আর মানব জীবনেই সেই সুযোগ লাভ হয়, যার ফলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পরমাত্মার স্মরণ করে চিন্ময় আনন্দলোকে ফিরে যাওয়া যায়, যেখান থেকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিময় এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে-

'যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।'[১]

মানব জীবনই একমাত্র কর্মফলের অধীন। স্বর্গ বা আরও ঊর্ধ্বলোকে পুণ্যফলভোগী পুণ্যাত্মারা অথবা এই পৃথিবীতে বা নিম্নলোকে পাপফল-ভোগী নিম্নযোনি প্রাপ্ত জীবদের নতুন করে কর্মফল সঞ্চয়ের কোনও সুযোগ নেই, কারণ তারা কর্মফল ভোগ করে চলেছে। স্বর্গলোক বা ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসীরা উন্নত জড় সুখভোগ করার সাথে সাথে পুণ্যক্ষয়ে বৃষ্টি আকারে তাঁদের সচ্চিদানন্দময় অনুসদৃশ আত্মা এই জগতে পতিত হ'য়ে যখন মানবজীবন পুনঃপ্রাপ্ত হয়, তখনই সে পাপ বা পূণ্যফলে আবার এই জগতে আবদ্ধ হয়। তেমনই নিম্নযোনিভুক্ত জীবেরা পাপকর্ম অনুসারে পাপফল ভোগ করতে করতে একটির পর একটি ক্রম-উন্নত দেহ প্রাপ্ত হয়ে যখন আবার মানবজীবন লাভ করে, তখনই সে আবার পাপ-পুণ্য কর্মফলচক্রে আবদ্ধ হয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা প্রত্যেকের প্রয়োজন। আর

সেই উদ্দেশ্যটি যথার্থ মঙ্গলপ্রদ হওয়া আবশ্যক। আবার যে সমস্ত জ্ঞানীরা মনে করেন, স্বকপোলকল্পিত মনোধর্মের মাধ্যমে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তারাও নিত্যকাল সেখানে অধিষ্ঠান করতে পারে না। জীব মাত্রেই কর্মী, কর্মীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পার্থিব জগতে জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা। মায়াবাদী জ্ঞানীর উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে নিজেকে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভে তৎপর করা এবং সকাম যোগীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অষ্টসিদ্ধ লাভ করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর কেউই যেহেতু ভগবৎ ধামে নিত্য স্থিতি লাভ করতে পারে না বা আত্যন্তিক মুক্তি পেতে পারে না, তাই তারা কেউই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ক্লেশ থেকে মুক্ত নয় ও কর্মফল চক্রে আবর্তনরত।

পরমানন্দের স্বরূপ বিস্মৃতিই এই জড় জগতরূপ জেলখানায় ভ্রমণের কারণ। এখানে জীবসমূহ অজ্ঞানতায় সদানন্দকে বিস্মৃত হওয়ার কারণে সংসার-চক্রে নিদারুণ কষ্টভোগ করে চলেছে। সুতরাং, ভৌতিক এই জগতে উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়। কর্মীর কর্মফল, জ্ঞানীর নির্বিশেষ মুক্তি, যোগীর অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি যেহেতু এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে না, তাই তা প্রকৃতই নিত্য মঙ্গলময় উদ্দেশ্য হতে পারে না। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

‘কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।।’[২]

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে কখনোই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনই কেবল করা উচিত, কেন না মানব-

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়। একমাত্র শাস্ত্রবিহিত সদাচারই দিতে পারে এজাতীয় কর্মের উদ্যোগ। তাই সদাচারী ব্যক্তির পক্ষে পরমানন্দ লাভের পথ হয় প্রশস্ত। মানব-জীবনের অন্তিম গতি সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে-

'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।'[৩]

অর্থাৎ আমার সেই পরম চিন্ময় ধাম সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের আলোকের দ্বারা আলোকিত হয় না। যারা একবার সেই চিন্ময় ধামে ফিরে যায়, তারা কখনোও এই পার্থিব জগতে ফিরে আসেনা। অতএব সকল দুঃখের আকর পুনর্জন্ম রোধই কাঙ্ক্ষিত এবং এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হয় সৎকর্মের মাধ্যমে পরিশীলিত জীবনযাত্রায়। মুক্তিলাভের এই পন্থা হল ক্লেশকর এবং এই মুক্তি লাভও ক্লেশকর। গীতায় বলা হয়েছে-

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।'[৪]

অর্থাৎ যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে কেবল দুঃখই লাভ হয়। তাই যদি কেউ এই সর্বোত্তম পন্থা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তা হলে সে একটি ক্লেশকর পন্থাই অবলম্বন করেছে, যার ফলে সে সিদ্ধিলাভ করবে না বা আত্যন্তিক মুক্তি পাবে না। কোন ব্যক্তি যদি কেবল তুষে আঘাত করে, সে যেমন

কোনও শস্যলাভ করতে পারে না, তেমনই যে কেবল শুষ্ক জ্ঞানের আশ্রয়ে কেবল জল্পনা-কল্পনা করে, সে কখনও আত্মোপলব্ধি করতে পারে না। চরমে সে কেবল ক্লেশই লাভ করে-

'শ্রেয়সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো

ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।'[৫]

মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে আমাদের নিজেদের এবং সেই সঙ্গে আমার অনুগত সকলের যথার্থ মঙ্গল সাধন করা। আর যথার্থ মঙ্গল সাধন হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে সকলকে মুক্ত করা। শুধু অনুগতজনের মঙ্গল সাধন করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। যথার্থ কর্মযোগী জগতের সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

'ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার।।'[৬]

সাধারণ অর্থে লোক পরোপকার বলতে মনে করে দেশসেবা, সমাজসেবা ও দরিদ্রকে দান করা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ। এইসব জড়-জাগতিক উপকার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তার দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বন্ধন থেকে আত্মা মুক্ত হয়ে ভূমানন্দ লাভ করতে পারে না। এগুলি পুণ্যকর্মের অন্তর্গত, যার ফলে সে ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করতে পারে অথবা স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘকাল ধরে জড়

সুখভোগ করতে পারে। কিন্তু সে জন্ম-মৃত্যুকে জয় করে পারমার্থিক আনন্দ লাভ করতে পারেনা। যথার্থ মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

'নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।' [৭]

এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা তথাকথিত ধর্ম আচরণ করে অর্থ লাভের জন্য। অর্থ লাভের ফলে তারা তাদের জাগতিক ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। যখন ভোগের মাধ্যমে আনন্দ লাভে ব্যর্থ হয় তখন তারা ভগবানের কাছে জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কামনা করে। এই যাবতীয় সংসারদগ্ধ ক্লেশ থেকে মুক্তি দেয় মানুষের কর্তব্য কর্ম। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির অনায়াস প্রাপ্তি হয় মহানন্দ। এইসব কর্তব্য কর্মের মধ্যে অন্যতম হল অতিথি বাৎসল্য।

ফলাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কামনা চরিতার্থের মাধ্যমে জাগতিক ক্লেশ উপশম না হয়ে ক্লেশের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। জড়-জাগতিক ভোগবাসনার প্রতি আসক্তির ফলে আমাদের হৃদয় কলুষিত হয়। আমাদের এই কলুষ হৃদয়কে মার্জন করে নির্মল করতে হবে। হৃদয় কলুষমুক্ত করার জন্য এই কলিযুগে প্রয়োজন অপরাধমুক্ত, শুদ্ধ কর্মে আত্মনিয়োজন। আমরা বলি-

'জীবে প্রেম করে যেই জন

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।'

জীবে প্রেম বলতে গেলে, সমস্ত প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা বোঝায়- শুধু মানুষদের প্রতি নয়। প্রশ্ন ওঠে যে মাছ-মাংসাদি ভক্ষণে পশু-পক্ষী ও জলচর প্রাণীদের হত্যা করা হচ্ছে। এতে

তাদের প্রতি কি সত্যিই প্রেমাবেগ কাজ করছে? মানুষের হত্যা হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু একমাত্র মানুষই জীব আর অন্য প্রাণীরা জীব নয়? এটি ভ্রান্ত ধারণা। ক্রিমিকীট থেকে আরম্ভ করে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই 'জীব' শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব শুধু মানুষই নয় কারোর প্রতি হিংসা প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করা হয়েছে। জীবে প্রেম বলতে বোঝায় সমস্ত রকম প্রাণীদের প্রতি প্রীতি, ভালোবাসা- শুধু মানুষের প্রতি নয়। যে কোন প্রাণীর প্রতি হিংসার আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে- এই কথার অর্থ সঠিকভাবে বোধগম্য না হলে তা আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। শাস্ত্রে তাই পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে- যেখানে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞের পাশাপাশি নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরফলে মনুষ্যেতর জীবের প্রতি দয়া ও সমব্যথিতা পরিলক্ষিত হয়।

এই জড় জগতে জড় বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার মাধ্যমে কত কি আবিষ্কার করেছে জড় দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে জড় দেহকে কিছুটা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমি জড় দেহ নই- আমি হচ্ছি চেতন আত্মা। তাহলে আত্মার মুক্তির জন্য তারা কি করতে পেরেছে? আত্মার মুক্তির জন্য যদি কিছু না করা হয়, তাহলে আত্মার সুখের জন্য মানুষ কি করতে পেরেছে? যদি আত্মার সুখের জন্যও কিছু না করা হয় তাহলে সবই অর্থহীন কার্য। দেহকে যত্ন না করে দেহের পোশাক-পরিচ্ছদকে যত্ন করা যেমন অর্থহীন, খাঁচার পাখিটাকে যত্ন না করে খাঁচার যত্ন করা যেমন অর্থহীন, তেমনিই বদ্ধ আত্মাকে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত না করে, শুধুমাত্র জড় দেহসুখে মগ্ন থাকাটিও অর্থহীন। তাই, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য নিজের স্বরূপকে অনুসন্ধান করা, তা না হলে সমস্ত কার্যকলাপই অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমরা যদি নিজের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ আত্মার মঙ্গলের জন্য বা পারমার্থিক সদ্গতির জন্য চিন্তা না করি, তা হলে

তথাকথিত দেহজাত কার্যকলাপ আমাদেরকে এই দুঃখময় জড় জগতে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে রাখবে। তাই, ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন-

'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।

অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।'[৮]

অর্থাৎ যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ এবং তাই যারা তাদেরই মত বিষয়াসক্ত অন্ধব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরু রূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবানের সেবানিষ্ঠ হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে অন্ধকূপে পতিত হয় তেমনই জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসার চক্রে বারবার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে।

এই ত্রিতাপ দগ্ধ জগতের বদ্ধ মানুষেরা তাদের প্রকৃত সুখের চিন্তা না করে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জীবনভর অর্থহীন কার্যকলাপে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে চলেছে। বদ্ধ অবস্থায় এই জড় জগতে প্রতিটি জীব সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন গ্রহলোকে বসবাস করে। গীতায় বলা হয়েছে-

'ঊর্ধবং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।'[৯]

তাই এই দুর্লভ মানব জীবন থাকতে থাকতেই যদি আমরা সৎসঙ্গ, সদাচরণ, আপন কর্তব্যাদির প্রতি যত্নশীল না হই তাহলে বৃথাই মানবজন্ম। তাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্ধবকে লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।'[১০]

অর্থাৎ এই মনুষ্য দেহটি সকল ফলের মূল; অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। এটি পটুতর নৌকা। গুরুই এটির কর্ণধার। পরমানন্দের অপার কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হয়েও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

ভারতবর্ষ যেহেতু পুণ্যভূমি, তাই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের থেকে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়। ভারতভূমি তার আপন সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যে, উদার জীবনচর্যার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায় স্বকীয়তা স্থাপনে হয়েছে সমর্থ। সনাতন সংস্কৃতিতে দুটি মার্গের কথা বলা হয়েছে- প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। যারা মায়া প্রদত্ত জড় বিষয়-ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে; আর যারা জড় বিষয়বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, তারা নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে। প্রবৃত্তিমার্গীরা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কোন কালেই মুক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গীরা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে ফিরে যান। প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী উভয়কেই সৎকর্ম ও সদাচার সম্পর্কে অবগত হতেই হয়। সাংসারিক জীবনে জড় ও অনিত্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভকে একমাত্র আদর্শ না করে

ভারতীয় সংস্কৃতি ভূমা লাভের উদ্দেশ্যে নানা উৎকৃষ্ট কর্মসাধনের মধ্যে অভ্যাগত সৎকারের রীতিকে অত্যন্ত প্রাধান্যের সাথে জীবনচর্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে বিকর্ম পরায়ণ হয়। তাই পুরাণে সাবধান বাণী উদ্ঘোষিত হয়েছে-

'নূনং প্রমত্ত কুরুতে বিকর্ম যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ।।'[১১]

এই বিকর্ম বলতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মকে বোঝায়। দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের তর্পণের উদ্দেশ্যে নানা রকম নিষিদ্ধকর্ম তথা পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ভোগবাদী দার্শনিকের ভোগসর্বস্ব মতবাদের অনুসরণে সমগ্র জগত অধঃপতিত হয়। শ্রীগীতায় আমরা নির্দেশ পাই যে জড় দেহের বিনাশ হলেও, দেহী বা আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। যারা বিকর্মে লিপ্ত হয়ে দেহত্যাগ করে, তারা নরকে শাস্তিভোগ করার পর পশু-পক্ষী প্রভৃতির নিম্নযোনি ভুক্ত দেহে ভ্রমণ করতে থাকে। এই ধরণের পাপকর্ম করার ফলে জীবের দুঃখ-দুর্দশার মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মত আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। জীব বুঝতে পারে না যে, তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড়দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে সে জড় দেহ লাভ করে। কর্মযোগী, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে জীব একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। এই প্রাপঞ্চিক জগতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের

প্রভাবে সবই একদিন কালের করালগ্রাসে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ক্ষণস্থায়ী অথচ দুর্লভ এই মনুষ্যজীবন লাভ করেও মানুষ যখন অবিনশ্বর কীর্তিকে প্রতিষ্ঠা করবার লক্ষ্যে শিষ্টাচার পালনে ব্রতী না হয়ে ভ্রান্ত পথের পথিক হয় তখনই মানব জীবনের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়।

এক শ্রেণীর মানুষেরা মনে করেন যে, কর্মে লিপ্ত হওয়ার ফলে যখন কর্মফলের পরিণতি স্বরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং পুণঃ পুণঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে হয়, তখন কর্ম একেবারে না করাই ভালো। অনেকে এটিকে নিষ্কাম কর্ম বলে মনে করে থাকে। কিন্তু সেটি তাদের ভ্রান্তি। এই ধরণের ব্যক্তিদের বলা হয় নিষ্কর্মা। মহাভারতে অর্জুনও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নিষ্কর্মা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা অনুমোদন করেননি। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।।'[১২]

অর্থাৎ মানবকুলকে শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে হবে, কেননা কর্ম ত্যাগ করার থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়ে অর্জুন যখন দেখলেন যে, তাঁকে আত্মীয়স্বজন ও গুরুবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তখন তিনি মর্মাহত হলেন এবং ভাবলেন আত্মীয়-পরিজন ও গুরুবর্গকে হত্যা করলে তাঁকে পাপভোগ করতে হবে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন-

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'[১৩]

তাই স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয় তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক। এর থেকে আমাদের সহজেই বোধগম্য হয় যে, বিকর্ম ও কর্মহীন থেকে স্বধর্মোচিত কর্ম করা শ্রেয়। প্রত্যেক বর্ণের, প্রত্যেক আশ্রমভুক্ত মানুষের উচিত তার জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট যে কর্তব্যাদি আছে সেগুলি পালনে দৃঢ় নিশ্চয় থাকা। কারণ এই জগতের বদ্ধ জীবেরা পূর্বজীবনের কর্মফল অর্থাৎ পাপ-পুণ্যানুসারে এই জীবনে সুখভোগ বা দুঃখভোগ করে। পূর্বজীবনের কর্মফল অনুসারে এই জীবনে তার জন্য যতটুকু সুখ বরাদ্দ আছে, শত চেষ্টা করেও তার থেকে একটুকুও বেশি সুখভোগ সে করতে পারবে না। মানুষ দুঃখ না চাইলেও কর্মফল অনুসারে দুঃখ আপনা থেকেই এসে হাজির হয়, তেমনই প্রচেষ্টা না করেও সুখ আপনা থেকে এসে হাজির হবে। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার অবস্থায় দিন যাপন করছে, অথচ অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। কেন এই বৈষম্য? বৈষম্যের কারণ হল মানুষের অর্জিত কর্মফল। পূর্বজীবনের অর্জিত পুণ্যকর্মের ফলে মানুষ এই জীবনে সুখভোগ করে, তেমনই পূর্বজীবনের পাপকর্মের ফলে সে এই জীবনে দুঃখভোগ করে। মানুষ যখন সুখভোগ করে, তখন তার সঞ্চিত পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে। ঠিক যেমন, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ব্যয় করার মত। চেক কেটে ব্যাঙ্কের সঞ্চিত টাকা ব্যয় করতে করতে একদিন সম্পূর্ণ টাকা নিঃশেষ হয়ে যায়। পাপের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করতে করতে একদিন সমস্ত পাপফল ক্ষয় হয়ে যায়। তাই পাপ ও পুণ্য দুটিই অস্থায়ী। এর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে আত্যন্তিক মুক্তি কি করে মানুষ লব্ধ হবে সে ব্যাপারে প্রযত্নশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। অভ্যাগত-অতিথিসেবা বা তার সৎকারাদি ক্রিয়া শাস্ত্রানুমোদিত শিষ্টাচার হওয়ার কারণে এর দ্বারা সন্মার্গ লাভ বা চরম মুক্তি আসে।

এই জড় জগতে প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এসব থেকে মুক্ত। এই জড় দেহটি একটি পোশাকের মতো। পোশাকটি যত সুন্দর বা দামি হোক না কেন, তা একদিন বিনষ্ট হয়ে যাবে। তেমনিই, এই জড় দেহটির একদিন জন্ম হয়, ক্রমে ক্রমে তা বার্ধক্য দশায় উপনীত হয়, তারপর নানাবিধ ব্যাধির দ্বারা দেহটি আক্রান্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হয়। দেহের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির শোচনীয় দুঃখ থেকে কারও রেহাই নেই। অর্থনৈতিক বা অন্যান্য দিক থেকে মানুষ যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, এই চার রকম সমস্যা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষই মুক্ত নয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে মানুষ অনেক রকম জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি থেকে কাউকে মুক্ত করতে পারে না। এখানেই তথাকথিত বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। বিজ্ঞান জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করতে পারে না, বার্ধক্য রোধ করতে পারে না, ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে পারে না এবং মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। এখন যেমন বিজ্ঞান এগুলোকে রোধ বা উপশম করতে পারছে না, ভবিষ্যতেও কোনদিনও পারবে না। কারণ এগুলি ভবিতব্য- এগুলি জড় নশ্বর দেহের ধর্ম। এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষ নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত। এই জগতে এমন কাউকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি ইহলৌকিক সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত। প্রতিটি মানুষকে সকাল থেকে রাত অব্দি নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলি যে কত রকমের তা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই ভুক্তভোগী। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের কোনও কোনও সমস্যা আপাতত সুরাহা হলেও বহু সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হয় না। আবার কোনও একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর থেকে খুব সহজেই বোধগম্য হয় যে, জড়-জাগতিক উপায়ের দ্বারা জড়-জাগতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না; বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বদ্ধ জগতের সমস্যাগুলির প্রকৃতি এমনই যে, সমস্যাগুলির সমাধান না করলে সমস্যাগুলি

থেকে যায়, আবার সমস্যাগুলির সমাধান করতে গিয়ে সমস্যা নবতর রূপে আবির্ভূত হয়। এটি অনেকটা শাঁখের করাতের মত। শুধু তাই নয় কোন্ গুলি প্রকৃত সমস্যা আর কোন্ গুলি প্রকৃত সমস্যা নয়, তাও মানুষের অববোধ হয় না। এই জগতে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ক নানান সমস্যা রয়েছে- এই সমস্যাসঙ্কুল জীবন থেকে আত্যন্তিক মুক্তি পেতে সহায়ক হয় সদাচার বা নৈতিক মূল্যবোধ অবলম্বনে শিষ্টাচার পালন। কৃপণ ব্যক্তি যেমন প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার করে না, শুধুই যক্ষের ধনের মতো তার ধন-সম্পত্তি আগলে রাখে; তেমনই যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করেও পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য অমূল্য মানব-জীবনের সদাচারাদি পালনের মাধ্যমে সদ্ব্যবহার করে না, তার অবস্থাও কৃপণের মতই। তাকে এই জড়জগতে উদ্দেশ্যহীনভাবে নিত্যকাল ঘুরে বেড়াতে হয়, আত্যন্তিক মুক্তি বা মোক্ষ তথা পরম পুরুষার্থ লাভ অধরা থেকে যায়। তাই মানবকুল অনায়াসেই আচরিতব্য কর্তব্যাদি সাধনের মাধ্যমে মানবজীবন সফল করতে পারে। ভোগসর্বস্ব, পাশ্চাত্যের অনুকরণে মত্ত আধুনিক মানুষ সংস্কৃতি, সদাচার পালনের ভারতীয় ঐতিহ্যগুলিকে যতই অবহেলা করছে ততই প্রকারান্তরে নিজেদের ক্ষতিসাধন করছে। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ- এই মহান বোধ থেকে পরোপকারের বাসনা সঞ্জাত হয় এবং সেবা, দান, সৎকারাদির মাধ্যমে পরোপকার সাধিত হয়। তাই ভারতবর্ষ হল পুণ্যভূমি, এই ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে প্রবহমান পুণ্যতোয়া অসংখ্য নদী যেমন ভূখণ্ডের গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে অবিরত ঠিক তেমনই ভারতের সুমহান উদার সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যার মাধ্যমে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত সদাচারগুলির মধ্যে আপ্যায়ন ও অভ্যাগত সৎকারের রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে সকলেরই উচিত এই কর্মে ব্রতী হওয়া। আধুনিক মানুষের যুগধর্ম বা কর্তব্য হিসেবে আতিথ্যগুণে নিজেকে সালঙ্কৃত করা উচিত। এই জড় জগতে পরিবার, পরিজন নিয়ে জাগতিক সুখ লাভের প্রচেষ্টাকে বলা হয় মায়া, যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এটি অনেকটা মরুভূমিতে জল ভ্রমে মরীচিকার

পেছনে ধাবিত হওয়ার মতো। উত্তপ্ত বালিকারাশিপূর্ণ মরুভূমিতে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে যখন পথিক জলাশয় মনে করে মরীচিকার পেছনে ধাবিত হয়, তখন সে দেখতে পায় সেখানে জল নেই, জলাশয় অনেক দূরে অপসৃত হয়েছে। তখন সে আবার সেই দিকে জলের আশায় ছুটতে থাকে। এভাবেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সে আদৌ জলের কোনও সন্ধান পায় না। পরিণামে পিপাসায় কাতর হয়ে সে মরুভূমিতেই মৃত্যুবরণ করে। তেমনিই পরমার্থ-বহির্মুখ বদ্ধ জীব স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখের আশায় উত্তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ মরুভূমি সদৃশ ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে আপাত সুখের আশায় উদয়াস্ত কঠোর অথচ পরিণামে নিরর্থক সংগ্রাম করতে থাকে, কিন্তু সে কোনও মতেই উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তখনই সে শান্তি লাভের জন্য নানা রকমের পরিকল্পনা করতে থাকে। যখন সেই ব্যক্তির একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তখন সে অন্য একটি পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়। এভাবেই তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। এই সম্বন্ধে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেছেন-

‘মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।’[১৪]

জড়জগতে বদ্ধ জীবদের বেঁচে থাকার এই সংগ্রামকে ‘প’ বর্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ‘প’ বর্গের অন্তর্গত পাঁচটি অক্ষর হচ্ছে- প, ফ, ব, ভ, ম। ‘প’ মানে ‘পরিশ্রম’ অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য এবং সুখ-শান্তি লাভের জন্য এই জগতে প্রত্যেক বদ্ধ জীবকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু সে কোনও মতেই সুখলাভ করতে পারেনা। এই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎকে জেলখানার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন- সরকারের আইন অমান্যকারী ব্যক্তিরা জেলখানায় প্রবিষ্ট হয়ে শুধুই কষ্ট ভোগ করে, কেন না জেলখানা হচ্ছে শাস্তি ভোগের স্থান। শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য কর্মাদির বিধান হল সরকারি আইনের তুল্য; কর্তব্যচ্যুত ব্যক্তির অভীষ্ট

লাভের বাসনা অধরাই থাকে। 'ফ' মানে 'ফেনা' অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করতে করতে বদ্ধ জীবের মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হয় অর্থাৎ সে গলদঘর্ম হয়। 'ব' মানে 'ব্যর্থ', অর্থাৎ সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করার পর একদিন জীবের অনুভূতি হয় অপার আনন্দ লাভে সে অসমর্থ, সে যথার্থ সুখী নয়, তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। 'ভ' মানে 'ভয়' অর্থাৎ বদ্ধ জীব যখন বার্ধক্যদশায় উপনীত হয়ে ক্রমশ শক্তিহীন হয়, তখন সে ক্রমশ ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে আসন্ন বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের জন্য বা মৃত্যুর জন্য। 'ম' মানে 'মৃত্যু' অর্থাৎ অবশেষে তাকে জীবনের ভয়াবহ পরিণতি - সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকেই বরণ করতে হয়। এই 'প' বর্গের বিপরীত হচ্ছে 'অপবর্গ' বা মুক্তি। তাই প্রকৃতই জ্ঞানী মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অপবর্গের পন্থা অনুসরণ করে সনাতন চিন্ময় আনন্দ লাভ করা। অপরাধী সেজে জেলখানার মধ্যে সুখলাভের চেষ্টা না করে অপরাধীর কর্তব্য জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা। তেমনই আত্যন্তিক মুক্তি-বহির্মুখ বদ্ধ জীবের কর্তব্য এই জড় জগতের মধ্যে সুখলাভের প্রচেষ্টা না ক'রে, শাস্ত্রের আদেশ-নির্দেশ পালন ক'রে অতিথি-অভ্যাগত সৎকারাদিরূপ শিষ্টাচার প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে নিত্য আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা করা, সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্তির জন্য তৎপর হওয়া। জেলখানায় কঠোর শাস্তিভোগ করার পর অপরাধী যখন বহু বছর বাদে নিজ গৃহে ফিরে আসে, তখন সে পুণরায় জেলখানায় ফিরে যাওয়ার জন্য ভুলেও চিন্তা করে না। তেমনিই যে ব্যক্তি সদাচারাদি পালনের মাধ্যমে সুকৃতির ফলে জেলখানা-সদৃশ এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে সনাতন জগতে ফিরে যায়, সে প্রমাদবশতঃও এই জড় জগতে ফিরে আসে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।'[১৫]

জড় জগতের নিত্য-অপার আনন্দ লাভ করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে ভ্রান্তি বা মায়া। যেহেতু এই জগৎ দুঃখালয়ম্ ও অশাশ্বতম্, তাই এখানে আমরা প্রকৃত সুখ পেতে পারি কি করে? যেমন কোনও ব্যক্তির পৈতৃক ধন গৃহের আশেপাশে কোথাও লুক্কায়িত আছে। যে যদি সঠিক স্থানটি না খুঁজে পায়, তাহলে অনন্তকাল ধরে খুঁজে বেড়ালেও সেই ধন সে নিজ হস্তগত করতে পারেনা। তার সমগ্র জীবনের শ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। তাই আমাদের তথা সকল মনুষ্য জাতিরই প্রধান কর্তব্য হল চিন্ময় আনন্দের উৎস কোথায় তার অনুসন্ধান করা, তা নাহলে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা ও মৈথুন মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এই প্রবণতা তো পশুদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত আনন্দের অনুসন্ধান করা। প্রত্যেকটি জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ - অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়, আর সেই পরমানন্দে আমরা নিত্যকাল স্থিতি লাভ করতে পারি যাতে মোক্ষের পথ প্রশস্ত হয়। এই দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে যারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-সর্বস্ব জীবনে সদা ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে যথার্থ আগ্রহী নয়, তারাও এই জগতে উদ্ভ্রান্তের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে জগৎ সংসারে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। অনেক সময় একটি পাগলকে দেখা যায় রাস্তায় পড়ে থাকা আখের ছিবড়ে নিয়ে চিবোচ্ছে এবং হেসে হেসে আনন্দ উপভোগ করছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই চিবিয়ে ফেলা ছিবড়ের মধ্যে কোন রস নেই, ওই পাগলটি অনর্থক সময় নষ্ট করছে। অনুরূপভাবে এই বদ্ধ জগতের মানুষেরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, মোক্ষবিমুখ, অর্থহীন কার্যকলাপে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে চলেছে, কিন্তু তারা জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি-মুক্তি লাভ করতে পারছে না। এই মুক্তি আসে ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সমষ্টিগত জীবনে একক বা সংঘবদ্ধভাবে সুকর্মাদি সম্পাদনের মাধ্যমে। সর্বোচ্চ আনন্দ বা সিদ্ধিলাভই যদি আমাদের

কাঙ্ক্ষিত, প্রার্থিত বিষয় হয় তাহলে পথভ্রান্ত না হয়ে মানবের উচিত নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি সমাধা করে, চারিত্রিক-মানসিক উদারতা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা। এই জড়জগতে কামলালসা চরিতার্থতার মাধ্যমে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে আনন্দ অনুভূত হয়, তা হল অপ্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অসীম চিন্ময় আনন্দ অনুভূত হয়, তার বিকৃত প্রতিফলন। প্রতিফলন যেমন বাস্তব বস্তু নয়, তেমনই কামনা-বাসনা চরিতার্থতার মাধ্যমে যে আনন্দ, তা প্রকৃত আনন্দ নয়। আর এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ানুভূতি কোন হঠাৎ প্রাপ্ত বা অনায়াস লব্ধ বিষয় নয়, আমৃত্যু পরোপকার, সেবা, দান, অহিংসা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণরাজির ক্রমাগত অনুশীলনের ফলশ্রুতি। তাই এই সকল সদাচার পালনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধির স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে জীব তার জড় শরীরকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, অর্থাৎ সে নিজেকে ভারতীয়, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পিতা, ভ্রাতা, রাজা, মন্ত্রী, পুরুষ, স্ত্রী, শিক্ষক, ডাক্তার, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি মনে করে। দেহাত্মবুদ্ধির স্তর অতিক্রম না করতে পারলে মানব জীবনের মহতী উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক না হওয়া পর্যন্ত পরমাত্মার জ্ঞান জন্মায় না ফলে বারংবার এই জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। একমাত্র নৈষ্ঠিক জীবন চর্যা পারে এর থেকে মুক্তি দিতে। জীবনের সমস্ত স্তরেই অতিথিকে, অভ্যাগতকে দেবজ্ঞানে সেবার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান জীবনচর্যার পরাকাষ্ঠা মেলে, তাই ভারতীয় সনাতন শিক্ষায় এই অভ্যাগত সৎকারকে শিষ্টকর্মের মর্যাদায় আভূষিত করা হয়েছে।

আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তি সাধনের জন্য জড় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ উপভোগের জন্য অত্যন্ত আসক্ত। এই অনিত্য জড় রসের প্রতি আসক্তি যতদিন থাকবে ততদিন আমরা শাশ্বত, চিন্ময় রসাস্বাদনে সমর্থ হতে পারি না। মায়াজাত বস্তুগুলি যখন

আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রয়োগ করি, তখন সেটিই হচ্ছে এই জাগতিক বন্ধনের কারণ। কিন্তু সেই মায়াজাত বস্তুগুলি যখন আর্ত, দরিদ্র, অতিথি-অভ্যাগত প্রভৃতি মানব ধর্মের প্রতিভূ স্বরূপ চরিত্রগুলির সেবায় প্রয়োগ করা হয়, তখন সেটিই হচ্ছে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। যেমন, একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে কাউকে হত্যা করা হয়, তখন সেটি গর্হিত অপরাধ। তেমনই, একটি ছুরি দিয়ে শল্য চিকিৎসক যখন অস্ত্রোপচার করে কাউকে জীবন দান করেন, তখন সেটি অত্যন্ত মঙ্গলজনক। স্পষ্টতই মানুষ হয়ে শুধু জন্মানোতেই মানব জন্ম সার্থক হয় না, আত্মতুষ্টির পেছনে ধাবিত না হয়ে মানবিক গুণাবলীকে পরার্থে প্রয়োগ করতে পারলে তবেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায়। গৃহে আগত অতিথিরূপী সত্তাকে যথাযথ আপ্যায়ন প্রদানের মাধ্যমে সদ্গুণের বহিঃপ্রকাশ হয়। আশ্রমোচিত সদাচারের এবং পারমার্থিক গুণাবলীর সবকিছু বিদ্যমান না হলেও, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ না হলেও অভ্যাগত সৎকারের উৎকর্ষতা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে- এ সার কথা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের উদাহরণগুলিতে সম্যক রূপে পাওয়া যায়। অতএব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনে আতিথ্যগুণ একটি অনস্বীকার্য গুণ। তাই চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত মানুষকে এই জাতীয় সদাচার পালনে অভ্যস্ত হতে হয়-

‘লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভাবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।’[১৬]

মানুষের হৃদয়ে ভোগবাসনার কলুষ যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষ পাপ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা আপাতত পাপ ক্ষালন হলেও সেই মানুষ পুণরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য পালন, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যবচন, বিধি-নিষেধাদি পালনের মাধ্যমে অন্তরে ও বাইরে নিজেকে পবিত্র রাখা, অহিংসা আচরণ,

সমদর্শন, সেবা, দান, পরোপকার, দয়া, অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে হয়। অনুসরণীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির পারমার্থিক জীবনধারা স্পষ্ট। তাঁদের থেকে অনুকরণযোগ্য আতিথ্যগুণ সর্বোৎকৃষ্ট। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ পাপকর্ম চরিতার্থতার জন্য তাদের অমূল্য মানব-জীবনের অপচয় সাধন ক'রে, তত্ত্বজ্ঞানশূণ্য হ'য়ে, সদাচার-বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। আধুনিক মনন তাই শাস্ত্রের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে বা অমান্য করে। তাই তারা প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হয়ে অপরের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু এ জাতীয় অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইন্দ্রিয়-বৈকল্যই প্রমাণিত হয়। মানুষকে ইন্দ্রিয়-বৈকল্য থেকে মুক্তি দিতে পারে সুসংহত-শাস্ত্রসাপেক্ষ জীবনধারণ। এই সুসংহত জীবনযাত্রার অঙ্গ অবশ্যই অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের রীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞান এখন মানুষের মধ্যে ক্রমশই বিলুপ্ত হতে বসেছে- যা ছিল মানব সভ্যতার প্রগতির যথার্থ মানদণ্ড। আধুনিক মানব সভ্যতায় পারমার্থিক জ্ঞান অবহেলিত, বিপথে মানুষকে পরিচালনের প্রোৎসাহ ক্রমবর্ধমান। তাই এই সহজ সত্য বোঝা উচিত যে, মানব সভ্যতা সদাচার পালনের আদর্শ থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে এবং মানুষ নিজের সর্বনাশের পথ নিজেই পরিষ্কার করছে। যে সভ্যতার নির্দেশাবলী দেশের নাগরিকদের তাদের পরবর্তী জীবনকালে পশুতে পরিণত হতে সাহায্য করে, তা নিঃসন্দেহে মানব-সভ্যতা নয়। অবশ্যই বর্তমান মানব-সভ্যতা রজ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভুল পথে এগিয়ে চলেছে- যেখানে সদাচারগুলি অনুপস্থিত। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বিপজ্জনক, সংকটময়, আদর্শহীন যুগের মধ্য দিয়ে আমরা কালাতিপাত করছি এবং বিশ্বের সমগ্র জাতির উচিত এই সামাজিক সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্য শিষ্টাচার, সুফলদায়ক কর্ম সম্পাদনের সহজতম পন্থা অবলম্বন করা। আহারে-

বিহারে-আচরণে সারল্য, অনাড়ম্বরতা অবশ্য পালনীয়। জীবের প্রতি জীবের নিঃশর্ত দায়বদ্ধতা, উপকারের মানসিকতা, উদার হৃদয়বৃত্তি প্রভৃতির আচরণেই মানবের একমাত্র কল্যাণ।

সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ অকিঞ্চিৎকর কাজে ব্যাপৃত থাকে, সেগুলি তাকে না দেয় তৃপ্তি, না দেয় শান্তি। সাংসারিক সুখ আমাদের ধ্যেয় নয়, আমাদের লক্ষ্য নয়। কারণ সংসার চিরস্থায়ী নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের কর্তব্যের দিকে মনোযোগী হলে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় যে আমরা নিজেদের কর্তব্য পালনে যথাযোগ্য তৎপর নই। সঙ্গত বিচার করলে প্রতি পদে ত্রুটি দেখা যায়। যদিও সকল মানুষই তাদের আপন উন্নতি চায় এবং তার জন্য চেষ্টা করাকে কর্তব্য বলে মনে করে তবু চিন্তা করলে এমন অনেক কারণ দেখা যায় যার কারণে মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে না। বরং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকৃত উন্নতির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হল তার আত্মার উন্নতি সাধন করা। ভগবান বলেছেন- 'উদ্ধরেদাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ'। মানুষকে প্রতিনিয়ত আত্ম-নিরীক্ষণ করে আত্মার উন্নতির জন্য যত্ন করা এবং অধঃপতনের পথ থেকে সরে থাকা উচিত। সংসারে সংসর্গই হল উন্নতি-অবনতির প্রধান কারণ। যে মানুষ তার উন্নতি প্রাপ্তিতে সফল হন বা উন্নতির পথে অবিচল অবস্থান করেন তাঁর সঙ্গ হল আত্মার উন্নতির প্রকৃত সহায়ক। যে মানুষ পতিত অথবা যার উত্তরোত্তর পতন হচ্ছে তার সাহচর্য হলো আত্মার অবনতির কারণ। স্মরণীয় পুরুষদের উত্তম আচরণগুলিকে আদর্শ গণ্য করে সেগুলির অনুসরণ করা, তাঁদের আদেশানুসারে চলা এবং আপন বুদ্ধিতে যা কল্যাণকারী, শান্তিপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় তাকে কার্যান্বিত করা উচিত। মনুর মতে-

'বেদঃ স্মৃতি সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।।'[১৭]

বেদ, স্মৃতি, সৎ ব্যক্তির আচরণ বা শালীন সদাচার এবং যার আচরণে হৃদয়ে প্রসন্নতা আসে এই চারটি ধর্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণ। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে যাঁরা আমাদের শ্রুতি-স্মৃতিকে মানেন না তাঁদের জন্য কি কোনো উপায় নেই? সকলের পক্ষে কি শ্রুতি-স্মৃতিকে মানা আবশ্যক? এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত নয় যে শ্রুতি-স্মৃতিকে মান্য করা ছাড়া সদাচারের আর অন্য কোন উপায় নেই।

যিনি যে ধর্মই মানুন না কেন তাঁর কাছে সেই ধর্মশাস্ত্রানুসারে পূর্বপুরুষেরা যেসব আচরণ করেছেন এবং সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে যেগুলিকে তাঁর আত্মার কল্যাণকারী বলে মনে হয় সেগুলোকে গ্রহণ করাই হল তাঁর শাস্ত্রানুসারে চলা। শাস্ত্রের সেইসব কথাই অনুসরণ করা উচিত যেগুলিকে চিন্তা করলে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা কল্যাণকারী বলে মনে হয়। যাঁদের আমরা উত্তমপুরুষ বলে মান্য করি তাঁদের সেই আচরণকে বা নির্দেশিত পথকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত যা আমাদের বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। তাঁদের যে আচরণ আমাদের দৃষ্টিতে শ্রেয়কারী নয়, অনুচিত এবং হানিকর বলে মনে হয় সেগুলিকে গ্রহণ করা উচিত নয়। সংসারে মূঢ়তম এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান সকল মানুষই মনে করে যে পৃথিবীতে তাদের চেয়ে ভালো অথবা মন্দ লোকও জগৎ সংসারে রয়েছে। সুতরাং নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে যাঁকে নিজের চেয়ে উত্তম, উন্নত, বিচারবান, সাধুহৃদয়, সদাচারী ও বিদ্বান বলে মনে হয় তাঁকেই আদর্শ মনে করে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সদাচারগুলি অনুসরণ করা মানুষের কর্তব্য। যদি মূর্খতা এবং অহংকার অথবা অন্য কোন কারণে কাউকে নিজের চেয়ে উন্নত বলে বিশ্বাস না হয় তাহলে নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে ভাল করে চিন্তা- ভাবনার পর যে সব বচনকে পরিণামে কল্যাণকারী, শান্তিপ্রদ, সুখকর, লোকহিতকর, নায্য এবং ধর্মসঙ্গত বলে মনে হবে সেই কথাগুলিকে মান্য করা এবং স্বার্থরহিত হয়ে সেগুলিকে অনুসরণ করা উচিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে আকর্ষণজনিত আসক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই কামনাদি শত্রুই মানুষের ইন্দ্রিয় এবং তার মনকে অধিকার করে রাখে। সুতরাং প্রথমে ইন্দ্রিয় এবং মনকে অধীনতা থেকে মুক্ত করে কামনা প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনাশ করতে হবে। তাই ভগবান বলেছেন-

'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।'[১৮]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গুলিকে শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং সূক্ষ্ম বলা হয়, মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এবং বুদ্ধি মনের অপেক্ষা বড়। আর যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। এইরূপ বুদ্ধির পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম, সর্বপ্রকারের বলবান ও শ্রেষ্ঠ নিজের আত্মাকে জেনে নিয়ে বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে হে মহাবাহো নিজের শক্তিকে বুঝে নিয়ে দুর্জয় কামরূপ শত্রুকে হত্যা করো।

ভগবানের এই উপদেশানুসারে মানুষের উচিত তার আত্মার উদ্ধারের জন্য ক্রমশ অধিক উৎসাহে চেষ্টা করা। রাগদ্বেষপূর্ণ, অহঙ্কারাদিযুক্ত, অবিবেক বৃত্তিকে দমন করে বিবেক বৃত্তিকে জাগ্রত করলে সকল কিছুর সমাধা হয়। এটিই হল কর্তব্য পালন করা। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জগতের প্রায় সমস্ত লোকই নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে উন্নতির চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সকলেই সফলতা লাভ করে না। সাফল্যের বা আত্মোন্নতির পথে প্রধান বাধা কোন্ গুলি যা মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সর্বদা বাধা দেয়? এর উত্তরে বলা যায়, আমরা কুসংসর্গ এবং কুঅভ্যাসের দ্বারা এমন অনেক বাধা সৃষ্টি করছি যার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদের আত্মোন্নতির পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে। সৎ পুরুষের সঙ্গ এবং সৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তদনুসারে

উত্তম আচরণ এবং উপদেশ গ্রহণ এবং অনুসরণ মানবিক কর্তব্য। মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা স্বার্থশূন্য হয়ে সর্বদা সেই কাজই করতে হবে যাকে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর বলে মনে হবে।

এই জগতে কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা, কিন্তু এই কর্মপথটি জটিল। কিরূপ আচরণ করলে মানুষ সত্যিকার প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে মোক্ষপ্রাপ্তির পথকে সুপ্রশস্ত করতে পারে সে সম্পর্কে ভগবানের নির্দেশটি এখানে উল্লেখ্য-

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।'[১৯]

যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই মহৎ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করবেন সাধারণ মানুষ সেরূপ আচরণ করবে। আচরণ না করলে বিশ্বাস হয় না। আচরণ না ক'রে কেবল মুখে উপদেশ দিলে তা হৃদয়গ্রাহী হয় না। মহৎ ব্যক্তি স্বয়ং আচরণ ক'রে যে শিক্ষা দেন অন্য সকলে তা নির্দ্বিধায় আচরণ করে। চৈতন্যচরিতামৃততে বলা হয়েছে 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। মহৎ ব্যক্তি যা প্রমাণিত করবেন এবং সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত করবেন, সাধারণ লোকও তা অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন- 'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ'।[২০] অতএব প্রকৃত জীবনের পথ হল মহৎকে অনুসরণ করা। অন্যভাবে মহাভারতে বলা হয়েছে- 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'- এই উক্তির মাধ্যমে আরও একটি পরোক্ষ নির্দেশ প্রকাশ পেয়েছে যে, যাঁরা মহান বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের কর্ম করে যেতে হবে। কারণ তাঁরাই লোকগুরু। তাঁদের কর্মবিধি থেকে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ শিক্ষা লাভ করবে। অতিথি-অভ্যাগত সেবাদি কার্যে আবহমান কাল থেকে বর্ণিত আদর্শ চরিত্রগুলির নিষ্ঠা ও উৎসাহ

আমাদের সেই সদাচারে প্রবুদ্ধ করে। এই আপ্যায়নের আচরণ মানসিক কালিমা মুক্ত হতে সাহায্য করে। মনের কলুষ অবলুপ্ত হলে পরমপ্রাপ্তি, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। তাই 'অমরমঙ্গলম্' নাটকে যথার্থই উক্ত হয়েছে-

'ন সুখং কামে ন সুখং বিষয়ে।

সুখমিহ কেবলমমলে হৃদয়ে।।'[২১]

অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের মিলনে বা কামে সুখ নেই, ধনাদি বিষয়েও সুখ নেই। সুখ আছে কেবল নির্মল হৃদয়ে। তাই যে সকল আচরণ পালনে চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় সেই আচরণে মানুষের আগ্রহ আবশ্যক। চিত্তবৈকল্য বা চিত্তের মালিন্য দূরীকরণে সদাচাররূপে পরিগণিত অতিথিসেবার তাৎপর্য এখানেই সাধিত হয়।

জাগতিক সংসার বড়ই বিচিত্র। মানুষ জন্মায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিষয় ভোগ করে, সন্তান উৎপাদন করে, তাদের পালন-পোষণ করে, ধন, জমি-বাড়ি ও অন্যান্য পার্থিব ভোগ্য-সামগ্রী আহরণ করে। এ বিষয়ে ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না ক'রে কালাতিপাত করে এবং অন্তিমে সকল ভোগ্যকে ফেলে রেখে অসাফল্য ও অতৃপ্তির দহন অনুভূত হয়ে চিন্তা ও পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অসার সংসার থেকে বিদায় নেয়। এইরকম জীবন পশুদের জীবনের সাথে তুলনায় প্রভেদহীন। পশুও নিজেদের পেট ভরায়, সন্তান উৎপাদন করে ও শেষে মৃত্যুবরণ করে। তবে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে পশু আজকের মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, তারা সংগ্রহ করে না এবং সংগ্রহ করার জন্য অন্যের গলা টেপে না। আবার পশুদের তো নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করার বুদ্ধি নেই, কিন্তু ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। তবে কেন মানুষ উন্নত চিন্তায় নিজেকে

ব্যাপৃত না রেখে নানাবিধ পাশবিক প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করে সর্বোৎকৃষ্ট জন্মলাভের গুরুত্ব বোঝে না? যে মনুষ্য-জীবনকে শাস্ত্র দেবদুর্লভ বলে বর্ণনা করেছে তার সার্থকতা কি একমাত্র পার্থিব সুখভোগেই? এই সুখভোগ তো অন্য যোনিতে জন্মালেও সহজেই পাওয়া যায়। স্বর্গে যে সুখ ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর সঙ্গে রমণ-ক্রিয়ায় পায় সেই সুখ তো মনুষ্যেতর জীবজন্তুও সহবাসে পায়। সুস্বাদু জিনিস খেয়ে আমরা যে আস্বাদ পাই, একই স্বাদ বিষ্ঠা খেয়ে শূকরও পায়। মখমলের নরম বিছানায় শুয়ে আমাদের যে আরাম বোধ হয় সেই একই আরামই গাধা ছাইয়ের গাদায় শুয়ে পেয়ে থাকে। তাহলে পশুদের সাথে আমাদের মনুষ্যকুলের পার্থক্য কোথায়? আমাদের জীবন ভোগময় হয়ে গিয়েছে। আমরা দিন-রাত জৈবিক সুখভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকি। আমরা শরীরের সুখান্বেষণে ব্যাপৃত থেকে শরীরের পরেও যে কোনো আত্যন্তিক সুখ বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে সে সম্পর্কে ভাবার প্রয়োজন মনে করি না। সাংসারিক ভোগে মত্ত থাকার জন্য আমরা এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন লাভ করিনি। পার্থিব ভোগ্য বিষয় সকলই অনিত্য, অস্থির এবং ক্ষণভঙ্গুর। জোনাকি যেমন মুহূর্তের জন্য নিজের আলোক ছটা দেখিয়ে তখনই বিলীন হয়ে যায়, সেইরকম বিষয় ও সুখভোগও কেবলমাত্র ভোগকালেই সুখদায়ক রূপে প্রতীত হয়- ভোগ করার আগে আমরা সেগুলিকে প্রাপ্তির কামনায় উৎসুক থাকি কিন্তু তার পরিণাম হয় দুঃখদায়ী। ভোগকালীন সময়ে বিষয়সুখের শুধু প্রতীতিমাত্র হয়, বস্তুত তাতে পরিণামরমণীয়তা থাকে না। যদি প্রকৃত সুখ প্রাপ্তি সম্ভব হত তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী হত, তার বিনাশ হত না। গীতাতেও বর্ণিত হয়েছে-

'নাসতো বিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।'[২২]

অর্থাৎ সৎ বস্তুর কোন বিনাশ নেই এবং অসৎ বস্তুর কোন স্বত্তা নেই। অতএব যে সুখ অটল, নিত্য, ধ্রুব, অবিনাশী সেইটিই হলো প্রকৃত সুখ। প্রকৃতপক্ষে যত প্রকার বিষয়সুখ আছে

সেগুলি ক্ষণিক হওয়ায় বিষমিশ্রিত মধুর মতো দুঃখদায়ক। তাই বিষয়সুখের প্রলোভন ত্যাগ করে যে সুখ প্রকৃত স্থায়ী, যার কখনও বিনাশ হয় না এবং যা মৃত্যুর পরেও থাকে সেই সুখ পাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এই সুখ লাভ করাই হলো মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য- পরম পুরুষার্থ। জীবের ধর্ম হল অনন্ত সুখের সন্ধান করা। এই পরম সুখ লাভ করা একমাত্র মনুষ্য জন্মেই সম্ভব। অন্য কোন জন্মে সম্ভব নয়। কেননা অন্যান্য সমস্ত জন্ম যোনি ভোগযোনি। মনুষ্য জীবনের কৃত শুভাশুভ কর্মের ফল আমরা অন্য যোনিতে ভোগ করি। কর্ম করবার অধিকার কেবল মনুষ্য যোনিতেই আছে। এজন্য একে কর্মযোনি বলে এবং এটি হল শ্রেষ্ঠ যোনি। তাই সাধনের ক্ষেত্র ও মোক্ষের দ্বার বলে কল্পিত। এজন্য দেবতারাও মনুষ্য যোনিতে জন্মাবার জন্য লালায়িত থাকেন। আর এই জন্যই এই মনুষ্য শরীর মরণশীল হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেবদুর্লভ বলা হয়। তাই শাস্ত্রানুকূল আচরণাদি পালনের মাধ্যমে পরম সুখ অর্জন করা উচিত এবং তার জন্য কোন প্রয়াসকে ত্যাগ করা উচিত নয়। এরই মধ্যে নিহিত আছে আমাদের জীবনবোধের বিচার এবং জীবনের সার্থকতা। মানবিক অজ্ঞতার বিনাশ হয় পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান থেকে। যেমন অন্ধকার দূর হয় আলোর দ্বারা তেমনি অজ্ঞতা-রূপ অন্ধকার দূর হয় জ্ঞানরূপী অন্তর-সূর্যের উদয় হলে। সেই পরমার্থের যথার্থ জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্যপূর্বক সদাচার পালন করেই হয়। সমগ্র মানবজীবনে পালনীয় সদাচারই একমাত্র মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। অতিথিবাৎসল্য, অতিথিপরায়ণতা পালনীয় সদাচারগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অতিথি সৎকারের মাধ্যমে অতিথিরূপে আগত জীবেরই সেবা করি আমরা। জীবসেবা হল শ্রেষ্ঠ সেবা। মানুষ যেকোনো বর্ণাশ্রমের, জাতির, সমাজের অথবা অবস্থার হোক না কেন অতিথিপরায়ণতা গুণ লাভে তার কোন বাধা নেই। অতিথিসেবায় সকলেই অধিকারী- আর এই গুণার্জনে অধিকারীর আত্মোন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান সমাজে প্রায় সকল মানুষই প্রকৃত আত্মোন্নতির বিষয়ে বিমুখ। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আত্মার উন্নতির চেষ্টা করেন। যে অল্প কয়েকজন চেষ্টা করেন তাঁদেরও অধিকাংশেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। সদাচার পালনের অনাগ্রহ, শ্রদ্ধাভক্তির ন্যূনতার কারণে প্রকৃত পথ প্রদর্শকেরও অভাব রয়েছে সমাজে। কিছু মানুষের মধ্যে সদাচার পালনের সদিচ্ছা থাকলেও সময়, সঙ্গ এবং স্বভাবের বিভিন্নতার ফলে তাঁরা নিজেদের চিন্তানুসারে চেষ্টা করতে পারেন না। এর প্রধান কারণ অজ্ঞতা, ঈশ্বর, শাস্ত্র ও মহানুভবদের প্রতি অশ্রদ্ধা। কিন্তু মানব জীবনে এই শ্রদ্ধার উন্মেষ কারও দ্বারা করানো সম্ভব নয়। শ্রদ্ধাশীল, সদাচারী মানুষদের সঙ্গ এবং নিষ্কামভাবে কৃত তপ, যজ্ঞ, দান, দয়া, জীবসেবার ইচ্ছা প্রভৃতি সাধনার মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হলে জীবের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়- এটিই হল অতিথিপরায়ণতার মূল কথা। শ্রদ্ধাই হলো মানুষের স্বরূপ, ইহলোক এবং পরলোকে শ্রদ্ধাতেই মানুষের বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা-

‘সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ’।।[২৩]

অর্থাৎ সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা তাদের অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময় অতএব মানুষ প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সদাচারী হতে পারে না এবং সদাচার পালনে অভ্যস্ত না হলে অতিথিসেবার মতো সৎকার্য সাধন কখনই সম্ভব নয়। তাই মানুষকে প্রথমে অতিথি সত্তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে তবে তার সৎকারকল্পে ব্রতী হতে হয়। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এবং অকর্মণ্যতা প্রভৃতি কাজে জীবনের অপচয় না করে সদ্বিবেচনাপূর্বক কল্যাণমার্গে নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত। অতিথিসেবা রূপ সৎকর্ম মানুষকে কুপথে নিয়োজিত করে না। সত্য বা উত্তম পথের নির্দেশক হয়। দুরাচার নিবৃত্ত করে এবং কল্যাণ পথের বিঘ্নকে

অপসারিত করে। অতিথিসেবাদি কর্ম সাধারণভাবে সৎপথের নিত্য প্রেরণাদাতা হওয়ার কারণে জীবের সার্বিক কল্যাণের সহায়ক। পাপকর্মাদিতে লিপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ হলো নিরন্তর বিষয়চিন্তা। রজোগুণোদ্ভূত কর্মের উৎপত্তি এ থেকেই হয়। সেইরূপ কর্ম থেকেই ক্রোধাদি দোষ উৎপন্ন হয়ে জীবের অধোগতির কারণ হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন-

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।'[২৪]

পুরুষার্থ দ্বারা পাপকর্মের হেতু রাগরূপ রজোগুণের দ্বারা উৎপন্ন কামনাকে বিনাশ পূর্বক দুরাচার বিনাশ করতে হয়। তাই অর্জুনের প্রশ্ন ছিল-

'অথ কেন প্রযুক্তোঽয় পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।'[২৫]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তাহলে মানুষ বলপূর্বক নিযুক্ত হওয়ার মতো কার দ্বারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রযুক্ত হয়ে পাপাচরণ করে? উত্তরে ভগবান বলেছেন-

'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমহি বৈরিণম্।।'[২৬]

অর্থাৎ হে অর্জুন! রজোগুণের দ্বারা উৎপন্ন এই কামনাই হল ক্রোধ, এটিই মহা অশন অর্থাৎ আগুনের মতো ভোগ তৃপ্ত হয় না এবং এটি অত্যন্ত পাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে জেনো।

ধোঁয়া যেমন আগুনকে, ময়লা যেমন দর্পণকে, জরায়ু যেমন গর্ভকে ঢেকে রাখে তেমনি জ্ঞানকে ঢেকে রাখা এই বুভুক্ষু অগ্নিসদৃশ কামনার নিবাসস্থল হল মন। মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করে ভগবান ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপী কামকে বিনষ্ট করার উপদেশ দিয়েছেন। যদি জীব কাম বা কামনাকে জয় করে সদাচারে লিপ্ত হতে সক্ষম না হতে পারে তাহলে ভগবানের এই সদুপদেশের কোন অর্থ হত না। তাই ভগবানের আদেশানুসারে শুভকর্ম, সৎ-সঙ্গতি, অতিথিসৎকারাদি রূপ সদাচার সম্পন্ন হয়ে মানুষ শুদ্ধ হয়। এজন্য মানুষের উচিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সদাচারী জীবনযাপন করা। ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্তব্য বুদ্ধিতে অবিচল থেকে যদি সদাচার প্রতিপালনের মাধ্যমে পরম তপের সাধনা করা যায় তাহলে মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকে মুক্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করবার উপযুক্ত হয়। অতএব আত্যন্তিক মুক্তি- পরম শান্তি প্রভৃতি লাভের চাবিকাঠি হল সদাচার; আর এই সদাচারের অন্তর্গত অতিথিবাৎসল্য তাই এতো গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অজ্ঞতার কারণে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য, বিনাশশীল ও দুঃখরূপ এবং দুঃখের হেতু সমূহতেই আপাত সুখ প্রতীত হয়। কিন্তু আত্যন্তিক মুক্তিকামী মোক্ষেচ্ছু পুরুষ বিষয়বিষের যাথার্থ্য অবগত হয়ে কখনোই তাতে আসক্ত হয় না-

‘যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।’[২৭]

যতক্ষণ পর্যন্ত মানবমন সাংসারিক অসার সঙ্কল্পগুলি থেকে নিবৃত্ত হয়ে সদাচার পালনের মাধ্যমে পারমার্থিক সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হয় বা পরমাত্মাতে লগ্ন না হয় ততক্ষণ সদাচারের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সদাচারের কৃষি করা উচিত। কর্তব্য হল বীজ, মনজমিতে সাংসারিক ক্ষেত্রে তাকে বপন করতে হয়। চিত্তের বৃত্তি হল জল, চিত্তবৃত্তিরূপী জলের অভাবেই ক্ষেত হয় শুষ্ক। তাই জল সিঞ্চনের কাজ তথা সদাচারের অনুশীলন অহরহ-নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সদাচার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সদাচার পালনের বহুবিধ ক্ষেত্র থাকলেও সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত, সর্বজন অনুসৃত অতিথিপরায়ণাতার প্রাধান্য প্রদর্শন কল্পে এই তাত্ত্বিক আলোচনা।

দৈহিক শক্তির ও বুদ্ধির উন্নতি জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজনীয়, মানুষের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রয়োজনীয়; বেঁচে থাকার জন্য উভয়ের ক্ষেত্রেই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মানুষের মধ্যে যা অনন্য তা হল চৈতন্যের ক্রমোন্নতি। এই চৈতন্যই ধীরে ধীরে গভীর ও ব্যাপক হয়ে ব্যক্তিকে তার অমর সত্ত্বাটিকে অনুভব করতে সাহায্য করে। এই সত্ত্বা যে শুধু অমর তা নয়, এটি পূর্ণ ও নিত্য। এটি মানুষের সেইসব সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে যার মধ্য দিয়ে একদিকে মানুষের ঐশ্বরিক সত্তা, অন্যদিকে তার মানবত্বের প্রকাশ ঘটায়। এইভাবেই মানুষের জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মের যে স্বাধীনতা তা মূলতঃ নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে, কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য নয়। পরম-মানবের উপলব্ধির জন্যই ব্যক্তি-মানবের অস্তিত্বের দরকার। প্রকারান্তরে বলা যায়, ব্যক্তি তার নিষ্কাম কর্ম, বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, সাহিত্য- এমনকি দান, সেবা, পরোপকার ও পূজার মধ্য দিয়ে নিজের মানবিক সত্তাকে প্রকাশিত করতে পারে। একেই বলা হয় মানুষের ধর্ম, যা বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে তার সমস্ত কর্মের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই

জগৎকে জানার, কাজে লাগাবার, মুক্তির প্রাপ্তিতে তৎপর হওয়ার মাধ্যমে মানুষ অসীমের পরিচয় লাভ করে ও মহত্বের অধিকারী হয়। সেই সঙ্গে নিজের সত্যটুকু আবিষ্কারে সে পূর্ণত্ব লাভ করে এবং তার দ্বারা মানব জীবনের চরিতার্থতা সাধিত হয়।

'রিলিজিয়ান' (Religion) বলতে সংস্কৃত ভাষায় বোঝায় ধর্ম-কে, যা ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে এমন এক সম্পর্কের নীতিকে নির্দেশ করে, যেটি আমাদের মানবিক সত্তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। এটি এক অর্থে মানুষের আবশ্যিক আচরণীয় গুণাবলীকে বোঝায় যেমন আগুনের ধর্ম উত্তাপ। 'ধর্ম' নিত্য মানবের অন্তর্গত মানুষের বিশেষ কতগুলি গুণাবলীর অনুশীলন ও প্রকাশ। এগুলি যে নিত্য মানবের প্রকৃতির অন্তর্গত এ বিষয়ে বিশ্বাস বা প্রত্যয় থাকা চাই। তা নইলে এই গুণাবলীর অনুশীলনে সৌষ্ঠবতা থাকে না। এই গুণাবলী যদি মানুষের স্বাভাবিক গুণ হত, তাহলে ধর্মের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই থাকত না। মানুষের মূল প্রকৃতির তাগিদ, অর্থাৎ যা তাৎক্ষণিক-প্রধান চাহিদাগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে তাই দিয়েই মানবিক ইতিহাস শুরু হয়। কিন্তু যেসব মনোবৃত্তির বা প্রবণতার ধারা আমাদের সংস্কৃতির গভীরে রয়েছে, সেগুলি বিভিন্নভাবে সর্বজনীন মানবতার প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করেছে। এই দুইয়ের বিরোধকালে সমন্বয় সাধন করার কাজটি সমাধা করে ধর্ম। ধর্ম আমাদের স্থূল প্রকৃতির সাথে মানব সত্যের সঙ্গতি প্রতিস্থাপিত করে। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সেবাপরায়ণতা মানুষের পূর্ণতার আদর্শের সচেতনতার প্রতীক মাত্র। ব্যক্তি তার আচরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য যে আদর্শের অনুসরণ করবে, সেই আদর্শ অবাস্তব কিছু নয়, বরং এই সত্যের মূল্য রয়েছে। এই মূল্য আদর্শগতভাবে সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। নির্দিষ্ট নির্দেশিকার মাধ্যমে সদাচার পালন করে মানুষকে তার আচরণ ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়- এতেই তার সার্থকতা। অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নের রীতি সেরকমই একটি অনন্য

সাধারণ আচরণ যা আর পাঁচটা জীবের থেকে মানুষকে উৎকর্ষতার ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে; শুধু তাই নয় এই বিশেষ গুণাবলীর পরিশীলিত আচরণের ফলে মানুষ তার পরম ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়।

পরিদৃশ্যমান বহির্জগতের অসংখ্য গতিশীল বস্তুদের প্রত্যক্ষ করা শুধু নয়, মানব জগতের মধ্যে যে পরম মানবিক সত্যটি রয়েছে তাকে অনুভব করতে হবে। এই মহানুভূতির প্রতিফলন ঘটে মানুষের জীবনের শিষ্ট আচরণের মাধ্যমে। অতিথিসেবা সেই মূল্যবান শিষ্ট আচরণগুলির অন্যতম। প্রাচীন ভারতভূমিতে বেদ-উপনিষদের উপদেশাবলীর মধ্য দিয়ে মানবিক সত্তার মহত্ত্ব, মানুষের সম্ভ্রম বা মর্যাদার বিষয়টি উদ্ঘোষিত হয়। মানুষের আত্মিক মর্যাদা, চারিত্রিক মহত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এই আন্দোলন প্রয়োজনীয় কিছু শক্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞানলাভের জন্য নয় বা কয়েকটি সর্বগ্রাসী প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্যও নয়; এটি সেই মানবিক উৎকর্ষতা বিধানের তাগিদ, যা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির বহুমান্য বিভিন্ন ধারাকে অনুসরণ করে নিত্য মানবিক সত্যকে অর্থাৎ আমাদের মনুষ্য ধর্মকে অনুভব করতে সাহায্য করে।

তাই একবিংশ শতকের অত্যাধুনিক পৃথিবীতে অতিথি সেবাই এমন এক পালনীয় সদাচার যার জন্য প্রবল প্রতিপত্তি, আর্থিক সঙ্গতি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র স্বার্থবুদ্ধিশূন্যতা, পরোপকার, পরার্থে জীবন উৎসর্গীকরণ, সেবা, জাগতিক কল্যাণ সাধনের মানসিকতা ও উদার হৃদয়বৃত্তিকে পাথেয় করে প্রাঞ্জল, গুরুত্বপূর্ণ অতিথিসেবা সম্পাদন করা যায়। বর্তমান সমাজে বিদ্বেষ ও বিচ্ছিনতাবাদের যে হিংস্র প্রতিরূপ আমরা দেখি সেখানে ধর্মগত উন্মাদনা প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিশ্বের সকল ধর্মের বিশেষ বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র মৌলিক কর্তব্য থাকলেও অতিথিপরায়ণাতা সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব মতাদর্শ নির্বিশেষে

মহান মানুষের সাধারণ ধর্ম। বিশ্বের সমস্ত ধর্মই মানুষকে মহানুভবতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবর্তিত তাই মহত্ত্ব প্রতিপাদনে আতিথ্যবাৎসল্য গুণটি নির্বিরোধে সকল ধর্মেই গৃহীত। আধুনিক মানুষ অতিথি-অভ্যাগত সৎকারের মহৎ উদ্দেশ্যকে জীবনে অন্তর্ভুক্ত ক'রে উন্নতির, শান্তির, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করতে পারে। সদাচার পালনের বহুবিধ ক্ষেত্র থাকলেও অতিথিসেবার মতো সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত, সর্বজনানুসৃত শিষ্টাচারের প্রাধান্য প্রদর্শনকল্পে এই তাত্ত্বিক গবেষণা।

'বেদ ও বেদোত্তরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে আতিথেয়তা সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিক সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত অতিথি-অভ্যাগতের আতিথেয়তার নিদর্শন স্বরূপ প্রাপ্ত উদাহরণগুলির উত্থাপন ও আধুনিক সমাজে আতিথেয়তার প্রাসঙ্গিকতা বিশদে অধ্যায়ভিত্তিক, সমীক্ষাত্মক দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সারা পৃথিবীতে আজও অতিথি ও আতিথেয়তার পরিপ্রেক্ষিতটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিষ্ট, শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অন্তর্গত সরল, নিষ্কলুষ, ঐতিহ্যবাহী, নির্বিরোধ, সদর্থক এই অতিথিবাৎসল্য সর্বোৎকৃষ্ট সদাচারের অন্তর্গত হওয়ায় এটি সর্বজনপরিষেব্য রীতি হিসেবে সমাদৃত। তাই এই অতিথিসৎকার রূপ সদাচার সামগ্রিকভাবে মানবিক উত্তরণের সহায়ক হয়েছে; এটি একটি মনোজ্ঞ ব্যবহারিক রীতির ন্যায় সমগ্র বিশ্বে এখনও অবশ্য পালনীয় সামাজিক রীতি রূপে গৃহীত ও সমাদরনীয়। এজন্য মৌলিক সদাচার হিসেবে সর্বাদৃত এই আতিথেয়তার পালন ও তার মাহাত্ম্য গবেষণায় নিবন্ধীকৃত হয়েছে- যা অত্যুত্তম ও মনোগ্রাহী আচরণের স্বীকৃতিতে জনমানসে ভাস্বর। সমীক্ষাতে অতিথি সৎকারের মহনীয় দিকটি উদ্ভাসিত যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনচর্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তথ্যপঞ্জি

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮/৬

২. ভাগবৎপুরাণ ১/২/১০

৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫/৬

৪. গীতা ১২/৫

৫. ভাগবৎপুরাণ ১০/১৪/৪

৬. শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৯/৪১

৭. ভাগবৎপুরাণ ২/১০/৬

৮. ভাগবৎপুরাণ ৭/৫/৩১

৯. গীতা ১৪/১৮

১০. ভাগবৎপুরাণ ১১/২০/১৭

১১. ভাগবৎপুরাণ ৫/৫/৪

১২. গীতা ৩/৮

১৩. গীতা ৩/৩৫

১৪. গীতা ৯/১২

১৫. গীতা ১৫/৬

১৬. ভাগবৎপুরাণ ১১/৯/২৯

১৭. মনুসংহিতা ২/১২

১৮. গীতা ৩/৪২-৪৩

১৯. গীতা ৩/২১

২০. গীতা ৩/২৩

২১. অমরমঙ্গলম্ ৪র্থ অঙ্ক

২২. গীতা ২/১৬

২৩. গীতা ১৭/৩

২৪. গীতা ২/৬২-৬৩

২৫. গীতা ৩/৩ ৬

২৬. গীতা ৩/৩৭

২৭. গীতা ৫/২২

সন্দর্ভ গ্রন্থপঞ্জি

সন্দর্ভ গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ :

- *অগ্নিপুরাণ* । ক্ষেমরাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস (সম্পা°)। মুম্বাই : শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্টীম মুদ্রালয়, ১৯১৭।
- *অগ্নিপুরাণ* । তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা°)। কলকাতা : নবভারত পাব্লিশার্স, ১৯৯৯।
- *অথর্ববেদ-সংহিতা* । গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা° ও অনু°)। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, বঙ্গাব্দ ১৪২১।
- *অমরকোষ* । ভট্টাচার্য, গুরুনাথ (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪০৮।
- *উপনিষদ্* (১ম ভাগ)। লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২১।
- *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী* (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২০।
- *ঋগ্বেদসংহিতা* (১ম ও ২য় খণ্ড)। দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু°)। কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৬৩।
- *ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র* । চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০২১।
- *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ* । সেন, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পা°)। কলকাতা : সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪।

- *কৌটিলীয়অর্থশাস্ত্রম্* । গৈরোলা, বাচস্পতি (সম্পা°)। বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন (পঞ্চম সংস্করণ), ২০০৬।
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* । দাস, করুণাসিন্ধু, বেচারাম ঘোষ ও সুবুদ্ধি চরণ গোস্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০।
- *বৈদিক সংকলন* (৩য় খণ্ড) । অধিকারী, তারকনাথ ও সমীর কুমার মন্ডল (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), ২০২০।
- *মনুসংহিতা* । বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (৩য় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৪২৭।
- *মনুস্মৃতি* । রস্তোগী, উর্মিল (সম্পা°)। দিল্লী : জী. পী. পাব্লিসিং হাউস, ২০০৪।
- *মহাভারত* (বঙ্গানুবাদ-বর্ধমান রাজবাটী)। কলকাতা : ভারবি (প্রথম ভারবি সংস্করণ), ১৯৭৬।
- *মহাভারত* । বসু, রাজশেখর (সারানুবাদ)। কলকাতা : এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্গাব্দ ১৪২২।
- *মহাভারত* । ভট্টাচার্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পা°)। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বঙ্গাব্দ ১৩৮৩।
- *মুণ্ডকোপনিষদ* । জুষ্টানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫।
- *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* । তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (পরিমার্জিত সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৯৮।
- *রামায়ণ* । সরকার, পবিত্র (সম্পা°)। কলকাতা : নিউ লতিকা প্রকাশনী, ২০২২।

- *রামায়ণ আর্য্যশাস্ত্র* । শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত। তর্কাচার্য, কালীপদ ও শ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ (সম্পা°)। কলকাতা : শ্রীসীতারামদাস বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ১৯৭৮।
- *শতপথব্রাহ্মণ* (১ম-২য় কাণ্ড) । ভট্টাচার্য, বিধুশেখর (*অনু°*)। কলকাতা : সদেশ, ২০০৮।
- *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* । জগদানন্দ, স্বামী (সম্পা°)। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয় (অষ্টম সংস্করণ), ১৯৬১।
- *হিতোপদেশ* । চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পা°)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৮।
- *Arthashastra of Kautilya*. Kangale, R. P. (Ed.), Delhi : Motilal Banarasidas, 1965.
- *Baudhayanadharmasutra*. Pandey, Umesh Chandra (Ed.), Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1972.
- *Brhaspatismrti*. Bhattacharya, B. (Ed.), Baroda : Gaekwad's Oriental Series, 1941.
- *Mahabharata*. Shastri, H. P. (Trans.), London, 1959.
- *Rgvedasamhita*. Wilson, H. H. (Trans.), Bangalore : Bangalore Printing and Publishing Co., 1946.
- *Satapathabrahmana*. Bhatt, Jeet Ram (Trans.), Delhi : Eastern Book Linkers, 2009.
- *Vishnupurana*. Wilson, H. H. (Trans.), Calcutta : Punthi Pustak, 1961.
- *Yajnavalkyasmrti*. Dutt, Manmathnath (Trans.). Delhi : Parimal Publication, 2015.

সহায়ক গ্রন্থ :

- অনির্বাণ। *বৈদিক সাহিত্য (বেদ-মীমাংসা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), বঙ্গাব্দ ১৪১৮।
- অভেদানন্দ, স্বামী। *ভারত ও তাহার সংস্কৃতি* । কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), ২০১০ ।
- আচার্য, রামজীবন। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক* । কলকাতা : মেসার্স মন্ডল এন্ড সন্স ও শ্রীধর প্রকাশনী (১ম সংস্করণ), ১৯৬৫।
- কাণে, পাণ্ডুরঙ্গ বামন। *ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস* । লখনউ : উত্তরপ্রদেশ হিন্দী সংস্থান, ১৯৬৫।
- গুপ্তা, রাকেশ। *হিন্দু সংস্কৃতি* । নয়াদিল্লী : ডায়মন্ড পকেট বুকস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬।
- ঘোষ, অমলকুমার। *বেদ উপনিষদের কথা* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো,২০২১।
- ঘোষ, জগদীশচন্দ্র। *ভারত-আত্মার বাণী* । কলকাতা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৫৪।
- চক্রবর্তী, লোকনাথ। *চাওয়ার চতুর্মুখ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের কথা* । কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স (২য় প্রকাশ), ২০১৭।
- চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ। *সাম্প্রতিকতমকালে বাঙালীর বেদ গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।
- চট্টোপাধ্যায়, অশোক। *পুরাণ পরিচয়* । কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭৭।
- চট্টোপাধ্যায়, ধূর্যটিপ্রসাদ। *রামায়ণ প্রকৃতি, পর্যাবরণ ও সমাজ* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (১ম সংস্করণ), ২০১৬।

- চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর। *ভারতের সংস্কৃতিঃ প্রাচীন যুগ* । কলকাতা : প্রোগ্রেসিভ পাব্লিশার্স, ২০২২।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *ভারত-সংস্কৃতি* । কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৮৯।
- জ্ঞানালোকানন্দ, স্বামী। *মূল্যবোধে ধন্যজীবন* । নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ : রামকৃষ্ণ আশ্রম (২য় সংস্করণ), ২০২০।
- টণ্ডন, ড. কিরণ। *ভারতীয়সংস্কৃতি* । দিল্লী : ইস্টার্ন বুকলিঙ্কার্স, ১৯৯৪।
- ত্রিপাঠী, ড. বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ। *ভারতীয়কর্মকাণ্ড স্বরূপাধ্যয়নম্* । বারানসী : অনুসন্ধান সংস্থান, ২০০৭।
- ত্রিবেদী, ড. ভবানীশঙ্কর। *সংস্কারপ্রকাশ* । দিল্লী : শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ১৯৮৬।
- পাণ্ডেয়, রাজবলী । *হিন্দুসংস্কার* । বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০৯।
- প্রামাণিক, প্রশান্ত। *বেদ বিজ্ঞান এবং* । কলকাতা : জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, (১ম), ১৯৯৯।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়। *মানবজীবনের সার্থকতা* । কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয় (১ম প্রকাশ), ২০২২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার (সম্পা০)। *পৌরাণিকা* (২য় খণ্ড) । কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৮৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার। *ঊনবিংশতি সংহিতা* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪০৭।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র। *পুরাণ পরিক্রমা ও প্রবন্ধ* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।
- বসু, গিরীন্দ্রশেখর। *পুরাণ প্রবেশ* । কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (দ্বিতীয় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৩৫৮।
- বাগুরী, অর্ধেন্দুশেখর। *সংস্কৃত সাহিত্য পরিচয়* । সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১৯।
- বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ। *ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা* । গুপ্ত, সুশীলকুমার (সম্পা০)। কলকাতা : ভারত লাইব্রেরী, বঙ্গাব্দ ১৩৭২।
- বোস, অনিতা। *রামায়ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পদচিহ্ন* । কলকাতা : বি বুকস্ (১ম প্রকাশ), ২০১৯ ।
- ভট্টাচার্য, জনেশরঞ্জন। *বসুধৈব কুটুম্বকম্* । কলকাতা : বি. এন. পাব্লিকেশন, ২০২২।
- ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১।
- ভট্টাচার্য, নারায়ণচন্দ্র। *অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বঙ্গাব্দ ১৩৭০।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য* । কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্গাব্দ ১৩৯৪।
- *ভট্টাচার্য*, সুখময়। *রামায়ণের চরিতাবলী* । কলকাতা : আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (প্রথম প্রকাশ), ২০০৫।

- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *আচার-বিচার-সংস্কার* । কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স (১ম সংস্করণ), ২০১৩।
- মণ্ডল, বলরাম। *পুরাণের ইতিবৃত্ত* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১।
- মহারাজ, শ্রীদলপতি। *সংস্কারসার:* । বারাণসী : অনুসন্ধান সংস্থান, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
- মুখোপাধ্যায়, গোপেন্দু। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* । কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি (২য় সংস্করণ), বঙ্গাব্দ ১৪২৬।
- লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা০)। *ভারত-সংস্কৃতির রূপরেখা* । নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (১ম সংস্করণ), ২০০৩।
- সরকার, প্রদীপ। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও তৎকালীন সমাজ* । কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো (১ম প্রকাশ), ২০১৫।
- সাহা, বিশ্বরূপ। *ধর্মার্থশাস্ত্রপরিচয়* । কলকাতা : সদেশ, ২০০৯।
- সেন, প্রবোধচন্দ্র। *রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি* । কলকাতা : জিজ্ঞাসা (১ম প্রকাশ) , ১৯৬২।
- Abayeb, J. *Daily Life in Ancient India*. *London* : *Blackwell*, 1991.
- Bandyopadhyay, Sureshchandra. *Concise History of Dharmashastra*, Delhi : Motilal Banarasidas, 1991.
- Bhandarkar, D.R. *Some Aspects of Ancient Indian Hindu Polity*, Varanasi : Banaras Hindu University, 1987.
- Bose, Ramchandra. *Hindu Philosophy*. New Delhi : Asian Educational Services, 1986.
- Buhler, George. *ApastambadharmaSutra(Sacred Laws of the Aryas)*.SBE Vol.2Part-1, 1879.

- Chakraborti, Samiranchandra, *Brahmanasamgraha*, Kolkata : Sahitya Akademi, 2004.
- Gharpure, J. R. *Teaching of Dharmashatra*, Allahavad : Lucknow University, 1956.
- Hazra, Rajendra. *Puranic Records on Hindu Rites and Customs*. Dacca : Dacca University, 1940.
- Houben, Jan. E. M. *Ideology and Status of Sanskrit*. Delhi : Motilal Banarasidas Publishers Pvt. Ltd. , 2012.
- Jolly, Julius. *Institutes of Vishnu*. Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan (*1st*), 1991.
- Knapp, Stephen. *The Secret Teachings of the Vedas.* Mumbai : Jaico Publishing House, 2000.
- Mehta, V. R., *Foundations of Indian Political Thought*. Delhi : Manohar Publisher, 1999.
- Parida, Saratchandra. *Hospitality in Changing Indian Society: Vedic Age to Puranic Age,* New Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan, 2004.
- Prabhu, P. H., *Hindu Social Organisation.* Mumbai : Popular Prakashan, 1998.
- Prasad, Abhinav. *Vedic Mythology*. New Delhi : Abhijit Publicatios, 2012.
- Sharma, S. L., *Smritis : A Philosophical Study*, Delhi : Eastern Book Linkers, 2013.
- Shastri, Gaurinath. *A Concise History of Classical Sanskrit Literature*. Delhi : Motilal Banarasidass, 2017.
- Shastri, Gaurinath. *A History of Vedic Literature*. Kolkata : Sanskrit Pustak Bhandar, 1982.
- Singh, G. P. & Singh, S. Premananda, *Kingship in Ancient India: Genesis and Growth,* Delhi : Akansha Publishing House, 2000.